ঢাকার সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র (১৮৬১-১৯৪৭)

[Advertisement Images in Dhaka Periodicals (1861-1947)]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সাথী খাতুন
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরাইয়া আক্তার
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সাথী খাতুন আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম.ফিল অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **'ঢাকার সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র (১৮৬১-১৯৪৭) [Advertisement Images in Dhaka Periodicals (1861-1947)]'** । আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এটি গবেষকের নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

৪.৭.২৫

ড. সুরাইয়া আক্তার
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি সাথী খাতুন এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'ঢাকার সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র (১৮৬১-১৯৪৭)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এ গবেষণার পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোথায়ও প্রকাশ করিনি বা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিনি।

সাথী খাতুন
৮.০৯.২০২৫

সাথী খাতুন
এমফিল গবেষক
রেজি. নং ১৭২/২০১৭-১৮
সেশন: ২০১৭-১৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'ঢাকার সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র (১৮৬১-১৯৪৭)' নামক গবেষণা পত্র প্রনয়নে আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অধ্যাপক ড. সুরাইয়া আক্তার ম্যামের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। তিনি এ গবেষণা কর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বই, পুস্তক ইস্যু করে দিয়ে সহযোগিতা করার পাশাপাশি অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস স্যারের প্রতি যিনি একাডেমিক কমিটিতে থিসিস জমাদানের সময় বারংবার বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষা কমিটি গঠন প্রভৃতি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে আমাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যার কারণে গবেষণাকর্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যারের প্রতি যিনি মাস্টার্স চলাকালীন সময়েই উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। এছাড়াও এমফিল গবেষণার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ড. আয়শা বেগম ম্যাম, ড. নাজমা খান মজলিশ ম্যাম, ড. মোশারফ হোসেন ভূইয়া স্যার ও ড. এ কে এম খাদেমুল হক স্যার প্রমূখ তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মে যে সকল লেখক, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থ, পত্রিকা ও পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরীর দায়িত্বপালনকারী সকলের প্রিয় জনাব সাজেদা আপা, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার জনাব সারোয়ার ভাই, মোজাম্মেল হোসেন মুন্সী ভাই, মিঠুন ভাই, গাজী সিরাজুল ইসলাম ভাই, আমীন ভাই সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিশেষ করে 'রিয়্যার সেকশন', পুরাতন পত্রিকা সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশন সেকশন সহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মটির সময় বৃদ্ধিসহ যাবতীয় দাপ্তরিক কাজে সাহায্য ও সহযোগীতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম বাবু ভাই এবং বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ছোট ভাই মো. খোকন খানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বোপরি অত্র অভিসন্দর্ভটির প্রস্তাবনা প্রনয়ন থেকে শুরু চূড়ান্ত কপি জমাদান প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদানকারী, আমার পিতামাতা ও শিক্ষাজীবনের সমস্ত স্তরের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, আমার সহপাঠী, অগ্রজ ও অনুজ ভাতৃবর্গ, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভ কামনা। মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাদের সকলের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুক।

সাথী খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

Abstract (সারাংশ)

গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি শহরের নাম ঢাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর হিসেবে ঢাকা'র গোড়াপত্তন হয়েছিল মুঘল আমলে। সূচনালগ্ন থেকেই এতদ্বাঞ্চলের ইতিহাসের নানা চড়াই উৎড়াইয়ের সাক্ষী ঢাকা শহর। মুঘল পরবর্তী সময়কালে ঢাকায় ইংরেজদের আগমণের পর বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল শহর ঢাকার ইতিহাসে বিপর্যয়কর একটি অধ্যায়। অধিকন্তু পরবর্তী সময়কালের ইতিহাস ছিল ঢাকার জন্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের। আধুনিক গবেষণায় প্রতিয়মান যে, ১৮৪০ সাল থেকেই ঢাকার পুনরুত্থান শুরু হয়। ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ব্রিটিশ শাসকদের নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নুতন নীতিমালা গ্রহণ ঢাকার জীবনে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে এবং ঢাকা আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সগৌরবে শুরু করে। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি এতদ্বাঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে ইংরেজদের হাত ধরেই ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এক্ষেত্রে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ তথা ১৮৪৭ সালে ঢাকায় মুদ্রণ যন্ত্রের আমদানি পূর্ববঙ্গের প্রকাশনার জগতে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকায় প্রথম মূদ্রণ যন্ত্রটি এনেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের বিষয়টি মাথায় রেখে। কিন্তু ধর্মীয় প্রকাশনার গণ্ডি পেড়িয়ে পূর্ববঙ্গের সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ঘটনা এক ধরণের বিপ্লব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই একাধিক পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে ঢাকা থেকে। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বাংলা/ইংরেজি বই, সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে। সংবাদ বা সাময়িকপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞাপন চিত্র ঢাকা শহরের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবির স্বরূপ উন্মোচন করতে বক্ষমাণ গবেষণায় ১৮৬১-১৯৪৭ সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অত্র গবেষণায় গুণগত গবেষণার (Qualitative Form) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো তৎকালীন ঢাকার স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করে, রূপচর্চা ও প্রসাধনী সামগ্রী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, আধুনিক মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো উনিশ শতকের ঢাকায় ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিকাশধারার পরিচয় বহন করে এবং গ্রন্থ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর চরিত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, প্রসাধনী, পশুপাখি ও বিভিন্ন প্রাণী, কীটপতঙ্গ, নারীদের অলংকার সামগ্রী, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও যেমন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন, লোহার কড়াই, ল্যাণ্ঠার্ন, চামড়ার জুতা, ছাতা, সাইকেল, সংগীতের যন্ত্রপাতি যেমন- গ্রামোফোন, নিকোলফোন, হারমোনিয়াম, বিলাতি মাটি, পঞ্জিকা প্রভৃতি তৎকালীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একেকটি মূল্যবান উপাদান। এই উপাদানের সাথে জড়িয়ে রয়েছে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও সংগ্রামের ইতিহাস, রয়েছে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং রয়েছে ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন ধারা প্রতিফলন। বিজ্ঞাপন চিত্রের মাধ্যমে আরো প্রতীয়মান হয় যে, এদেশীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিশেষ করে পোশাক পরিচ্ছদে (যেমন- শাড়ির পরিবর্তে নারীদের পশ্চিমা পোশাক, ধুতি জাতীয় পোশাকের পরিবর্তে পুরুষের কোর্ট, টাই, প্যান্ট ও খড়মের বদলে জুতা), খেলাধুলায় (যেমন- এদেশীয় হাডুডু খেলার পরিবর্তে টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট) ভিনদেশী প্রভাব সুস্পষ্ট হচ্ছে বা হবে।

মোদ্দকথা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে ঊনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ক্রম.	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রত্যয়নপত্র	০২
২.	ঘোষণাপত্র	০৩
৩.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)	০৪
৪.	সারাংশ (Abstract)	০৫
৫.	ভূমিকা (Introduction)	০৮
৬.	গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)	১১
৭.	গবেষণার পরিধি (Scope)	১১
৮.	গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale)	১৩
৯.	গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)	১৪
১০.	সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)	১৫
১১.	শিরোনামের মূল শব্দের সংজ্ঞায়ন (Definition of Key words of the Title)	১৬
১২.	প্রথম অধ্যায়: ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ	২২
১৩.	দ্বিতীয় অধ্যায়: বিজ্ঞাপন চিত্রের ধরণ ও বিষয়-বৈচিত্র্য	৩১
১৪.	তৃতীয় অধ্যায়: বিজ্ঞাপন চিত্রের আলোকে ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৪২
১৫.	উপসংহার	১৬৭
১৬.	সহায়ক উৎস	১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা'র রয়েছে গৌরবোজ্জল এবং সমৃদ্ধ এক অতীত ইতিহাস। ঢাকায় ইংরেজদের আগমণের পর বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল শহর ঢাকার ইতিহাসে বিপর্যয়কর একটি অধ্যায় হলেও পরবর্তী ইতিহাস ছিল ঢাকার জন্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের। কেননা পূর্বোক্ত সময়কালে ঢাকার প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-উৎপাদন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবনতির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষপ্রান্তে অবশ্য এই ব্রিটিশদের দ্বারাই ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। ১৮৩৬ সালে অভ্যন্তরীণ শুল্ক এবং নগর শুল্কের বিলুপ্তির সাথে সাথেই অত্যন্ত ধীরগতিতে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছিল।[১] অর্থাৎ ঢাকার শহর প্রথমবারের মতো রাজধানীর মর্যাদা পায় ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ)। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির, ইসলাম খান চিশতিকে সুবা বাংলার সুবাদার বা শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এটি মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকা এসে পৌঁছান এবং এসেই সুবা বাংলার নূতন রাজধানী হিসেবে স্থানটির নামকরণ করেন জাহাঙ্গিরনগর। তবে লোকমূখে ঢাকা নামটিই প্রচলিত থাকে।[২] ঢাকার আর্থিক ভিত্তি ও মর্যাদার পতন ঘটে ইংরেজদের আগমণের ফলে। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্যিকারভাবে পতন শুরু হয় ১৭৬৫ সালের পর থেকে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত অর্থে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। কোম্পানী কর্তৃক নতুন শাসন কাঠামোর প্রবর্তনের ফলে পুরনো মুঘল কর্মকর্তারা ক্ষমতা ও চাকরি দুই-ই হারায়। এই মুঘল কর্মকর্তা ও অভিজাতরা ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বড় ধরণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় দেশের সব-ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের ফলে। সেই সাথে ১৮০১ সাল থেকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ও নগর কর বসানোর ফলে ঢাকার ব্যবসা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। বহু ভারতীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ী ও সওদাগর নগর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৩] জেম্‌স টেলর মন্তব্য করেন ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে যে পরিমাণ মসলিন ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা হয়েছিল তার মূল্য ছিল ত্রিশ লাখ টাকা; ১৮০৭ সালে এই রপ্তানি মূল্য এসে দাঁড়ায় সাড়ে আট লাখ টাকায়। ১৮১৭ সালে এই রপ্তানি

[১] শরীফ উদ্দিন আহমদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স, ২০১০), ১০৫।
[২] শরীফ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ঢাকা কোষ* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২), ১৬৬।
[৩] আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ১০৮; C. D'oyly and H.M Parker, *Observations Upon the Transit and Town Duty System of the Bengal Presidency;* C.E. Trevelyan, *A Report Upon the Inland Customs and Town-Duties of the Bengal Presidency;* নির্মল গুপ্ত, *ঢাকার কথা*, ৫৪; এধরণের অভ্যন্তরীণ শুল্ক যে কি দারুণ বোঝা হিসেবে ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল তা এগুলি তুলে দেয়ার পর সুতি বস্ত্রেও এবং খুচরা কাপড় পোশাকের ব্যবসার আধিক্য থেকেই উপলব্ধি করা যায়। শুল্ক আদায়ের শেষ বছওে অর্থাৎ ১৮৩৪-৩৫ সালে ঢাকা কাস্টম্‌স থেকে যে পরিমাণ কাপড়-পোষাকাদিও উপর শুল্ক বসানো হয়েছিল তার মূল্য ছিল ৩,৮৭,০০০ টাকা, ১৮৪২-৪৩ সালে সেই পণ্য দ্রব্যেও মূল্য হয় ৯,৩৬,০০০/- টাকা। শরীফ উদ্দিন আহমদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স, ২০১০), ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

একেবারে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সাথে ঢাকায় কোম্পানীর বাণিজ্য অফিস বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।[৪] এভাবে ভূতপূর্ব শাসকগোষ্ঠীর গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বহু সংখ্যক লোক বেকার হয়ে পড়ে এবং বিকল্প জীবিকার সন্ধানে তারা নগরী ত্যাগ করে। ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রম সকল ক্ষেত্রেই ঢাকার মারাত্মক অবনতি ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে ১৮৪০ সাল থেকেই ঢাকার পুনরুত্থান শুরু হয়। ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ব্রিটিশ শাসকদের নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নুতন নীতিমালা গ্রহণ ঢাকার জীবনে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে এবং ঢাকা আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।[৫]

উল্লেখ্য, ঢাকার ঐতিহ্য খুঁজতে আমাদেরকে আরো অতীতে যেতে হয়। ভারত অধিপতি মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্ণিত আছে তিনি 'ডবাক ও সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন'। সমতটের সাথে পাশাপাশিভাবে ডবাকের উল্লেখ থাকায় উহা আধুনিক ঢাকাকেই বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই[৬]। সুলতানি আমলে ঢাকা নামটি স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের বীরভূমে একটি মসজিদে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে। শিলালিপিটির উৎকীর্ণের সন ৮৬৪ হিজরি মোতাবেক ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। এ সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনউদ্দিন বারবক শাহ। শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাতার নাম লেখা আছে তারবিয়াত খানের পুত্র উলুঘ আজালকা খান। তিনি শহর ঢাকা'র প্রধান গুমস্তাহ (খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তা)[৭]। অর্থাৎ ঢাকা যে এই অঞ্চলের একটি মৌলিক নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল আমলের এক পর্যায়ে ঢাকার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও একশো বছর পরেই ঢাকা কিছুটা আত্মমর্যাদা হারায় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে (১৭১৫-১৬ সালে) যখন নবনিযুক্ত সুবাদার মুর্শিদকুলী খান ব্যক্তিগত কারণে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তবে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ঢাকা ছিল বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম নগরী[৮] কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ তথা ১৮৪৭ সালে ঢাকায় মুদ্রণ যন্ত্রের আমদানি পূর্ববঙ্গের প্রকাশনার জগতে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকায় প্রথম মূদ্রণ যন্ত্রটি এনেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা। প্রধানত মিশনারীদের প্রচারপত্র ও রিপোর্ট ছাপার জন্য তা ব্যবহৃত হতো[৯]। ১৮৫৬ সালে ঢাকায় আরেকটি মূদ্রণ যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যার নাম *ঢাকা প্রেস*। যেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার প্রথম সংবাদ পত্র এবং পূর্ববঙ্গ

---

[৪] James Taylor, *A Sketch of Topography and Statistcis of Dhaka;* শরীফ উদ্দিন আহমদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স, ২০১০), ১০৩-০৪।

[৫] শরীফ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ঢাকা কোষ* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২), ১৬৮।

[৬] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র প্রকাশনা, ২০০৭), ৩০৭।

[৭] Abdul Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), 151.

[৮] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৭), ৩৩৫।

[৯] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০১৪), ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক *দি ঢাকা নিউজ* পত্রিকা। উল্লেখ্য যে, মিশনারীদের মুদ্রণ যন্ত্র এবং *ঢাকা প্রেস* মূদ্রণ যন্ত্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না? এই প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যায় গ্রাহাম শ এর বর্ণনায়। তিনি উল্লেখ করেছেন- ঢাকা প্রেস নতুন কোনও মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না। এটি ছিল ব্যাপটিস্টদের আমদানীকৃত ১৮৪৭ সালের মূদ্রণ যন্ত্র। *দি ঢাকা নিউজ* সম্পাদক আলেকজান্ডার ফর্বেসের সঙ্গে ব্যাপটিস্টদের সম্পর্ক ছিল ভালো। তিনি তাদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। ব্যাপটিস্টরা হয়তো তাঁকে মূদ্রণ যন্ত্রটি দিয়েছিলেন অথবা ফর্বেস সামান্য টাকার বিনিময়ে তা কিনে নিয়েছিলেন[১০]। এভাবে ধর্মীয় প্রকাশনার গণ্ডি পেড়িয়ে পূর্ববঙ্গের সাধারণ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ঘটনা এক ধরণের বিপ্লব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই একাধিক পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে ঢাকা থেকে। এসমস্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর কোন কোনটি ব্যাপক পাঠক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপি ঢাকার মানুষের খবরাখবর অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দিতে থাকে। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বাংলা/ইংরেজি বই, সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে।

সাধারণত সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র একটি সমাজ তথা দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। সাধারণভাবে সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের দৈনন্দিন নানা ঘটনার পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক অসঙ্গতিও তুলে ধরা হয়। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থা ও পাঠকের নিবিড় সম্পর্ক জরুরী হলেও আরেক ধরণের মানুষ এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তারা হলেন ব্যবসায়ী শ্রেণি। তারা সবসময়ই চেষ্টা করে থাকেন তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর তথ্য ও বিবরণ যেন দ্রুত ও সহজে সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হয়। কেননা বলা হয়ে থাকে যে, প্রচারেই প্রসার। প্রচারের ক্ষেত্রে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সাথে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও সমানতালে এগিয়ে যায়। যেমন বইপত্র শুরু করে ঔষুধ, আধুনিক যন্ত্রাংশ, জমি বিক্রয়সহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচারণা সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে থাকে। এমন কি শিক্ষক চাই, ছাত্র চাই বিষয়ে ফলে সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ দাঁড়ায় বিজ্ঞাপন। পরবর্তাতে বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এই বিজ্ঞাপনচিত্রের ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মানুষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সাধারণত লেখনী বা বিবরণীর পাশাপাশি একটি ঘটনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে চিত্র বা ছবি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে চিত্রাঙ্কন অবশ্যই বাণিজ্যিক চিন্তাধারার প্রতিফলন বলেই মনে হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারের সূচনালগ্নে শুধুমাত্র লেখার ফন্ট সাইজ বড় ও মোটা করার মাধ্যমে পাঠক কিংবা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অভিনব মাধ্যম হিসেবে চিত্রাঙ্কন ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকা থেকে সবচেয়ে বেশি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এসকল সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রে যে বিজ্ঞাপন চিত্র ছাপা হতো সেগুলোর বিশ্লেষণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে তৎকালীন ঔপনিবেশিক

[১০]মুনতাসীর মামুন উদ্ধৃত, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০১৪), ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমলের পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তর নগরী ঢাকার আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার ইতিহাস অন্বেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

ঔপনিবেশিক আমলে বিশেষ করে ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন চিত্রের ব্যাপকতা দেখা যায়। তৎকালীন ঢাকার তথা পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনের নানাবিধ কর্মকাণ্ড, যাপিত জীবনের নানারূপ, প্রথা, রীতি প্রভৃতি বিজ্ঞাপন চিত্রে ফুটে উঠে। অথচ এ সকল বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঢাকার পরিবেশ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের অনুল্লেখ্য অবস্থা অনুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এমতাবস্থায় বর্তমান গবেষণা কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

(ক) ১৮৬১-১৯৪৭ সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের বিষয়বস্তুর ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা এবং

(খ) বিজ্ঞাপন চিত্রের আলোকে তৎকালীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ অনুসন্ধান করা।

গবেষণা পরিধি (Scope of the Study)

সাধারণত গবেষণা পরিধি বলতে একটি গবেষণা কর্মের সীমানা ও ব্যাপ্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেহেতু বর্তমান গবেষণা কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের বিষয়বস্তুর ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে তৎকালীন ঢাকার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। সেজন্য মুদ্রণ যন্ত্রে পত্রিকা প্রকাশনার সূচনালগ্ন থেকে প্রথম এক শতাব্দী কালকে বাছাই করা হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বললে সময়কালটি হলো ১৮৬১- ১৯৪৭ যা গবেষণা শিরোনামেই উল্লিখিত আছে। এই সময়কাল নির্ধারণের কারণসমূহ নিম্নরূপ-

প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় ১৮৪৭ সালে ঢাকায় প্রথম মূদ্রণ যন্ত্রের আমদানি করা হয় এবং তা শুধুমাত্র ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের প্রচারপত্র ও রিপোর্ট ছাপানোর কাজেই ব্যবহার করা হতো। যেহেতু সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিল না সেহেতু গবেষণা শিরোনাম ও এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, ১৮৫৬ সালে *ঢাকা প্রেস* মুদ্রণ যন্ত্র থেকে ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র এবং পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক হিসেবে *দি ঢাকা নিউজ* প্রকাশ শুরু হয়। উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যাগুলোর দুষ্প্রাপ্যতা গবেষককে ব্যাপকভাবে নিরাশ করেছে। এছাড়াও সাময়িকপত্রটি শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে অর্থাৎ মাত্র ১৫ বছর কাল স্থায়ী ছিল এই পত্রিকার বয়স। ১৮৬৯ সালে মালিকানার যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি নামেরও পরিবর্তন হয় *দি বেঙ্গল টাইমস্*হিসেবে। এটিরও প্রাথমিক ৬ বছরের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। ফলে উপকরণ ও উপাদান সংকট মারাত্মকভাবেই ভোগাবে বলেই সঙ্গত কারণেই ঐ পত্রিকার প্রকাশের সূচনা সালকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে। অপরদিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ১৮৬১ সাল থেকে প্রকাশ শুরু হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় বলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশ অব্যাহত থাকে। এই পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ১৯৬৩ সাল ও তার পরবর্তী সাল গুলোর এক বা একাধিক সংখ্যাগুলো সংরক্ষিত আছে। ফলে উৎস, উপাদান ও উপকরণ সংকট অনেকাংশেই কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* এর সুখ্যাতি নিয়ে একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাহলো- 'ঢাকা প্রকাশ' দীর্ঘকাল টিকে থেকে একটি অনন্য সাপ্তাহিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকার সামাজিক অবস্থার উপস্থাপনে 'ঢাকা প্রকাশ' প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আজও সমাদৃত[১১]।

তৃতীয়ত, ১৮৬১ সালকে গুরুত্ব দেওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো- বাংলা ভাষা, বাংলা হরফ এবং বাঙালির মালিকানা। মুদ্রণযন্ত্র সাধারণত মানসিক গড়নের যে পরিবর্তন আনে তার সূত্রপাত হয়নি তখন। তবে সেটি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। তখন ঢাকায় ৩য় মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়। নাম 'বাঙলা যন্ত্র'। এর বৈশিষ্ট্য, এটির মালিকানা ছিল বাঙালির, ঢাকা শহরের বাংলা বইপত্রের ছাপা শুরু হয়েছিল এখান থেকে। শুধু তাই নয় এটা ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্রও ছাপে[১২]। এই মন্তব্যে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকাবাসীর মানসিক গড়নের পরিবর্তন সূচনা ১৮৬০ সালে। আর ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রকাশনার মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পত্রিকাটি প্রচারের মাধ্যমে অঘোষিতভাবেই 'বাংলা যন্ত্র' এর নাম দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। লেখকগণ আশায় বুক বাঁধে এই ভেবে যে, এখন আর মূল পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোলকাতায় প্রেস মালিকদের কাছে দিনের পর দিন ধরণা দেয়া লাগবে না। ফলে ঢাকা ও এর আশপাশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাংলাভাষী নবীন, প্রবীণ লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, বাংলা সাহিত্য জগতে ১৮৬১ সালের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। সাহিত্য বিশারদগণ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে বেশ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। যার মধ্যে

[১১]কাজল ঘোষ, *নানা রঙের ঢাকা* (ঢাকা: নালন্দা প্রকাশন, ২০০৯), ১৩০।

[১২]আফরোজা সোমা, "মুদ্রণযন্ত্র এবং উনিশ শতকের জটিল ও কলরবমুখর ঢাকা", এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত, *ঢাকার ৪০০ বছর* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ও দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ২০০৯), ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় কালপর্বের সূচনা ১৮৬১ সাল। এই সালেই জন্ম গ্রহণ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ১৮৬১ সালে রচিত হয়। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সূচনা সাল হিসেবে ১৮৬১ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনাবসান হয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি তথা ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেসজন্য এই সালটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ঊনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের তথ্য বিভিন্ন বিবরণে পাওয়া যায়। তবে বর্তমান গবেষণা কর্মের শিরোনামেই যেহেতু পত্রিকা প্রকাশ স্থান হিসেবে ঢাকা উল্লেখ আছে ফলে পূর্ববঙ্গের অনেক পত্রিকাই সঙ্গত কারণে আমাদের গবেষণার পরিধির অন্তর্ভূক্ত হয়নি। আবার কোন কোন পত্রিকার প্রকাশ স্থান ও সময়কাল ঠিক থাকলেও অল্পদিন স্থায়ীত্ব, বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনচিত্র না থাকা, বিদ্যমান কপির দুষ্প্রাপ্যতার কারনে সেগুলোকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেজন্য বর্তমান গবেষণায় ঢাকা ও তার আশপাশের অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ও পাঠক নন্দিত বাংলা সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* ও ইংরেজি সাপ্তাহিক *দি বেঙ্গল টাইমস্* পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রকৃতি, ধরণ ও বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করে ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Study)

ঢাকা অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য পাঠ ও পঠনে রয়েছে নানাবিধ উপাদান যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তাকারে রয়েছে প্রাক মুঘল আমলে পরিচিত বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি নামে খ্যাত ঢাকার অলিগলিতে। ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ছিল ঢাকা। সে সময় গোটা পূর্ববঙ্গ ছিল অবহেলিত একটি জনপদ। ফলে ঢাকার অবস্থা আহামরি ভালো ছিল না বললেই চলে। যেখানে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানর তাদের নিয়োগকে মনে করতেন শাস্তি হিসেবে[১৩]। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের স্থানীয় অধিবাসীগণ ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ার গুরুত্ব ভালোভাবেই অনুধাবন করা শুরু করে। এজন্য ঢাকাকে কেন্দ্র করেই চলে স্বদেশী আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর ঢাকা আবার রাজকীয়ভাবে স্বমহিমা ও মর্যাদায় সমাসীন হয় যার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। শহর হিসেবে ঢাকার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন হলেও এটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা কর্ম পরিচালনার সূচনা হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ারও প্রায় ২০

[১৩] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৭), ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বছর পর। নির্দিষ্ট করে বললে- ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক ও একটি দেশীয় সম্মেলন ঢাকায় আয়োজনের মাধ্যমে। এর পরে নানাভাবে ঢাকা শহরকেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

১৮৬১-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সাময়িকপত্রের বিভিন্ন খবর ও বিজ্ঞাপন চিত্রের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেকালের ব্রাহ্ম সমাজ, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক ও নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও আকুলতা প্রকাশের প্রধান হাতিয়ার বা মাধ্যম ছিল সাময়িকপত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের সুখ, দু:খ, আশা, আকাঙ্ক্ষার নানাদিক সম্পর্কে ঐ যুগের সাময়িকপত্রের মধ্যে বহু উপকরণ বিক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে। সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণপূর্বক ঊনিশ শতকের ঢাকার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা উদ্ঘাটনে এখন পর্যন্ত কোন গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। ঊনিশ শতকের ঢাকার সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রের ধরণ ও বৈচিত্র্য বিষয়ে বক্ষমাণ গবেষণাকর্মটি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য নব চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

বর্তমান গবেষণাটি প্রকৃতিগত দিক দিয়ে একটি গুণগত আকারের (Qualitative Form) গবেষণা, যেখানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)[১৪] এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method)[১৫] অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে গবেষককে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণে প্রাথমিক (Primary Source) ও মাধ্যমিক (Secondary Source) উভয় ধরনের উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যেহেতু ঢাকার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের বিষয়বস্তুর ধরণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা সেহেতু গবেষণা কর্মটির প্রাথমিক উৎস হলো ঊনিশ শতকে ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ঊনিশ শতকের বিভিন্ন

[১৪] 'ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এ কারণে যে, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, বিবর্তনের সূত্র, সামাজিক সমস্যাসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য। কোন ঘটনার উদ্ভব এবং বিকাশধারা বুঝতে হলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। মানুষ মাত্রই অতীত সম্পর্কে জানতে চায়, ফলে সমাজ গবেষকদের মানুষের সে চাহিদা পূরণ করতে হয়। কেবল ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তা করা যায়।' খুরশীদ আলম, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ২০০৩), ২৩-২৪।

[১৫] 'গণসংযোগের মাধ্যমসমূহ যথা সংবাদপত্র, ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যেও রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়। এটি সংবাদপত্রসহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, নিউজ লেটার, সাময়িকী ইত্যাদিতে প্রকাশিত তথ্য থেকে সমাজের কোন বিষয়ে গবেষণা করার এক চমৎকার কৌশল। এক্ষেত্রে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সংশয় খুব একটা থাকে না।' খুরশীদ আলম, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ২০০৩), ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এতদ্বসংক্রান্ত বই, পুস্তক, প্রবন্ধ, জার্নাল, বিভিন্ন গেজেটিয়ার, সরকারি রিপোর্ট ও গবেষণা প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান অভিসন্দর্ভটির টীকা, টিপ্পনি ও গ্রন্থসূত্র ব্যবহারে শিকাগো ম্যানুয়াল অব স্টাইল (সংক্ষেপে সিএমএস) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

সাধারণত সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে গবেষণা সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই, জার্নাল, রিপোর্ট ও রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহ, নির্বাচন এবং পাঠ ও মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। যেহেতু ঢাকার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের বিষয়বস্তুর ধরণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা সেহেতু গবেষণা কর্মটির প্রাথমিক উৎস হলো উনিশ শতকে ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। এক্ষেত্রে জেমস টেইলর রচিত *দি স্কেচ অব টপোগ্রাফি এণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স অব ঢাকা* গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ*, *সোম প্রকাশ*, দি বেঙ্গল টাইম্‌স প্রভৃতি প্রাথমিক উৎসের পর্যায়ভুক্ত। দ্বৈতয়ীক উৎস তথা মাধ্যমিক সাহিত্য হিসেবে বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত মুনতাসীর মামুনের *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৩য়, ৪র্থ ও ৮মখণ্ড গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। গ্রন্থটির ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের উপর লিখিত এবং ৮ম খণ্ড *দি বেঙ্গল টাইমস্‌*পত্রিকার সংকলন। *দি বেঙ্গল টাইমস্‌*পত্রিকার কিছু সংখ্যা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এ বিষয়ে ৮ম খণ্ডের ভূমিকার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লেখক বলেন, ১৯৭৯-৮০ সালে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে কাজ করার সময় আমি 'বেঙ্গল টাইমস' এর ১৮৭৬-১৯০৫ সালের সংখ্যাগুলি খুঁজে পাই। ইণ্ডিয়া অফিস ছাড়া এ পত্রিকার কোন সংখ্যা আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই[১৬]। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুইটিতে সংবাদ ও প্রবন্ধ তথা বিভিন্ন লেখনী এবং বিজ্ঞাপনগুলো হুবহু সংকলিত হয়েছে বলে লেখক দাবি করেছেন। ঢাকার মুদ্রণ যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মুনতাসীর মামুন রচিত *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা [১৮৪৮-১৯০০]* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪) এছাড়াও একই লেখকের *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৭), *ঢাকা সমগ্র-৪* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৬), *ঢাকা:স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০১৪), *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশনা, ২০১৭), যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত *ঢাকার ইতিহাস* ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র প্রকাশনা, ২০০৭), নাজির হোসেন কর্তৃক রচিত *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপার সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত *ঢাকার ৪০০ বছর* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯), শরীফ উদ্দিন আহমেদ রচিত *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর*

[১৬]মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), ভূমিকা ৪ [এগারো]।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ১৮৪০-১৯২১(ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০১০), কাজল ঘোষ রচিত *নানা রঙের ঢাকা* (ঢাকা: নালন্দা প্রকাশনা, ২০০৯) প্রভৃতি গ্রন্থের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোর আলোচনা ও বর্ণনা বিশ্লেষণ করে জানা যায় সাময়িকপত্রের সংবাদ ও প্রবন্ধ নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও বিজ্ঞাপন চিত্রের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সূত্র ধরেই ঊনিশ শতকের ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনে কোন গবেষণা অদ্যাবধি চোখে পড়ে না। যা বক্ষমাণ গবেষণায় স্বার্থকতার সহিত প্রস্ফূটিত হয়েছে।

শিরোনামের মূল শব্দের সংজ্ঞায়ন

ক) ঢাকা

আজকের ঢাকা শহরের সীমানা বিভিন্ন শাসনামলে যেমন পরিবর্তিত হয়েছিল ও তেমনি নাম পরিচয়েরও নানা রকমফের খুঁজে পাওয়া যায়। তবে স্থানীয়রা বোধ করি 'ঢাকা' নামের সাথেই বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শহর হিসেবে ঢাকা'র মর্যাদা বহুগুণে বেড়েছিল মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে। যখন সুবেদার ইসলাম খান এতদ্বাঞ্চল বিজয় সম্পন্ন করেন এবং রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে ঘোষণা করেন। এটির নাম পরিবর্তন করে সম্রাটের নামে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করেন। ইসলাম খানের আগমণের পূর্বে এখানে কী ছিল? শহর না পল্লী? তা জানার উপায় নেই। ইউরোপীয় পর্যটক ও মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ভ্রমণ করে নগরীকে 'বেনগলা' বলে উল্লেখ করেছেন। বেনগলা'র পূর্ব ইতিহাস রহসাবৃত ষোড়শ শতাব্দীতে পরিব্রাজক মেথল্ড রাজমহল ও বেনগলাকে সুদৃশ্য নগরী বলে উল্লেখ করেছেন[১৭]।

ঢাকা শহরের নামকরণের আদ্যপান্ত বিশ্লেষণে নানা রঙের গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকা নামের সাথে মিল থাকায় সাধারণ্যে প্রচলিত যে ঢাকেশ্বরী দেবী বা মন্দিরের নামের সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। একটি জনশ্রুতি মতে, পুরান ঢাকার কোন এক স্থানে বনের ভেতরে একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। তাঁকে ঢাকা শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়। এই দেবীর নাম ঢাকেশ্বরী আর এখান থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। এটির ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করার উপায় নেই। বলা হয় বিক্রমপুরে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা অদিশূর স্বপ্নে দৈব আদেশ পান। সেই আদেশ মতে তিন তাঁর এক রাণীকে বুড়িগঙ্গার উত্তরে এক বনে নির্বাসনে পাঠান। এই রাণীর গর্ভে জন্ম নেন বনলাল (বল্লাল) সেন। বনে লালিত পালিত হওয়ায় মা তার নাম রাখলেন বনলাল[১৮] এই নবজাতক ও তার মাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন দেবী দূর্গা। একদিন বল্লাল সেন বনের ভেতর লুকানো অবস্থায় দেবী

[১৭]নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), ১৪।
[১৮]যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* (কলিকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ২০০০), ২১৩;এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ঢাকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৮), ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

দূর্গার মূর্তিটি দেখতে পান। রাজা হওয়ার পর বল্লাল সেন যেখানে দূর্গামূর্তি ঢাকা বা লুকানো ছিল সেখানে মন্দির নির্মাণ করেন। দেবী বা ঈশ্বরী 'ঢাকা' ছিলেন বলে মন্দিরের নাম রাখা হয় ঢাকেশ্বরী। এভাবে মন্দিরের আশেপাশের এলাকা 'ঢাকা' নামে পরিচিত হয়। আবার অনেকে এই কাহিনীর সূত্র ধরে বলতে চান যে, ঢাকা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই তাঁর নাম হয় ঢাকেশ্বরী। এই জনশ্রুতির ভিত্তি নেই। কারণ প্রত্নসূত্র মতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি প্রথম স্থাপিত হয় মুঘল যুগে[১৯]। এটির বয়স দু'শ বছরের কিছু অধিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়[২০]। ফলে সঙ্গত কারণেই ঢাকেশ্বরী দেবী বা মন্দির কেন্দ্রীক জনশ্রুতিটি যথার্থ বলে মনে হয় না।

আরেকটি মতে, ঢাকায় প্রবেশ করে সুবাহদার ইসলাম খান ঢাকের শব্দ শুনতে পান। তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে যায়। এখানে তিনি শহর গড়বেন। কতটা বড় হবে এর সীমা! মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। একজন ঢাকিকে ডেকে আনা হলো। চারজন লোক পাঠালেন চারদিকে। এবার ঢাক বাজানো হলো। ঢাকের শব্দ যতদূর গেল অতটা জায়গা জুড়ে গড়লেন নতুন শহর। ঢাকের শব্দ থেকে শহর তাই শহরটির নাম হলো 'ঢাকা'। আরেক কাহিনী এসব গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই[২১]। আরেকটি মতে, হিন্দু রাজার রাজধানী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও এর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে এস্থানটি ঢেক্কা বা ঢাক্কা তথা ডাক চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে এটা ঢাকা নামে অভিহিত হয়েছে। আরেকটি মতানুসারে, এই স্থানে নদী তীরে প্রাচীন কাল থেকে একটি ঢাক বৃক্ষ ছিল। সে গাছের নাম থেকেই শহরটির নাম ঢাকা হয়েছে[২২]। এই মতটির ঐতিহাসিক ভিত্তিও খুঁজে পাওয়া দায়।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণে 'ডবাক' থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন রায়ের মতে, প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ বিরচিত প্রশস্তিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ী কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে তাঁহাকে সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তপূরাদি প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ কর্তক সর্ব করদান, আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সমতট ও ডবাক এই উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় আধুনিক ঢাকাকেই রাজ্য বলিয়া আমরা মনে করি[২৩]। এই মতামতটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রামান্যতা থাকায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

[১৯]এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ঢাকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৮), ৫৬।
[২০]নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), ১৭।
[২১]এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ঢাকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৮), ৫৩।
[২২] নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), ১৫।
[২৩]যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), ৩০৫-০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি 'ঢাকা' নামের খোঁজ পাওয়া যায় সুলতানী আমলে নির্মিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি মসজিদের গায়ের শিলালিপিতে। শিলালিপিটির উৎকীর্ণের সন ৮৬৪ হিজরী মোতাবেক ১৪৬০ সাল। এ সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনউদ্দিন বারবক শাহ। শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাতার নাম লেখা আছে তারবিয়াত খানের পুত্র উলুঘ আজালকা খান। তিনি শহর ঢাকা'র প্রধান গুমস্তাহ (খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তা)[২৪]। প্রত্নতত্ত্ববিদ এ কে এম শাহনাওয়াজের মতে, বারবাক শাহের পিতা সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় ঢাকা সোনারগাঁওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল বা ইকলিমের রাজধানী ছিল। একারণে ঢাকা শহরের একজন প্রধান গুমস্তাহর পক্ষে বাংলা রাজ্যেরই অংশ বীরভূমে মসজিদ নির্মাণ করে দেয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। শিলালিপিতে আজালকা খানকে স্পষ্টতই 'কসবা দাখা (ঢাকা) খাস' অর্থাৎ দূর্গ দেওয়াল বিহীন গুরুত্বপূর্ণ শহর ঢাকা বলা হয়েছে[২৫]। ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক সাদৃশ্যতা থাকায় শেষোক্ত এই মতটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, নিকট অতীতে শহর ঢাকা ১৬০৮/১০, ১৯০৫, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালে অর্থাৎ চার বার রাজধানী হওয়ার গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী হয়।ঢাকার নাম পরিচয় নিয়ে বিভ্রাট কিংবা মতবিরোধ থাকাই স্বাভাবিক। তানাহলে ঢাকার প্রাচীনতা অনুসন্ধানে গবেষকরা একদিন হয়তো আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

খ) সাময়িকপত্র

সাময়িকপত্র একটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজিতে এটিকে Magazine, Periodical প্রভৃতি বলা হয়। সাধারণত যদি কোন পত্রিকা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ধারাবাহিকভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রকাশিত হয় তাকে সাময়িকপত্র, সাময়িকী বা ম্যাগাজিন বলা হয়। সাময়িকীর সংজ্ঞায় *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সমসাময়িক ঘটনাবলি বা প্রসঙ্গ সম্পর্কিত পত্রিকা।[২৬] একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এগুলোর নামও ভিন্ন হয়ে থাকে। যথা- প্রতি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হলে তা সাপ্তাহিক, প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার প্রকাশিত হলে তা পাক্ষিক, প্রতি মাসে একবার প্রকাশিত হলে তা মাসিক, প্রতি তিন মাসে একবার প্রকাশিত হলে তা ত্রৈমাসিক, প্রতি ছয় মাসে একবার প্রকাশিত হলে তা ষান্মাসিক কিংবা প্রতি একবছরে একবার প্রকাশিত হলে তাকে বার্ষিক বলা হয়। সংবাদপত্রের সাথে সাময়িকপত্রের মূল পার্থক্য হলো- এটি প্রত্যহ প্রকাশিত হয় না এবং তাৎক্ষনিক সংগঠিত সংবাদের দিকে এটির কোন ঝোঁক নেই। এছাড়াও

[২৪]Abdul Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), 151.

[২৫]এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ঢাকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৮), ৫৬।

[২৬] জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), ১২৩১।

সাময়িক পত্রের কাগজ সাধারণত দৈনিক পত্রিকা অপেক্ষা উন্নতমানের হয়ে থাকে এবং তা বাঁধাই আকারে থাকে। এমনকি মূল্যের বিষয়টিও সাময়িকপত্রের বেশি হয়ে থাকে। সাময়িকপত্রের আরেকটি বিশেষত্বের দিক হল- এটিতে সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ের আদ্যোপান্ত আলোচনা বা পর্যালোচনার সমাহার দেখা যায়। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, প্রবন্ধ, রন্ধনশৈলী, গৃহপরিচর্চা প্রভৃতি বিষয়বস্তুর উপর লিখিত আলোচনা দিয়ে সাজানো থাকে সাময়িকপত্রে। এককথায় বলা যায়, সাময়িকপত্র থেকে যেকোন সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির ভাবনাগুলো সন্নিবেশিত আকারে পাওয়া যায়।

গ) বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন একটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজিতে এটিকে Advertisement বলা হয়। বিজ্ঞাপন শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞাপন, নিবেদন। পারিভাষিকভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা পরিষেবা সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়[২৭]। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*'র ভাষ্যমতে- Advertising is the techniques and practices used to bring products, services, opinions, or causes to public notice to persuade the public to respond in a certain way toward what is advertised. Besides promoting goods for sale, advertising methods are used to encourage people to drive safely, support various charities, vote for political candidates, etc. অর্থাৎ বিজ্ঞাপন হলো এমন কৌশল এবং অনুশীলন যা পণ্য, পরিষেবা, মতামত বা কারণগুলিকে জনসাধারণের নজরে আনার জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে জনসাধারণ বিজ্ঞাপনের প্রতি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রচারের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন মানুষকে নিরাপদে গাড়ি চালানো, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করা, রাজনৈতিক প্রার্থীদের ভোট দেওয়া ইত্যাদিতে উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয়ে থাকে [২৮]।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় প্রাচীন মিশরে বিক্রয় বার্তা এবং দেয়াল পোস্টার তৈরিতে প্যাপিরাস ব্যবহার করা হতো। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য দেয়াল বা পাথরের চিত্রকর্ম তৈরির উদাহরণও এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেকাংশে বিদ্যমান[২৯]। প্রাচীন চীনের যুদ্ধরত রাজ্যকালের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৫- ২২১ অব্দ) সাহিত্যিক উৎসে পাওয়া যায়- একজন বিক্রেতা ভাত থেকে তৈরি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (Rice Wine) বিক্রয় করতে একটি পতাকার ব্যবহার করছেন। তাং রাজবংশের শাসনামলে (৬১৮-৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) সবধরণের উৎপাদিত

[২৭] জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), ৯৬৫।

[২৮] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Advertising." *Encyclopedia Britannica*, July 19, 2025. https://www.britannica.com/money/advertising. (visited at 7pm, 18/08/2025).

[২৯] Tej K. Bhatia, *Advertising in Rural India: Language, Marketing, Communication, and Consumerism* (Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Press,2000), pp.62-68.

পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেড মার্ক (Trade Mark) চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম করা হয়েছিল যা পণ্যের গুণগত মান যাচাইকরণ এবং বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হত[৩০]।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি আসে ১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে। ১৭শ শতাব্দীতে লন্ডনের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে শুরু করে এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে এই ধরণের বিজ্ঞাপনের প্রসার ঘটে। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমগুলো হলো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন এবং রেডিও প্রোগ্রাম, সরাসরি মেইল, বিলবোর্ড, পোস্টার, ট্রানজিট বিজ্ঞাপন এবং বিবিধ মিডিয়া[৩১]। একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের উৎপাতি পণ্যের প্রতি আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন।

ঘ) চিত্র

চিত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ অঙ্কিত প্রতিকৃতি।[৩২] মানুষের আঁকা সবচেয়ে পুরানো চিত্র আজ অবধি যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়স পনেরো হতে বিশ হাজার বছরের কাছাকাছি।[৩৩] যদিও সেসময়কার চিত্রগুলো আঁকা হয়েছে গুহার অভ্যন্তরে। উত্তর স্পেনের আলতামিরা গুহায় ১৫ হাজার বছর এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের লাসকো গুহায় প্রায় ২০ হাজার বছর পূর্বে আদিম মানুষের দ্বারা চিত্রকলা অঙ্কিত হয়েছে। তারা নিজেদের ধ্যানধারণা ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে রূপদান করার চেষ্টা করেছে। যেসব জন্তুর চিত্র আঁকা হয়েছে সেগুলো হরিণ ও বাইসনের। গুহাবাসী মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল হরিণ ও বাইসনের মাংস প্রধানত যেসব পশু তারা শিকার করতো তাদের চিত্রই গুহার দেয়ালে আঁকা হয়েছে।[৩৪] ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যোগীমারা গুহায়। যোগীমারা গুহা হলো ভারতের ছত্রিশগড়ের পুটা গ্রামের রামগড় পাহাড়ের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রাচীন গুহা স্মৃতিস্তম্ভ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত, এগুলি ব্রাহ্মীলিপি এবং মাগ্‌ধী ভাষায় তাদের অ-ধর্মীয় শিলালিপি এবং এশিয়ার প্রাচীনতম রঙিন ফ্রেস্কোগুলির মধ্যে একটির উল্লেখযোগ্য।[৩৫] এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাস।

---

[৩০] Hong Liu, Chinese Business: Landscape and Strategies, 2nd edition (New York: Routledge-Taylor and Francis Group, 2018) P. 42.

[৩১] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Advertising." *Encyclopedia Britannica*, July 19, 2025. https://www.britannica.com/money/advertising. (visited at 7pm, 18/08/2025).

[৩২] জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), ৪৬২।

[৩৩] কামাল আহমদ, *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), ০৮।

[৩৪] কামাল আহমদ, *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), ১০।

[৩৫] Percy Brown, *The Heritage of India: Indian Painting* (New Delhi, Association Press, 1918). p. 16–18.

সর্বোপরি বলা যায় যে, অত্র গবেষণাকর্মে সাময়িকপত্রের প্রকাশনা স্থান হিসেবে 'ঢাকা'কে বেছে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো সঙ্গত কারণে বাদ পড়েছে। সময়কালের সূচনা হিসেবে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সূচনাকাল ১৮৬১ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং ভারতের ব্রিটিশদের শাসনাবসান ও ভারতের স্বাধীনতা ও বিভক্তিকে বিশেষ গুরুত্ববহ বিবেচনায় ১৯৪৭ কে সমাপ্তি সাল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যদিকে শুধুমাত্র চিত্রকে মূল উপজীব্য হিসেবে বিবেচনার কারণে অসংখ্য লিখিত তথা চিত্রবিহীন বিজ্ঞাপনকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ

ঢাকায় মূদ্রণযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

চীনে প্রথম কাগজ শিল্পের উদ্ভব ও পরবর্তীকালে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞান চর্চার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের অতীত ইতিহাস লিখে রাখা হতো মাটি, কাঠ, পাথর, গাছের বাকল বা পশুর চামড়ায়। কিন্তু এই কাজ ছিল সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তাই যখন কাগজের আবিষ্কার হলো তখন জ্ঞান চর্চা ও ইতিহাস চর্চায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। ইউরোপে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারকে জ্ঞানচর্চা ও ইতিহাস চর্চার এক বিরাট মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁর মাধ্যমেই মুদ্রণ শিল্পের নব যুগের সূচনা হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে জার্মানির গুটেনবার্গের নাম প্রায় সকলেরই জানা। যিনি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তাঁর আবিষ্কৃত হস্তচালিত মুদ্রণ যন্ত্রের কিছুটা আধুনিকায়ন করেন তাঁরই স্বদেশী ফ্রেডারিক কোয়েনিগ (Friedrich Gottlob Koenig) ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। যিনি সিলিন্ডার মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। কোয়েনিগ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে *The Times* পত্রিকার জন্য একটি সিলিন্ডার প্রেস নির্মাণ করেন। শিল্পবিপ্লবের ফলে রেনেসাঁ যুগের আধুনিকতায় আসলো নতুন রূপ। এ সময়ে নগর ভিত্তিক বসতিবৃদ্ধি এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন দলিল প্রভৃতি লেখার জন্য মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধিপেতে থাকে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় ছাপাখানার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি সংবাদপত্রের চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে মুদ্রণ যন্ত্রের আমদানি ও প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব মুদ্রণ যন্ত্রের বা ছাপাখানার স্থপতিরা ছিলেন ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্তা ব্যক্তি। যারা ইতোপূর্বে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার করার জন্য।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয়দের মধ্যেপ্রথমবারের মতো আগমন করেন পর্তুগিজগণ। তারা ভারতের গোয়ায় বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক কারণে দুটি মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন। এখান থেকে মুদ্রিত প্রথম বইটি ছিল '*কনক্লুজেস' (Conclusoes)* যা পর্তুগিজ ভাষায় রচিত। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা দূর্গে একটি ছাপাখানা নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এটি ছিল সম্ভবত উত্তর ভারতের প্রথম ছাপাখানা। প্রথম দিকে চৈনিক, গ্রীক, পর্তুগীজ, আরবী ও ফার্সি ভাষার ব্যবহার হলেও বাংলা অক্ষরের ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে। চার্লস উইলকিন্স (Charles Wilkins) প্রথম ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুত করেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড রচিত

A Grammar of the Bengali Language প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যা চার্লস উইলকিন্স খোদাই করেছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে যখন শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয় তখন উইলিয়াম কেরী সাহেব তাঁর *বাইবেল* মুদ্রণের জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঢাকায় মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সূচনা ঘটে। আবার পূর্ব বঙ্গের প্রথম ছাপাখানা ঢাকাতেও স্থাপিত হয়নি। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। যেখানে *'রংপুর বার্তাবহ'* প্রকাশিত হয়। আলেকজান্ডার ফরবেস (Alexandar Forbes) নামক একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম ঢাকায় ছাপাখানা স্থাপন করেন। অনেকেরই ধারণা 'ঢাকা নিউজ প্রেস'ই ঢাকায় স্থাপিত প্রথম ছাপাখানা। তবে এই প্রেস নির্মাণের কয়েক বছর পূর্বে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'কাটরা প্রেস' নামে একটি ইংরেজি অক্ষরের মুদ্রণ যন্ত্র ছিল বলে জানা যায়। *'ঢাকা নিউজ'* নামের একটি ইংরেজি পত্রিকা ঢাকা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে যা ছিল একটি বাণিজ্যিক পত্রিকা। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলা প্রেস' বা 'বাংলা যন্ত্র' নামে ঢাকায় দ্বিতীয় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র। এই ছাপাখানাটি অবশ্য শুধুমাত্র বাংলা মুদ্রণের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে ঢাকায় সর্বমোট তিনটি ছাপাখানা ছিল ।

বর্তমান কালের বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকায় সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সূচনা বা বিকাশের ইতিহাস নিকট অতীতের হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে এধরণের ব্যবস্থার ইতিহাস প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। এই ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদ সংগ্রহের কাজে রাজ-কর্মচারীদের নিযুক্ত থাকতো বলে জানা যায়। কৌটিল্যের তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শাসনকালে এক শ্রেণির কর্মচারীর কাজ ছিল রাজ্যের যাবতীয় খবর রাজদরবারে পেশ করা। মুঘল আমলে প্রশাসনিক জেলায় নিয়োজিত ছিলেন অন্তত একজন ওয়াকিয়া নবিশ, যার দায়িত্ব ছিল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ ও সংকলন রাজদরবারে প্রেরণ করা।[৩৬] বাংলা অঞ্চলে ইংরেজ আমলে প্রথমবারের মতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংবাদপত্র বা সাময়িকী প্রকাশিত হয়। প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্র বলতে যা বুঝানো হয় তা প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতায় ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি। পত্রিকাটির নাম ছিল বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা অ্যাডভাইজার এবং সম্পাদক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। দুই পাতার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত।১৮৫৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশনা শুরু হয় প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিকের যার নাম *ঢাকা নিউজ*। এটি সম্পাদনা করতেন এ. আর ফোর্বস। পূর্ব বাংলা থেকে ১৮৬১-৬২ সালে অন্তত ৪টি সাপ্তাহিকের প্রকাশনা হয়েছিল বলে জানা যায়। যথা- রংপুরের কাকিনা গ্রাম থেকে প্রকাশিত*রংপুর দিকপ্রকাশ*, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *কবিতা কুসুমাবলী*, *মনপঞ্জিকা*ও *ঢাকা প্রকাশ*।

[৩৬]সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ১৩মখণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ১৬৭।

১৮৭৩ সালে বাংলা ভাষায় বঙ্গদেশ থেকে মোট ৩৮ সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো যার মধ্যে মাত্র ১০টি প্রকাশিত হতো পূর্ববঙ্গ থেকে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো ৪টি: *বঙ্গবন্ধু*, *ঢাকা প্রকাশ*, *মহাপাপ এবং বাল্যবিবাহ*। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হতো- *গ্রামদূত*, *বালারঞ্জিকা*, *হিতসন্ধানী*, *বরিশাল বার্তা*। এছাড়াও রাজশাহী থেকে *হিন্দু রঞ্জিকা* এবং রংপুর থেকে *দিকপ্রকাশ* প্রকাশিত হতো। ১৮৬৮ সালে যশোর থেকে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত *অমৃতবাজার* পত্রিকা যা এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণে কলকাতা স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় উচুমানের ইংরেজি অর্ধ-সাপ্তাহিক *বেঙ্গল টাইম্‌স*। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট দশটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়। এসময় অধিকাংশ পত্রিকাই পরিচালিত হতো হিন্দু মালিকানায়। নিরক্ষর মুসলমান সমাজ ক্রমশ শিক্ষিত হয় এবং ধীরে ধীরে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় জাগরণ ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক তৎপরতার বছরগুলিতে বাংলাদেশ অঞ্চলে সংবাদপত্র শিল্প বিকাশের ভিত্তি প্রস্তুত হয়। এসময় বাংলা থেকে প্রকাশিত ১৭৩টি সংবাদপত্রের মধ্যে ৬৫টি পূর্ববঙ্গ থেকে মূদ্রিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল মতামতধর্মী, যেগুলোর উপজীব্য ছিল সাহিত্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা, সংস্কার এবং ধর্ম। পূর্ববাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত জ্যোতি। এর প্রকাশ শুরু হয় ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট। এরপর ১৯২৯ সালে চালু হয় *দৈনিক*, ১৯৩০ সালে *দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা*, ১৯৩৬ সালে *দৈনিক আযান*, ১৯৪৭ সালে *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান*।পাকিস্তান আমলের ১৯৪৭-৭০ শুরুর দিকেও পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র শিল্প কেবল মিশনারি পর্যায় অতিক্রম করছিল। ভারত বিভক্তির সময় আব্দুস সামাদ সম্পাদিত *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* ই কেবল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো। বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ভারত গমনের ফলে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়।

এভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম মাধ্যম ছিল এই সংবাদপত্র প্রকাশনা।ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রটি ছিল জেম্‌স অগাস্টাস হিকি (James Augustus Hicky) এর *'বেঙ্গল গেজেট'*। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। তবে বাংলা সাময়িক পত্রের উদ্ভব এর প্রায় ৩৮ বছর পর। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এটি ছিল শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'দিগদর্শন'* নামের মাসিক পত্র। যার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান (John Clark Marshman)। এছাড়াও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *'সমাচার দর্পণ'*(প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল: ২৩ মে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)। আবার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *'বেঙ্গল গেজেট'* যার সম্পাদক ছিলেন গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়। এটিই ছিল

বাঙালি দ্বারা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিকপত্র। তবে এই পত্রিকা গুলোতে কোন ধরণের চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিত্রের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত '*অন্নদামঙ্গলে*'।

তবে মাসিক পত্রিকায় প্রথম চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় '*তত্ত্ববোধিনী*' পত্রিকায়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাঝে মাঝে এই পত্রিকায় চিত্র প্রকাশিত হতো। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পাদরি লং সম্পাদিত '*সত্যার্ণব*' পত্রিকার প্রথম বর্ষে একটি করে চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলোতে এক বা একাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হতো। তবে প্রথম বাংলা সচিত্র মাসিক পত্রিকা হচ্ছে '*বিবিধার্থ-সংগ্রহ*'। এটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র (প্রকাশক: ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ) ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। এটি বিলেতের '*পেনি ম্যাগাজিন*' এর আদলে প্রকাশিত হতো।

আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে ছাপার অক্ষরে সাময়িক পত্র প্রকাশের আরেক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি সচিত্র পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরকম একটি সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা হচ্ছে '*সত্যপ্রদীপ*' । এটি শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত যার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ছিল ৪ মে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। লালবিহারী দে'র সম্পাদনায় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা '*অরুণোদয়*' প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাস থেকে। আবার '*সচিত্র ভারত সংবাদ*' নামে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরও একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র হচ্ছে '*অমৃতবাজার*' পত্রিকা (প্রথম প্রকাশকাল: ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খ্রি)। এটির সম্পাদক ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। উল্লেখ্য যে, এগুলো ছিল কলকাতা ভিত্তিক সংবাদ বা সাময়িকপত্র।

চিত্রের চিত্রায়নের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও নানান ধরণ ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। যেমন: প্রসাধনীর বিজ্ঞাপন চিত্র, খেলাধুলার বিজ্ঞাপন, অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন জীব জন্তুর বিজ্ঞাপন, ব্যঙ্গচিত্রের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি। ব্যঙ্গচিত্রের প্রথম দেখা মেলে '*অমৃতবাজার*' পত্রিকায়। এছাড়াও '*হরবোলাভাঁড়*' (জানুয়ারি, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) ও '*বসন্তক*'(১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি), '*পঞ্চনদ*'(১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলোতেও ব্যঙ্গ চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

পূর্ব বঙ্গে বাংলা প্রেস ছাপাখানা থেকে বাংলা অক্ষরে বিভিন্ন বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম বাংলা পত্রিকা ছিল '*ঢাকা প্রকাশ*' পত্রিকাটি। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ এবং সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে '*ঢাকা নিউজ*' পত্রিকাটি প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতো। যার সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার ফরবেস। '*ঢাকা বার্ত্তা প্রকাশিকা*' ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্র ভৌমিক এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। '*ঢাকা দর্পণ*' ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় '*বিজ্ঞাপনী*' পত্রিকাটি। '*হিন্দু হিতৈষিণী*' (১৮৬৫ খ্রি.) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন

হরিশচন্দ্র মিত্র। এগুলি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। *'বেঙ্গল টাইমস'* (১৮৬৯ খ্রি.) সপ্তাহে দুদিন প্রকাশিত হতো। বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে *'বঙ্গবন্ধু'* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ঢাকার ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে *'ইস্ট'* (১৮৭১ খ্রি.) নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কালী নারায়ণ রায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *'ঢাকা দর্শক'* (সাপ্তাহিক) এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *'জ্ঞান বিকাশিনী'* (সাপ্তাহিক) নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *'ঢাকা গেজেট'*(সাপ্তাহিক)। *'গরীব'*(১৮৮৬ খ্রি.) নামের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জনৈক কৃষ্ণবাবু। ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্র *'কবিতা কুসুমাবলী'* (১৮৬০ খ্রি.)। মাসিক এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে *'কাব্য প্রকাশ'* (মাসিক) এবং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে *'মিত্র প্রকাশ'* প্রকাশিত হয়। এই সময় *'ধুমকেতু'* (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি ছিল মূলত কথাসাহিত্য মূলক পত্রিকা। এছাড়াও ঊনিশ শতকে আরও বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যেগুলোতে সমাজের নানা অসঙ্গতির সংবাদ প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন চিত্র ছাপা হতো।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা কী ধরনের মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার হতো তা ঠিক জানা যায় না। তবে কোলকাতায় জনপ্রিয় ছিল 'চিলে প্রেস বা কলাম্বিয়ান প্রেস', ইম্পেরিয়াল প্রেস আর অ্যালবিয়ন প্রেস। কোলকাতায় যে সব প্রেস উঠে যাচ্ছিল বা পরিত্যক্ত ছিল সেগুলোই হয়ত অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ঢাকায় আনা হতো। অ্যালবিয়নের যেহেতু ভাল ছাপার সুনাম ছিল সেহেতু ঐ কোম্পানির যন্ত্রগুলোই হয়ত বেশি আমদানি করা হতো। তবে 'ঢাকা প্রকাশ' ছাপা হতো 'চিলা প্রেসে'। ঢাকায় 'বাঙলা যন্ত্র' স্থাপনের পর থেকে উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত কমপক্ষে দশটি মুদ্রণযন্ত্র থেকে ঐ সময়ের দেড়শ করে গ্রন্থ-পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে[৩৭]।

১৮৬১ সালের পর ঢাকা থেকে মুদ্রিত সাময়িকপত্রগুলোর একটি তালিকা হলো-

ক্রমিক নং	সাময়িকপত্রের নাম	প্রকাশ সাল
১.	সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১
২.	সাপ্তাহিক ঢাকা বার্তা প্রকাশিত	১৮৬২
৩.	সাপ্তাহিক ঢাকা দর্পণ	১৮৬৩
৪.	সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী	১৮৬৫

[৩৭] আফরোজা সোমা, "মুদ্রণযন্ত্র এবং উনিশ শতকের জটিল ও কলরবমুখর ঢাকা", এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত, *ঢাকার ৪০০ বছর*, (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ও দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ২০০৯), ২৭৮।

৫.	সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষিনী	১৮৬৫
৬.	সাপ্তাহিক দি বেঙ্গল টাইমস্	১৮৬৯-১৯০৫
৭.	পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু	১৮৭০
৮.	সাপ্তাহিক ঈষ্ট	১৮৭০
৯.	সাপ্তাহিক শুভ-সাধিনী	১৮৭১
১০.	সাপ্তাহিক হিতকরী	১৮৭১
১১.	সাপ্তাহিক ঢাকা দর্শক	১৮৭৫
১২.	সাপ্তাহিক সারস্বতপত্র	১৮৮৩
১৩.	সাপ্তাহিক গরিব	১৮৮৬
১৪.	সাপ্তাহিক গৌরব	১৮৮৮

উনিশ শতকের ১৮৬০-১৮৭০ সালের মধ্যেই ঢাকায় ৫টি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। এগুলো হলো- বাঙলা যন্ত্র, সুলভ যন্ত্র, বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ও গিরিশ যন্ত্র। এই মুদ্রণযন্ত্র তাদের দ্বারা প্রকাশিত সাময়িকপত্রের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন- সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* প্রকাশিত হতো বাঙলা যন্ত্র থেকে, সাপ্তাহিক *হিন্দু হিতৈষিনী* ও *ঢাকা দর্পণ* প্রকাশিত হতো সুলভ যন্ত্র, সাপ্তাহিক *বিজ্ঞাপনী* পত্রিকা প্রকাশিত হতো বিজ্ঞাপনী যন্ত্র থেকে এবং *মিত্র প্রকাশ* প্রকাশিত হতো গিরিশ যন্ত্র থেকে। ১৯০০ সাল পর্যন্ত ঢাকায় স্থাপিত মুদ্রণ যন্ত্রের সংখ্যা কত? G.W Shaw এর একটি রিপোর্টে ৩৩টি[৩৮] মুদ্রণযন্ত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেসময় ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্র কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ঢাকায় অধিকাংশ প্রেস স্থাপিত হয়েছিল বাংলাবাজার মোড় থেকে শুরু করে বাবুবাজার হয়ে বেগমবাজার পর্যন্ত এলাকায়।

ঢাকায় স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রের মালিকানার বিষয়টিতে নজর দিলে দেখা যাবে অধিকাংশ মুদ্রণযন্ত্রের মালিকানাই ছিল ব্রাহ্ম কিংবা রক্ষণশীল হিন্দুদের হাতে। তবে উনিশ শতকের সত্তরের দশকের পর থেকে মুসলমানরাও প্রকাশনার কাজে মনোযোগ বাড়াতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে মোহাম্মদী যন্ত্র ও ইমদাদুল ইসলামিয়া যন্ত্রের মালিকানায়

[৩৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা [১৮৪৮-১৯০০]* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪), ৭৩৭-৭৩৯।

মুসলমানদের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ঢাকায় স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্র ও মালিকদের নামের তালিকা[৩৯] তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক	মুদ্রণযন্ত্রের নাম	মালিকানা ও সময়কাল
১.	কাটরা প্রেস	ইস্ট বেঙ্গল মিশনারী সোসাইটি ১৮৪৮?
২.	ঢাকা নিউজ প্রেস	আলেকজাণ্ডার ফরবেস ১৮৫৬-৫৮; পীতাম্বর শীল ১৮৫৮; খাজা আবদুল গণি, জে.পি ওয়াইজ ও এন পি পোগোজ।
৩.	বাঙ্গালা যন্ত্র	রাম সুন্দর মৌলিক, মদনমোহন বিশ্বাস, ঈশ্বরচন্দ্র বসু এবং কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯-৭০; গোবিন্দ প্রসাদ রায় ১৮৭৬-৭৭; সুরেন্দ্র প্রসাদ রায় ১৮৮৩-৮৩; গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী ১৮৮৫-৮৬
৪.	নতুন যন্ত্র	হিন্দু ধর্ম সভা ১৮৬৯-৭০; ধর্ম রক্ষিণী সভা ১৮৭৬-৭৭; হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা এবং কিশোরী মোহন রায়, যশোদা রায় প্রমূখ ১৮৮০-৮১।
৫.	গিরিশ যন্ত্র	গিরিশ চন্দ্র রায় ১৮৭৬-৭৭, গিরিশ চন্দ্র রায়, মোহন চন্দ্র রায় ও অক্রর চন্দ্র রায় ১৮৮৬-৮৭; কালী প্রসন্ন ঘোষ ১৮৯১-৯২; গিরিশ চন্দ্র রায়, কালী প্রসন্ন ঘোষ ১৮৯৭-৯৮।
৬.	বেঙ্গল টাইমস্ প্রেস	ই সি কেম্প ১৮৭৬-৭৭-১৯০০
৭.	ইস্ট বেঙ্গল প্রেস	কৈলাশ চন্দ্র নন্দী ও কালী নারায়ন রায় ১৮৭৬-৭৭; কালী নারায়ন রায় ১৮৭৯-৮০; বঙ্গ চন্দ্র রায় ও শশিভূষণ রায় ১৮৮১-৮২; বঙ্গ চন্দ্র রায় ১৮৮৫-৮৬-১৯০০।
৮.	মোহাম্মদী যন্ত্র	মুনশী মোহাম্মদ জান ১৮৮২-৮৩; মাহমুদ জান ১৮৯৭-১৯০০।
৯.	ঢাকা প্রকাশ যন্ত্র	(বাঙ্গলা যন্ত্রের নামের সাময়িক পরিবর্তন) গোবিন্দ প্রসাদ রায় ১৮৭৫-৭৬
১০.	রঘুনাথ যন্ত্র	সারস্বত সমাজ ১৮৮২-৮৩ [পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ] ১৯০০।
১১.	শীতল যন্ত্র	পূর্ণচন্দ্র রায় ১৮৮৪-৮৫
১২.	অরিয়েন্টাল প্রেস	১৮৮৬-৮৭ বৈকুণ্ঠনাথ বড়াল ১৯০০।
১৩.	ঈশান যন্ত্র	ঈশান চন্দ্র রায় ১৮৮৬-৮৭; শশিভূষণ রায় ১৮৯১-৯২।
১৪.	শ্যামন্তক যন্ত্র	নদীয়ার চান্দ দাস ও দ্বীন দাস বন্ধু দে ১৮৮৬-৮৭; নদীয়ার চান্দ দাস ১৮৮৮-৮৯; নদীয়ার চান্দ দাস ও মানিকচন্দ্র দাস ১৮৮৯-৯৮; মানিক চন্দ্র দাস ১৮৯৭-৯৭

[৩৯] G.W Shaw, 'printing and publishing in Dhaka 1849-1900' S. Ahmed (ed.), *Dhaka: Past, Present, Future*; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা [১৮৪৮-১৯০০]* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪), পরিশিষ্ট -২, ৭৩৮-৭৩৯।

১৫.	গরীব যন্ত্র	বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য ১৮৮৬-৮৭; বরদা শঙ্কর দাস ১৮৮৭-৮৮
১৬.	আদর্শ যন্ত্র	ললিত মোহন দাস ১৮৮৭-৮৮; ললিত মোহন দাস, মণিমোহন সেন, সতীশচন্দ্র নিয়োগী, মনমোহন রায় এবং ভূবন চন্দ্র সেন ১৮৮৮-৮৯; ও ললিত মোহন দাস, মণিমোহন সেন, ভূবন চন্দ্র সেন ও ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগী ১৮৯৪-৯৫; ললিত মোহন দাস ও অন্যান্য ১৮৯৬-৯৭; ললিত মোহন দাস ১৯০০।
১৭.	ঢাকা প্রেস	ঢাকা লোন অফিস লিঃ ১৮৮৭-৮৮; চন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯০-৯১।
১৮.	জগন্নাথ যন্ত্র	অনাথ বন্ধু মৌলিক ১৮৮৮-৮৯।
১৯.	গেণ্ডারিয়া যন্ত্র	গিরিশ চন্দ্র সেন ১৮৯৬-৯৭।
২০.	বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্র	বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ১৮৯০-৯৪।
২১.	আশুতোষ যন্ত্র	বৃন্দাবন চন্দ্র ধর ১৮৯৩-৯৭।
২২.	মহেশ্বর যন্ত্র	মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ১৮৯৩-৯৭।
২৩.	শ্রীধর যন্ত্র	শরৎ চন্দ্র ধর ও চন্দ্র বিনোদ পাল ১৮৯৩-৯৪; চন্দ্র বিনোদ পাল ও রাধা বিনোদ পাল চৌধুরী ১৮৯৪-৯৫।
২৪.	ইমদাদুল ইসলামিয়া যন্ত্র	মুনশী ইমদাদ আলী ১৮৯৭-৯৮।
২৫.	সুদর্শন যন্ত্র	পবিত্র রমণ গুহ ও ফণিভূষণ ঘোষ ১৮৯৭-৯৭; রাধা রমণ গুহ ও অন্যান্য ১৮৯৬-৯৭; বিশ্ব রমণ গুহ ১৯০০-০১।
২৬.	শঙ্খনিধি যন্ত্র	লাল মোহন সাহা ১৮৯৬-৯৭।
২৭.	গোপীনাথ যন্ত্র	গোপীনাথ বসাক ১৮৯৬-৯৭।
২৮.	নারায়ণ যন্ত্র	লছমন বসাক ১৮৯৭-৯৮। (মহেশ্বর যন্ত্রের নাম ও মালিকানার পরিবর্তন)
২৯.	বেদব্যাস যন্ত্র	অনাথ বন্ধু চক্রবর্তী ১৮৯৭-৯৮।
৩০.	প্রাণ চৈতণ্য যন্ত্র	সীতানাথ বসাক ১৮৯৯-১৯০০।
৩১.	ব্রহ্মবাণী যন্ত্র	মহিমচন্দ্র সেন ১৮৯৯-১৯০০।
৩২.	বিজ্ঞাপনী যন্ত্র	শরৎ চন্দ্র গুহ ১৮৯৯-১৯০০।
৩৩.	রমেশ যন্ত্র	রমেশ চন্দ্র রায় ১৮৯৯-১৯০০।

পূর্ববঙ্গের অন্যতম নগরী ঢাকায় স্থাপিত মুদ্রণ যন্ত্রের উপর্যুক্ত নামীয় তালিকা ও তাদের মালিকানার সুদীর্ঘ পরম্পরা দেখে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকে ঢাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুদ্রণযন্ত্র ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। একই সাথে সাময়িকপত্রের প্রকাশনা স্ব স্ব মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের সংবাদ ও সাময়িকপত্রের আকার আকৃতি বর্তমানের পত্রিকার মত ছিল না। সে সময়কার সাময়িকপত্রগুলোর অধিকাংশ পৃষ্ঠা জুড়ে থাকতো মন্তব্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত বক্তব্য। তবে খবরের মধ্যে কিছু স্থানীয় বিষয়াদিও চোখে পড়ে। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত সংবাদের অনূদিত খবরও বিশেষভাবে ছাপা হতো। অনেক সময় পত্রিকার আগ্রহী গ্রাহকদের প্রেরিত সংবাদও গুরুত্বের সাথে ছাপা হতো। বর্তমান সময়ের মতো চিঠিপত্র কলামও চালু ছিল তবে বিষয়ভিত্তিক রচনার মাধ্যমেই সাধারণত সম্পাদকগণ মতামতসমূহ বিন্যস্তকরণ করতেন।

উনিশ শতকের সাময়িকপত্রগুলোর প্রধান আয় হতো গ্রাহকদের পাঠানো মূল্য ও বিজ্ঞাপন। বর্তমানের সংবাদ মাধ্যম তথা গণমাধ্যমের আয়ের বড় অংশই আশে বিজ্ঞাপন থেকে। কিন্তু উনিশ শতকের বাস্তবতা সেরকম ছিল না। কারণ ঢাকার নগরায়ন তখনো সসম্পন্ন হয়নি। ফলে দীর্ঘ দিন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার বড় প্রমাণ মুদ্রণযন্ত্রের উপর্যুক্ত তালিকা। এভাবে বেশির ভাগ পত্রিকাই বেশিদিন চলেনি বা প্রকাশিত হতে পারেনি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি (*ঢাকা নিউজ* পরে *দি* বেঙ্গল টাইমস্) ও একটি বাংলা (*ঢাকা প্রকাশ*) সাময়িকপত্রই দীর্ঘদিন স্রোতের বিপরীতে মাথা উচু করে প্রচার ও প্রচারণা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

একটি শহরের নগরায়ন ও বিকাশে মুদ্রণযন্ত্র কতটা অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে *সমাচার দর্পণ* এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'যেদেশে ছাপার কর্ম চালিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না। এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত। এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।'[৪০] উক্তিটি কোলকাতা শহরকে উদ্দেশ্য করে করা হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকা নগরী সম্পর্কে তা নির্দ্বিধায় কার্যকর বলেই প্রতীয়মান হয়।

[৪০] আফরোজা সোমা, "মুদ্রণযন্ত্র এবং উনিশ শতকের জটিল ও কলরবমুখর ঢাকা", এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত, *ঢাকার ৪০০ বছর*, (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ও দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ২০০৯), ২৮২।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

বিজ্ঞাপন চিত্রের ধরণ ও বিষয়-বৈচিত্র্য

পূর্ব বঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সংবাদপত্রের সূচনা লগ্ন থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মাধ্যমে বিশেষ সংবাদ বা পণ্যের বহুল প্রচারের সূচনা-লগ্নে বিজ্ঞাপনে চিত্র ব্যবহারের বিষয়টি অনেক পরে প্রকাশকদের মাথায় আসে। শুরুর দিকে শুধুমাত্র লেখার মাধ্যমেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। এভাবে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিশেষ কোন ঘোষণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হতো।

উনিশ শতকের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনা শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। একই সাথে বহুল প্রচারিত সাময়িকীতে নিজেদের পণ্য কিংবা কোন ঘোষণা সার্বজনীনভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হতো। এভাবে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। সাময়িকীর প্রকাশক কোম্পানী কিংবা উদ্যোক্তাদের আয়ের সিংহভাগের যোগান আসতো প্রচার ও বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপন প্রায় ছিল না বললেই চলে। কারণ তখনো সম্পন্ন হয়নি ঢাকার নগরায়ন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষে পত্রিকার দামও খুব কমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেখা গেছে দাম কম হলে পত্রিকার কাটতি বাড়তো। তাই যারা পত্রিকার দাম কমাতে পারত না তারা গ্রাহকদের নানা রকম সুবিধা দিয়ে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বাড়াতে চাইতেন।[৪১] পণ্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রকাশনা কর্তৃপক্ষও বিজ্ঞাপনে নানা বৈচিত্র্য আনতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞাপনে শুরু হয় চিত্রের ব্যবহার। একটি বিজ্ঞাপনে স্বল্প পরিসরে চিত্র অংকন করা হতো আর বেশিরভাগ জায়গায় পন্য সম্পর্কিত বিবরণ থাকতো। চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনগুলো সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাধারণত প্রথম পৃষ্ঠাতেই বেশি ছাপা হতো। তবে ভিতরের পাতাগুলোতেই বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এই ধারা বর্তমানে প্রকাশিত দৈনিক ও সাময়িকপত্রগুলোতে অনুসরণ করতে দেখা যায়। উপযুক্ত তথ্য ও উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে কবে ও কখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার শুরু হয় তা নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৮৬১ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত কোন সংখ্যার খোঁজ না পাওয়া গেলেও ১৮৬৩ ও তার পরবর্তী কিছু সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৮৬৩ সালের ৯ এপ্রিল খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৮ চৈত্র ১২৬৯ বঙ্গাব্দ সনে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* সংখ্যাই হলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত

[৪১] আফরোজা সোম, 'মুদ্রণযন্ত্র এবং উনিশ শতকের জটিল ও কলরবমুখর ঢাকা', এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত, *ঢাকার ৪০০ বছর*(ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ও দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ২০০৯), ২৮০।

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্রের অদ্যাবধি বিদ্যমান প্রাচীনতম উদাহরণ। ঐ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতে মোট তিনটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যার প্রথমটি নিম্নরূপ–

বিজ্ঞাপন

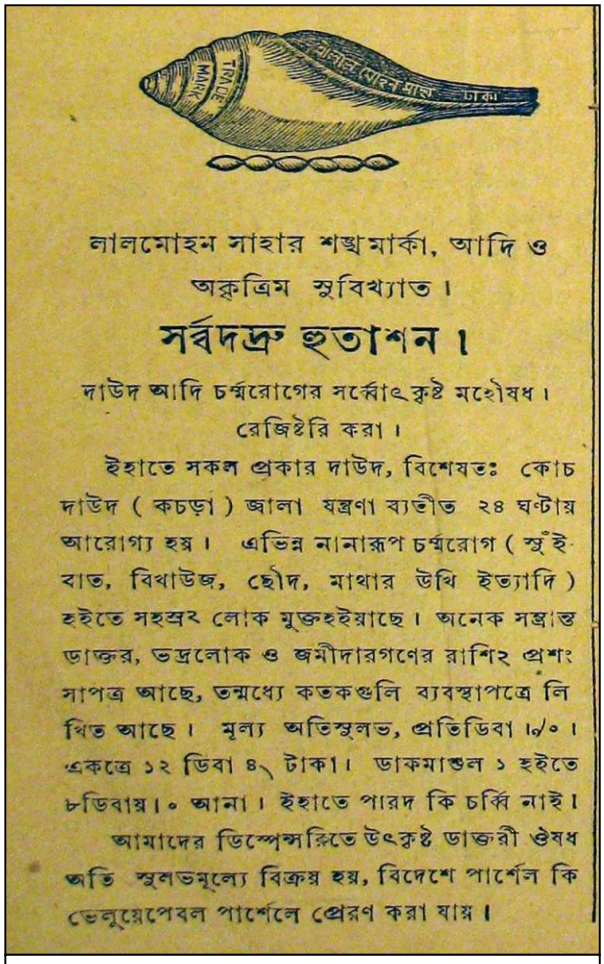
আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করিতেছি যাঁহাদিগের নিকট গতবর্ষের ঢাকাপ্রকাশের মূল্য বাকী ছিল, তাহাদিগের অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়া ফেলিতেছেন। যাঁহারা অদ্য পর্যন্ত পরিশোধ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা এই তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। গত বর্ষের প্রাপ্ত মূল্য ঢাকা প্রকাশে স্বীকার করা যায় না। তাহার স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া হইয়া থাকে।[৪২]

অপর দিকে সাপ্তাহিক *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় ১৮৮৪ সালে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহার হতে দেখা যায়। ১২৯০ সনের ৪ চৈত্র প্রকাশিত 'সর্ব্বদদ্রু হুতাশন' শিরোনামের বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়-

লালমোহন সাহার শঙ্কমার্কা, আদি ও অকৃত্রিম সুবিখ্যাত

সর্ব্বদদ্রু হুতাশন

দাউদ আদি চর্ম্মরোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। রেজিস্টরি করা। ইহাতে সকল প্রকার দাউদ, বিশেষত: কোচ দাউদ (কচড়া) জালা যন্ত্রণা ব্যতীত ২৪ ঘন্টায় আরোগ্য হয়। এভিন্ন নানারূপ চর্ম্মরোগ (সুঁইবাত, বিখাউজ, ছৌদ, মাথার উখি ইত্যাদি) হইতে সহস্রং লোক মুক্ত হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ডাক্তর, ভদ্রলোক ও জমীদারগণের রাশি প্রশংসাপত্র আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যবস্থাপত্রে লিখিত আছে। মূল্য অতিসুলভ, প্রতিডিবা ৬ আনা। একত্রে ১২ ডিবা ৪ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৮ ডিবায় ৪ আনা। ইহাতে পারদ কি



চিত্র-১: লালমোহন সাহার শঙ্কমার্কা সর্ব্বদদ্রু হুতাশন

[৪২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ চৈত্র ১২৬৯/ ৯ এপ্রিল ১৮৬৩, ০১।

চব্বি নাই। আমাদের ডিস্পেন্সরিতে উৎকৃষ্ট ডাক্তরী ঔষুধ অতি সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়, বিদেশে পার্শেল কি ভেলুয়েপেবল পার্শেলে প্রেরণ করা যায়।[৪৩]

উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনে একটি শামুক বা শঙ্কের চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। শামুকটির গায়ে ইংরেজিতে লেখা আছে Trade Mark আর বাংলায় লেখা আছে 'শ্রীলাল মোহন সাহা, ঢাকা'। লালমোহন সাহার নামের সাথে ঢাকা শব্দটির উল্লেখ থাকায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই ঔষুধ কোম্পানিটির মালিকানা পূর্ববঙ্গের তথা ঢাকার স্থানীয়দের হাতে ন্যস্ত।

এরকম আরো চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপন পরবর্তীতে ছাপা হয়েছে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক *দি বেঙ্গল টাইমস্* পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর বৈচিত্রতার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞাপনগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

১. চিকিৎসা বা ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন

২. জমিজমা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত

৩. আধুনিক মেশিনারিজ সংক্রান্ত

৪. রূপচর্চা বা প্রসাধনী সংক্রান্ত

৫. জুয়েলারি সংক্রান্ত

৬. গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত

৭. শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত

৮. বিবিধ

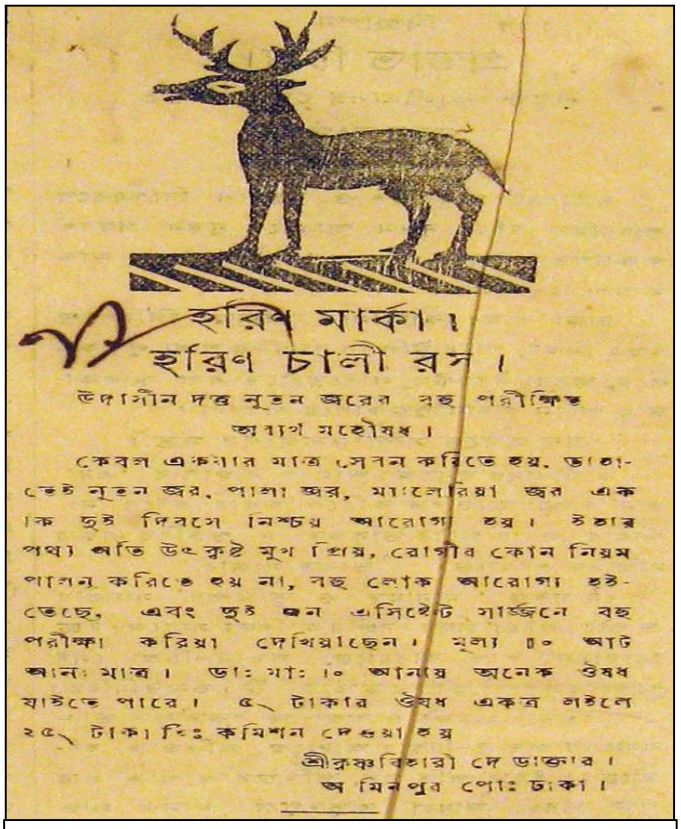
উপর্যুক্ত প্রকরণগুলোর বিশদ আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

[৪৩] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ চৈত্র ১২৬৯/ ৯ এপ্রিল ১৮৬৩, ০১।

১. চিকিৎসা বা ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনচিত্র

উনিশ শতকের চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনগুলোর বেশিরভাগের বিষয়বস্তু হলো চিকিৎসা তথা ঔষুধ সংক্রান্ত। সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* এর ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র হরিণ মার্কা হরিণ চালী রসের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনের শীর্ষে রয়েছে ভূমিতে দণ্ডায়মান একটি হরিণের চিত্র। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

হরিণ মার্কা। হরিণ চালী রস। কেবল একবার মাত্র সেবন করিতে হয়, তাহাতেই নূতন জ্বর, পালা জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর এক দশ দুই দিবসে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহার পথ্য অতি উৎকৃষ্ট মুখ প্রিয়, রোগীর কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না, বহু লোক আরোগ্য হইতেছে এবং দুই জন এসিষ্টেন্ট সার্জ্জনে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মূল্য ৮ আনা মাত্র। ডা: মা: ৪ আনায় অনেক ঔষুধ যাইতে পারে। ৫ টাকার ঔষুধ একত্র লইলে ২৫ টাকা হিসেবে কমিশন দেওয়া হয়। শ্রী কৃষ্ণ বিহারী দে ডাক্তার। আমিনপুর পোঃ ঢাকা।[৪৪]



চিত্র ১.১: হরিণ মার্কা চালী রস

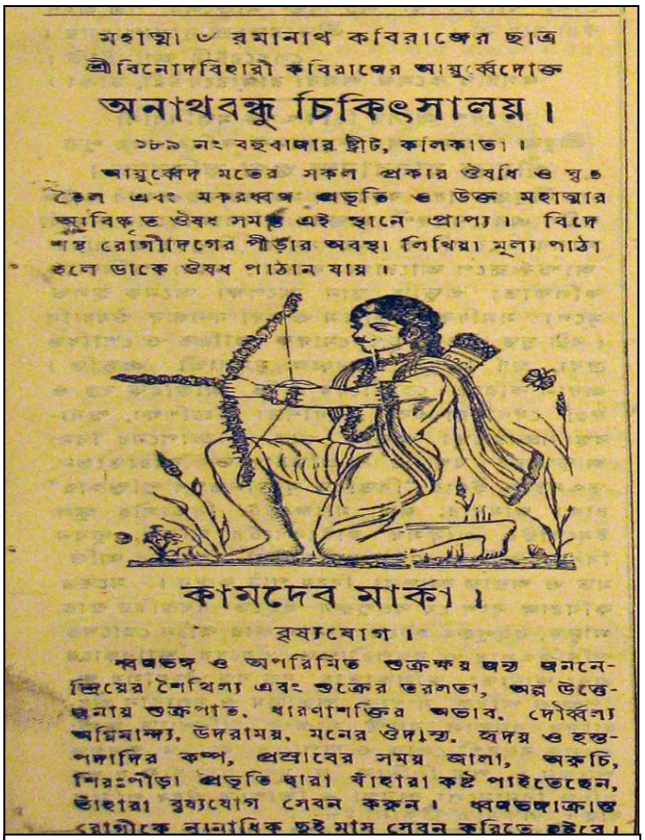
প্রথম পর্যায়ে এরকম একটি চিত্রকে মার্কা হিসেবে ব্যবহার করা হতো বিজ্ঞাপনে। এরকমভাবে মার্কা হিসেবে দেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ১১ মার্চ ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত পত্রিকায় অনাথবন্ধু চিকিৎসালয়ের কামদেব মার্কা বৃষ্যযোগ আয়ুর্বেদিক ঔষধের বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়–

'মহাত্মা রমানাথ কবিরাজের ছাত্র শ্রীবিনোদবিহারী কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত **অনাথবন্ধু চিকিৎসালয়**। ১৮৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। আয়ুর্ব্বেদ মতের সকল ঔষধি ও ঘৃত তৈল এবং মকরধ্বজ প্রভৃতি ও উক্ত মহাত্মার আবিষ্কৃত ঔষধ সমস্ত এই স্থানে প্রাপ্য। বিদেশস্থ রোগীদিগের পীড়ার অবস্থা লিখিয়া মূল্য পাঠাইলে ডাকে ঔষধ পাঠান যায়।

কামদেব মার্কা। বৃষ্যযোগ। ধ্বজভঙ্গ ও অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য এবং শুক্রের তরলতা, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত, ধারণাশক্তির অভাব, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, মনের ঔদাস্য, হৃদয় ও হস্ত

[৪৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ চৈত্র ১২৯৯, পৃ.১২।

পদাদির কম্প, প্রসাবের সময় জ্বালা, অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি দ্বারা যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা বৃষ্যযোগ সেবন করুন। ধ্বজভঙ্গাক্রান্ত রোগীকে ন্যূনাধিক দুই মাস সেবন করিতে হইবে।[৪৫]'


মহাত্মা ৺ রমানাথ কবিরাজের ছাত্র
শ্রীবিনোদবিহারী কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত
অনাথবন্ধু চিকিৎসালয়।
১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আয়ুর্ব্বেদ মতের সকল প্রকার ঔষধি ও ঘৃত তৈল এবং মকরধ্বজ প্রভৃতি ও উক্ত মহাত্মার আবিষ্কৃত ঔষধ সমস্ত এই স্থানে প্রাপ্য। বিদেশস্থ রোগীদিগের পীড়ার অবস্থা লিখিয়া মূল্য পাঠাইলে ডাকে ঔষধ পাঠান যায়।
কামদেব মার্কা।
বৃষ্যযোগ।
ধ্বজভঙ্গ ও অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য এবং শুক্রের তরলতা, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত, ধারণাশক্তির অভাব, দৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, মনের ঔদাস্য, হৃদয় ও হস্তপদাদির কম্প, প্রস্রাবের সময় জ্বালা, অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি দ্বারা যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা বৃষ্যযোগ সেবন করুন। ধ্বজভঙ্গাক্রান্ত রোগীকে ন্যূনাধিক দুই মাস সেবন করিতে হইবে।

চিত্র ১.২: কামদেব মার্কা বৃষ্যযোগ

সনাতন ধর্মের আরেকজন দেবতা গনেশ মার্কা সিদ্ধচূর্ণের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১০ বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ সন মোতাবেক ২৩ এপ্রিল ১৯০৫ সালে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায়। দেবতা গনেশের চিত্রটি বিজ্ঞাপনটির শীর্ষস্থানে রয়েছে এবং তার নিচে বিবরণ-

যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধচূর্ণ। মূল্য দুই সপ্তাহ সেবনোপযোগী চূর্ণ ১ টাকা। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মেছ প্রভৃতি দূরারোগ্য পীড়া প্রযুক্ত যাহাদের জীবনধারণ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে, বহুবিধ ঔষধাদি সেবনেও যাহারা এ সকল দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেন না, আমরা তাহাদিগকে একবার যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধচূর্ণ ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

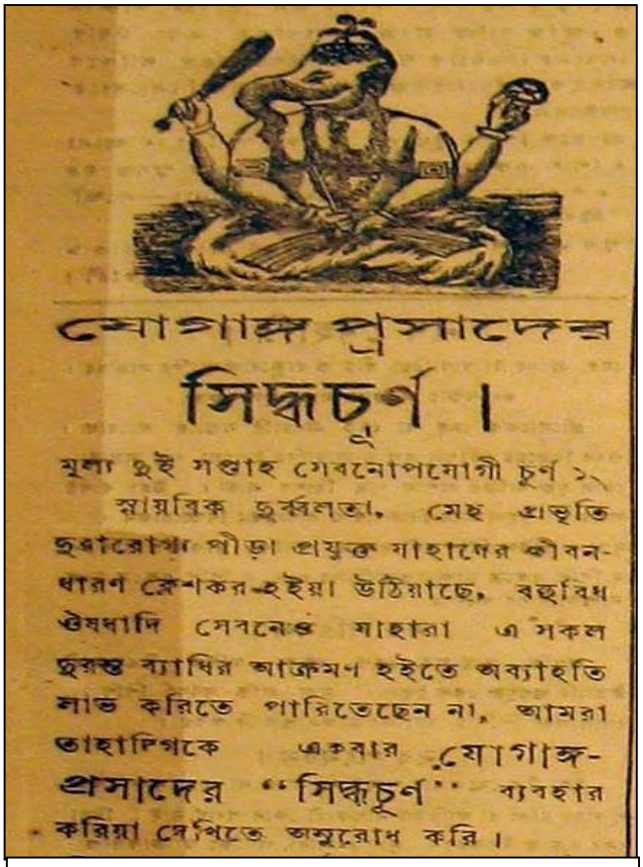
সিদ্ধচূর্ণের উপকারিতার নিদর্শন। সিদ্ধচূর্ণ মেহ রোগের অব্যর্থ ঔষুধ এবং স্বপ্নদোষের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। এ সম্বন্ধে রেঙ্গুনের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন এবং বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার সর্ব্বজন সমাদৃত ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এল এম এস মহোদয় বলেন- বহুদিনের পুরাতন ও জটিল প্রমেহগ্রস্ত একটি রোগীকে আমি নানাপ্রকার ঔষুধ দিয়াও বিশেষ কোন ফল না পাইয়া অবশেষে আপনাদের 'যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধচূর্ণ'৪ সপ্তাহ মাত্র প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছি। স্কুলের কয়েকটি ছাত্রকেও স্বপ্নদোষের জন্য আমি সিদ্ধচূর্ণ ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। ঐ সকল স্থলে স্বপ্নদোষে এই ঔষধের উপকারিতা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। যে সকল লোক পেটেন্ট ঔষধের বিরোধী তাঁহারা অকুতোভয়ে এই সিদ্ধচূর্ণ ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রী অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এল এম এস।

সিদ্ধচূর্ণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার অত্যুকৃষ্ট ঔষধ– এ সম্বন্ধে বিক্রমপুর লৌহজঙ্ঘের স্বনামখ্যাত অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ পাল এমবি মহাশয় বলেন: আমি আপনাদের সিদ্ধচূর্ণ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩/৪ দিন ব্যবহারেই ইহার ফল উপলব্ধি করা যায়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য আমি আয়ুব্বেদিক, এলিওপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু কোন ঔষধই এরূপ আশু ফলদায়ক নহে। অন্য রোগীর নিকট অবগত হইয়াছি প্রমেহ রোগেও নাকি ইহার ফল অতি

[৪৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ মার্চ ১৮৯৪, পৃ.০১।

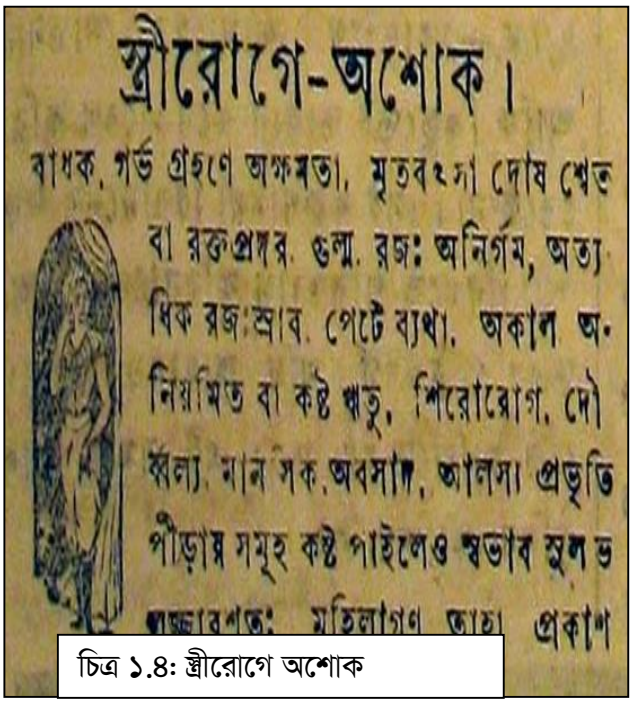
আশ্চর্য্যজনক। ইহার কটু বা বিকট আস্বাদ না থাকায় সেবনেও কোন বিরক্তি হয় না। এইরূপ উপকারী ও ফলপ্রদ ঔষধের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি- শ্রীজ্ঞানকীনাথ পাল এম.বি।

সিদ্ধচূর্ণ যেমন প্রমেহ রোগের অব্যর্থ ঔষধ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরীকরণেও ইহা তেমনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। - এসম্বন্ধে বিক্রমপুরের পরলোকগত ধন্বন্তরী কল্প কবিরাজ গাউপাড়া নিবাসী মহিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঢাকার সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় নিজে বহু রোগীতে এই ঔষধের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন: আমি আপনাদেরকে সিদ্ধচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া শতাধিক উৎকট ও দূরারোগ্য প্রমেহ রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি। ঔপসর্গিক মেহ (গনোরিয়া) রোগেও ইহার আশাতীত ফল দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। এই ঔষধের উপাদানগুলি আয়ুর্ব্বেদ-বহিঃভূত না হইলেও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরীকরণে প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অপেক্ষা ইহার ক্ষিপ্রকারিতা অনেক অধিক বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই ঔষধের আস্বাদ কটু কি তিক্ত না হওয়ায় এবং মাত্রার অল্পতা হেতু ইহা ব্যবহারে কোন অসুবিধা নাই। এরূপ লোকহিতকর ঔষধের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।- শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কবিরত্ন।[৪৬]


যোগাঙ্গ প্রসাদের
সিদ্ধচূর্ণ।
মূল্য দুই সপ্তাহ সেবনোপযোগী চূর্ণ ১৲
স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মেহ প্রভৃতি দুরারোগ্য পীড়া প্রযুক্ত যাহাদের জীবন-ধারণ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে, বহুবিধ ঔষধাদি সেবনেও যাহারা এ সকল দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেন না, আমরা তাহাদিগকে একবার যোগাঙ্গ-প্রসাদের "সিদ্ধচূর্ণ" ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

চিত্র ১.৩: গনেশ মার্কা সিদ্ধচূর্ণ

একজন নারীর চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে ' এসেন্স অব অশোক' নামক ঔষধের বিজ্ঞাপনে যা প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ২১ মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ সনের সংখ্যায়। যেহেতু ঔষধটি নারীদের জন্য বিশেষ রোগের উপশমে তৈরি সেকারণে **নারীর** চিত্রায়ন যথাযথ হয়েছে বলেই প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে-


স্ত্রীরোগে-অশোক।
বার্ধক, গর্ভ গ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসা দোষ শ্বেত বা রক্তপ্রদর, গুল্ম, রজঃ অনির্গম, অত্যধিক রজঃস্রাব, পেটে ব্যথা, অকাল অনিয়মিত বা কষ্ট ঋতু, শিরোরোগ, দৌর্ব্বল্য, মানসিক অবসাদ, আলস্য প্রভৃতি পীড়ার সমূহ কষ্ট পাইলেও স্বভাব সুলভ লজ্জাবশতঃ মহিলাগণ তাহা প্রকাশ

চিত্র ১.৪: স্ত্রীরোগে অশোক

স্ত্রীরোগে অশোক

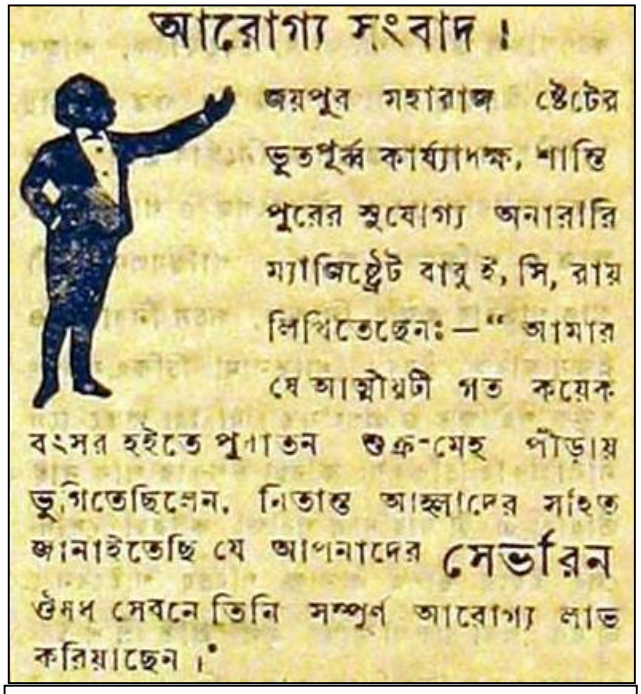
বার্ধক্য, গর্ভ ধারণে অক্ষমতা, মৃৎবৎসা দোষ, শ্বেত ব রক্ত প্রঙ্গর, গুল্ম রজঃ অনির্গম, অত্যধিক রজঃস্রাব, পেটে ব্যথা, অকাল অনিয়মিত বা কষ্ট ঋতু,

[৪৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ বৈশাখ ১৩১২/ ২৩ এপ্রিল ১৯০৫, পৃ.০১।

শিরারোগ, দৌব্বল্য, মানসিক **অবসাদ, আলস্য প্রভৃতি** পীড়ায় সমূহ কষ্ট পাইলেও স্বভাব সুলভ লজ্জাবশত: মহিলাগণ তাহা প্রকাশ করেন না। আমাদের 'এসেন্স অভ অশোক' কিছুদিন নিয়ম মত সেবনে উক্ত কষ্টকর পীড়া ও উপসর্গাদি অতি শীঘ্র ও গোপনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইহা যেমন দূষিত পদার্থের লেশমাত্র বর্জ্জিত, তেমনি অশেষ ফলপ্রদ। ইহা সেবনে যাবতীয় স্ত্রীরোগ দূর হয়, জরায়ূ পরিশুদ্ধ ও নীরোগ হয়। চিকিৎসকের নিকট এই পীড়ার কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়- আমাদের ঔষধ সেবনে সে দায়ে নিষ্কৃতি পাইবেন। বিনা কষ্টে অতীব গোপনে সম্পূর্ণও নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভে সুখী হইবেন। সহজ শরীরে সেবনে শরীরের কান্তি বাড়ে, দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়। মূল্য দুই টাকা। নাম প্রকাশ করি না, ঔষধও গোপনে পাঠাই। একমাত্র ঠিকানা জে. ডস. মূখার্জ্জি। ম্যানেজার ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস। রাণাঘাট বেঙ্গল।[৪৭]

একজন কেতাদুরস্ত পুরুষ তথা কালো কোর্ট, কালো প্যান্ট ও কালো জুতা পরিহিত একজন ভদ্রলোক 'সেভরিন' নামক ঔষধের আরোগ্য সংবাদ ঘোষণা করছেন- এরকম একটি বিজ্ঞাপন ১৯ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ সনে প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকায়।* বিজ্ঞাপনে বলা হয়–

"সেই জগৎ প্রসিদ্ধ, অশেষ পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং অপ্রমেয় শক্তিশালী **সেভরিন** সকল প্রকার শুক্রপীড়ার অমোঘ মহৌষধ। স্নায় ও মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সকল প্রকার মেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্ব হানি, অল্প বা অতিরিক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা তৎসহ রক্ত কিম্বা বিকৃত বীর্যপতন, কুক্ষিদেশে বা তলপেটে বেদনা, জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, স্মৃতি ও মেধা হ্রাস, অল্প উত্তেজনায় বীর্য্য পতন, ধ্বজভঙ্গ, শির:পীড়া, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ, কর্ত্তব্য কাজে অনিচ্ছা, অনিদ্রা, দু:স্বপ্ন, অক্ষুধা, অজীর্ণ, শারীরিক সামর্থ্যাভাব, মানসিক স্ফূর্ত্তিহানি, অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুরোগ ও সহস্রাধিক উৎকট উপসর্গ অতি জটীল ও পুরাতন হইলেও আমাদের এই নূতন পাশ্চাত্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত- সহজ ও সুখসেব্য এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সেভরিন ঔষধ সেবনে সত্বর, সহজে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। উপরোক্ত সমূদয় পীড়া দূর করিতে সেভরিনের শক্তি অসাধারণ বা অতুলনীয় একবার মাত্র ব্যবহারেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র, যুব, বৃদ্ধ- সকলেই এই পরম কল্যাণকর, নবজীবনপ্রদ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র।[একত্রে তিন শিশি পর্য্যন্ত পাঠাইতে স্বতন্ত্র পাঁচ আনা খরচ লাগে।]


আরোগ্য সংবাদ।

জয়পুর মহারাজ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাদক্ষ, শান্তি পুরের সুযোগ্য অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ই, সি, রায় লিখিতেছেন:—"আমার যে আত্মীয়টী গত কয়েক বৎসর হইতে পুরাতন শুক্র-মেহ পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, নিতান্ত আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আপনাদের সেভরিন ঔষধ সেবনে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।"

চিত্র ১.৫: সেভরন ঔষধের বিজ্ঞাপন

আরোগ্য সংবাদ। জয়পুর মহারাজ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ, শান্তিপুরের সুযোগ্য অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ই.সি. রায় লিখিতেছেন:–"আমার যে আত্মীয়টি গত কয়েক বৎসর হইতে পুরাতন শুক্রমেহ পীড়ায় ভুগিতেছিলেন,

[৪৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৩।

নিতান্ত আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে আপনাদের সেভরিন ঔষধ সেবনে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

বাবু রামগতি দাস, ডাক্তার, বেলগাছি, সোমরা হইতে লিখিতেছেন:– "আমার চিকিৎসার অধীনস্থ একটী রোগিনী ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তিহীনা হইয়াছিলেন। আপনার প্রেরিত সেভরিন দুই তিন দিন সেবনের পরই তিনি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আমি এই ঔষধের মহিয়সী শক্তি দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

বাবু জ্ঞানেন্দ্র চরণ চক্রবর্ত্তী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, লিখিতেছেন: সেভরিন ব্যবহারে এক্ষণে বিশেষ সুস্থ বোধ করিতেছি। আমার শিরপীড়া ও সমুদয় উপসর্গ সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।

বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস, রেকর্ড অফিস, মরিয়ানি, (আসাম) লিখিতেছেন:– আমি আপনাদের একজন পুরাতন গ্রাহক। আপনাদের সেভরিন অতি উপকারী। এখানকার শুক্রপীড়াক্রান্ত অনেক ব্যক্তিই এক্ষণে সেভরিন সেবনে আরোগ্য হইয়াছেন।

আপনার জ্ঞাতব্য কথা। আমাদের কোথাও এজেন্ট অথবা ব্রাঞ্চ কার্য্যালয় নাই। রোগীর সমস্ত পত্রই বিশেষ গোপনীয় বিবেচিত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে আমাদের সচিত্র নূতন মূল্য তালিকা পাঠানো হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক কেবলমাত্র নিম্ন ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন। পি. জি. মুখার্জ্জি, ইম্পেরিয়াল ফার্ম্মেসি, রাণাঘাট, বেঙ্গল।"[৪৮]

অ্যাজমা রোগের মহৌষধের একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ সংখায়। বিজ্ঞাপনে চিত্র দুটি। প্রথমটি 'অ্যাজমামিষ্ট' এর যেখানে মাটিতে মাদুর কিংবা জল চৌকি তে উপবিষ্ট রোগীর হাতে চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি একটি শিশি ধরিয়ে দিচ্ছেন। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি একজন ডাক্তার। অন্য চিত্রটি 'স্পার্মাটোরিয়া স্পেসিফিক' এর যেখানে একজন দীঘল চুল বিশিষ্ট সুস্বাস্থ্যবান যুবককে চিত্রায়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-



চিত্র ১.৭: অ্যাজমামিস্ট ও স্পার্মোটোরিয়া স্পেসিফিক

[৪৮] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ০৭।

Dr. A.C. Ghosal's

Asthma Mist

হাঁপানির মহৌষধ

ইহা সেবন করিলে নূতন পুরাতন সকল প্রকার শ্বাস কাশি ও হাঁপানির আনুসঙ্গিক যাবতীয় উপসর্গ, বুকে বেদনা, রাত্রে অনিদ্রা ও শয়নে ইচ্ছা সত্ত্বেও অপারগতা প্রভৃতু দারুণ কষ্টসমূহ লাঘব হয়। যিনি হাঁপানি রোগাক্রান্ত হইয়া রোগের যাতনা হইতে মুক্তি লাভের আশায় ঔষধ বিশ্বাসে 'ছাইভস্ম' সেবন করিয়া প্রচুর অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের অনুরোধ যে, এ.সি ঘোষালের 'এজমা মিস্ট' একবার মাত্র ব্যবহার করুন। মূল্য ১ টাকা ৪ আনা পাঁচ সিকা মাত্র। প্যাকিং ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

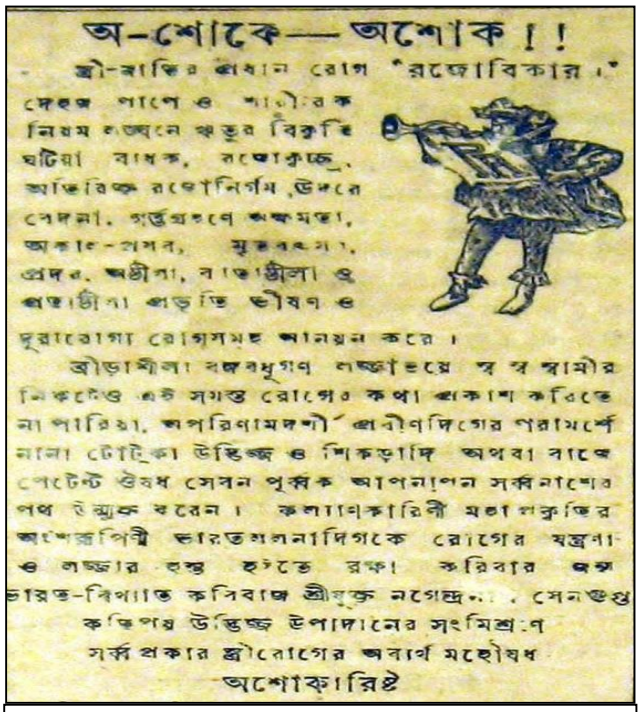
SPERMATORRHOEA SPECIFIC

ইহা সেবন করিলে স্বপ্নদোষ, ধাতদৌর্ব্বল্য, শুক্রের তরলতা, স্ত্রী সহবাসে অক্ষমতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগসকল অচিরে দূরীভূত হয়। ইহাতে দেহের পুষ্টি, শুক্রের বৃদ্ধি, স্বপ্নদোষের নাশ, মনে প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলোপকর, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি এবং স্নায়ু ও পেশী সতেজ হয়। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর ত্যাগের র প্রত্যহ মাসাবধি সেবন করিলে আর দ্বিতীয়বার রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকেনা। মূল্য ১ টাকা ৪ আনা পাঁচসিকা মাত্র, প্যাকিং ইত্যাদি স্বতনন্ত্র।"[৪৯]

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক উদ্ভাবিত 'অশোকারিষ্ট' নামক ঔষধের বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহার দেখা যায় ৯ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটির শিরোনামও চমৎকার। **অ- শোকে অশোক!!** বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

অ-শোকে- অশোক!!

স্ত্রী-জাতির প্রধান রোগ 'রজোবিকার'। দেহজ পাপে ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে ঋতুর বিকৃতি ঘটিয়া বাধক, রজোকৃচ্ছ্রতা, অতিরিক্ত রজোনির্গম, উদরে বেদনা, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, অকাল প্রসব, মৃৎবৎসা, প্রদর, অষ্ঠীলা, বাতাষ্ঠীলা, প্রতাষ্ঠীলা প্রভৃতি ভীষণ ও দূরারোগ্য রোগসমূহ আনয়ন করে। ব্রীড়াশীলা বঙ্গবধূগণ লজ্জাভয়ে স্ব স্ব স্বামীর নিকটেও এই সমস্ত রোগের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, অপরিণামদর্শী প্রবীণদিগের পরামর্শে নানা টোটকা উদ্ভিজ্জ ও শিকড়াদি অথবা বাজে পেটেন্ট ঔষধ সেবন পূর্ব্বক আপনাপন সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেন। কল্যাণকারিণী মহা প্রকৃতির অংশরূপিণী ভারত ললনাদিগকে রোগের যন্ত্রণা ও লজ্জার হস্ত


অ-শোকে— অশোক!!
স্ত্রী-জাতির প্রধান রোগ "রজোবিকার।"
দেহজ পাপে ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে ঋতুর বিকৃতি ঘটিয়া বাধক, রজোকৃচ্ছ্র, অতিরিক্ত রজোনির্গম, উদরে বেদনা, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, অকাল-প্রসব, মৃৎবৎসা, প্রদর, অষ্ঠীলা, বাতাষ্ঠীলা ও প্রতাষ্ঠীলা প্রভৃতি ভীষণ ও দূরারোগ্য রোগসমূহ আনয়ন করে।
ব্রীড়াশীলা বঙ্গবধূগণ লজ্জাভয়ে স্ব স্ব স্বামীর নিকটেও এই সমস্ত রোগের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, অপরিণামদর্শী প্রবীণদিগের পরামর্শে নানা টোটকা উদ্ভিজ্জ ও শিকড়াদি অথবা বাজে পেটেন্ট ঔষধ সেবন পূর্ব্বক আপনাপন সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেন। কল্যাণকারিণী মহা প্রকৃতির অংশরূপিণী ভারতললনাদিগকে রোগের যন্ত্রণা ও লজ্জার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারত-বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র... সেনগুপ্ত কতিপয় উদ্ভিজ্জ উপাদানের সংমিশ্রণে সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
অশোকারিষ্ট

চিত্র ১.৭: অশোকারিষ্ট

[৪৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১ ১৩১১, পৃ. ০৭।

হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারত বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কতিপয় উদ্ভিজ্জ উপাদানের সংমিশ্রণে সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ অশোকারিষ্ট আবিষ্কার করিয়াছেন।[৫০]



চিত্র ১.৮: অশোকারিষ্ট

বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যায় মাথায় ক্যাপ ও পায়ে জুতা এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে লম্বা বাঁশি বাজিয়ে সকলকে 'অশোকারিষ্ট' ঔষধের গুণাবলি বর্ণনা করছেন। বাঁশির নিচে রয়েছে ঝুলানো কাপড় যাতে ইংরেজি বর্ণ PA উৎকীর্ণ আছে। ' অশোকারিষ্ট' এর আরেকটি চমৎকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংখ্যায়। যার শিরোনাম- **তরুণীর জীবন হয় সুখময়**। বিজ্ঞাপনে দেখা যায় তরুণী কাঁচের বোতলাকৃতির পালতোলা নৌকায় মাঝ সমুদ্রে সময় অতিবাহিত করছেন এবং আনন্দে আছেন। এখানে কাঁচের বোতল যে অশোকারিষ্ট এর প্রতীক তা সহজেই অনুমিত হয়। বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়-

তরুণীর জীবন হয় সুখময় স্বাস্থ্য বজায় থাকলে আর তা থাকে অশোকারিষ্ট ব্যবহারে। বাধক, প্রদরাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগ নিবারণ করে। লক্ষ লক্ষ নারী নবজীবন লাভ করেছেন। আপনিও সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। জীবন হবে সুখময়। এক শিশি দেড় টাকা। আমাদের ঔষধালয়ে সকল প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষদ, তৈল, ঘৃত, মোদক, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের প্রস্তুত জারিত ধাতু, মুক্তা, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ও মৃগনাভি বিশুদ্ধ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা: রোগীর বিস্তারিত বিবরণসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।- গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।[৫১]

কবিরাজ বি. এন দত্তের 'অমৃত বিন্দু সালসা' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৯ আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষ অসীম সাহসে সিংহের সাথে লড়াই করছেন। মূলত এই সালসার গুণাগুণ বুঝাতেই এমন চিত্রের অবতারণা। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

[৫০] *ঢাকাপ্রকাশ* ৯ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২।
[৫১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.০২।

বি. এন দত্তের **অমৃত বিন্দু** সালসা। ইহা সুস্থ শরীরে সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার করে, দেহ সবল ও মোটা হয়, লাবণ্য বাড়ে, রতিশক্তি বৃদ্ধি করে, স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি পায়। ইহা সুমিষ্ট ও সদ্গন্ধযুক্ত। পারা সংক্রান্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাতে যাবতীয় পারার ঘা, পারা কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইয়া শরীরে নানারূপ চিহ্ন, চুলকণা, সাদা সাদা হওয়া উপদংশ প্রভৃতি রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বাত রোগে ইহা ধন্বন্তরি। পারা মেহ কিম্বা অন্য যে কোন কারণে এবং যতই কঠিন বাত হউক না কেন, অমৃত বিন্দু সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। প্রতি শিশি ১ টাকা। মাশুল ৪ আনা। ডজন ১০ টাকা। মাশুল ২ টাকা।

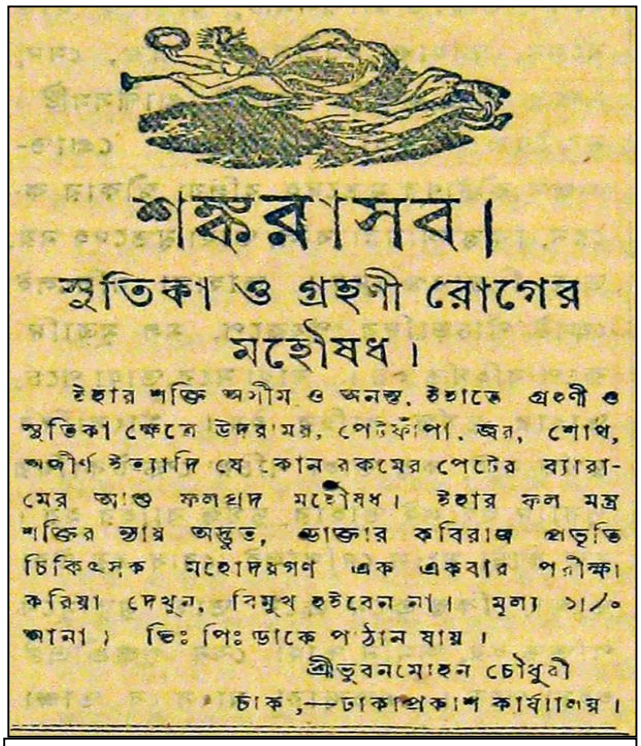
সালসা পাইবার ঠিকানা: বি.এন. দত্ত। ৬নং দূর্গাচরণ পিতুড়ির লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।[৫২]



চিত্র ১.৯: অমৃত বিন্দু সালসা

'শঙ্করাসব' নামক একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৬ মাঘ ১৩০২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের চিত্রে দেখা যায় একজন দেবতা ডান হাতে আশ্চর্যজনক একটি বস্তু এবং বামহাতে একটি বাঁশি নিয়ে পাহাড় ও লোকালয়ের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। দেখে মনে হয় যেস ঐ মানুষরূপী দেবতা ঔষধটির গুণাগুণ সকলকে জানান দিচ্ছেন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

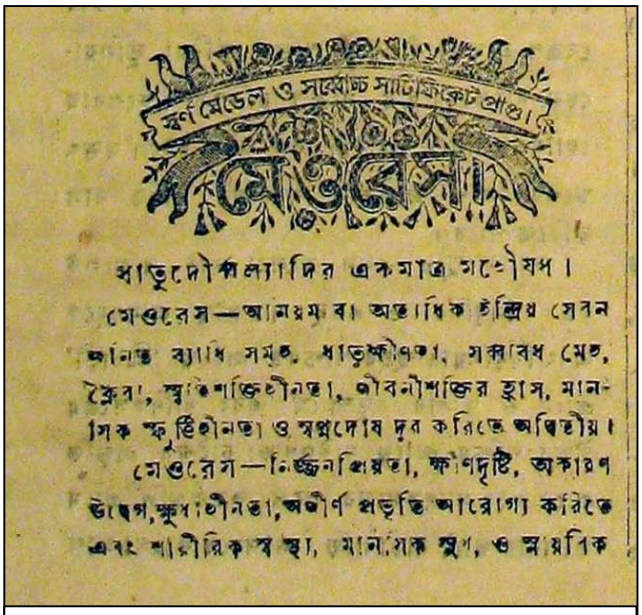
শঙ্করাসব। সুতিকা ও গ্রহণী রোগের মহৌষধ। ইহার শক্তি অসীম ও অনন্ত। ইহাতে গ্রহণী ও সুতিকা ক্ষেত্রে উদরাময়, পেঁট ফাপা, জ্বর, শোথ, অজীর্ণ ইত্যাদি যে কোন রকমের পেটের ব্যারামের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহার ফল মন্ত্র শক্তির ন্যায় অদ্ভূত, ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি চিকিৎসক মহোদয়গণ এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বিমূখ হইবেন না। মূল্য ১ টাকা ৯ আনা। ভি.পি. ডাকে পাঠান যায়।- শ্রীভুবনমোহন চৌধুরী। ঢাকা। ঢাকা প্রকাশ কার্য্যালয়।[৫৩]



চিত্র ১.৯: শঙ্করাসব

[৫২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৯ আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০২।
[৫৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ মাঘ ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৩।

'মেওরেস' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৩ বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ফুল ও লতাপাতাসহ দুই জোড়া পাখি সম্বলিত একটি চিত্র উৎকীর্ণ রহেছে। চিত্রটির মধ্যে দুই লাইন লেখা আছে যার প্রথম লাইনে স্বর্ণমেডেল ও সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ও পরের লাইনে 'মেওরেস' লিখিত আছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-



চিত্র ১.১১: মেওরেস ঔষধ

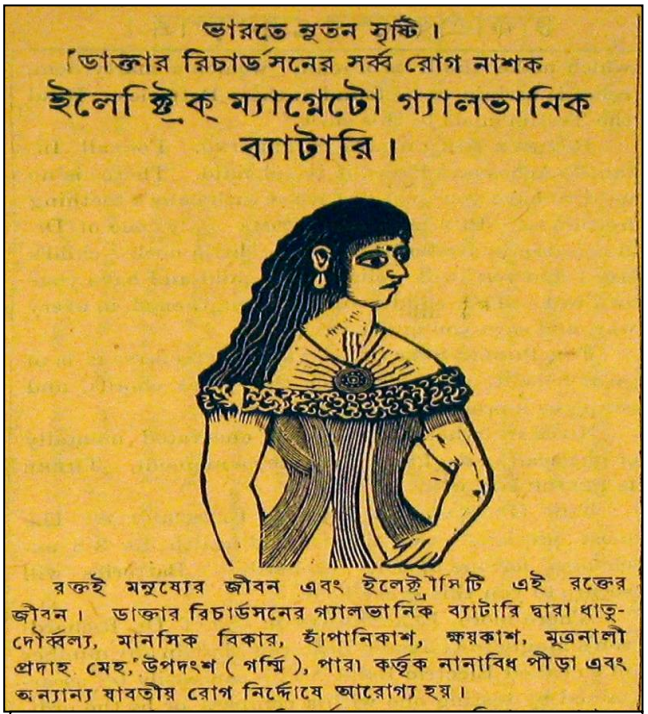
মেওরেস ধাতুদৌর্ব্বল্যাদির একমাত্র মহৌষধ।

মেওরেস-অনিয়ম বা অত্যাধিক ইন্দ্রিয় সেবন জনিত ব্যাধিসমূহ ধাতুক্ষীণতা, সর্ব্ববিধ মেহ, ক্লৈব্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, জীবনী শক্তির হ্রাস, মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা ও স্বপ্নদোষ দূর করিতে অদ্বিতীয়।

মেওরেস- নির্জ্জনপ্রিয়তা, ক্ষীণদৃষ্টি, অকারণ উদ্বেগ, ক্ষুধাহীনতা, অজীর্ণ প্রভৃতি আরোগ্য করিতে এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুখ, ও স্নায়বিক বলবর্দ্ধনে অমোঘ, রতি শক্তি বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ।

ঠিকানা- জে.সি মূখার্জ্জি, ম্যানেজার, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল)[৫৪]।

'ইলেক্ট্রিক ম্যাগ্নেটো গ্যালভানিক ব্যাটারি' নামক একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৮৯৩ সালের একটি ক্রোড়পত্রে। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের চিত্রে দেখা যায় সুকেশা একজন নারী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

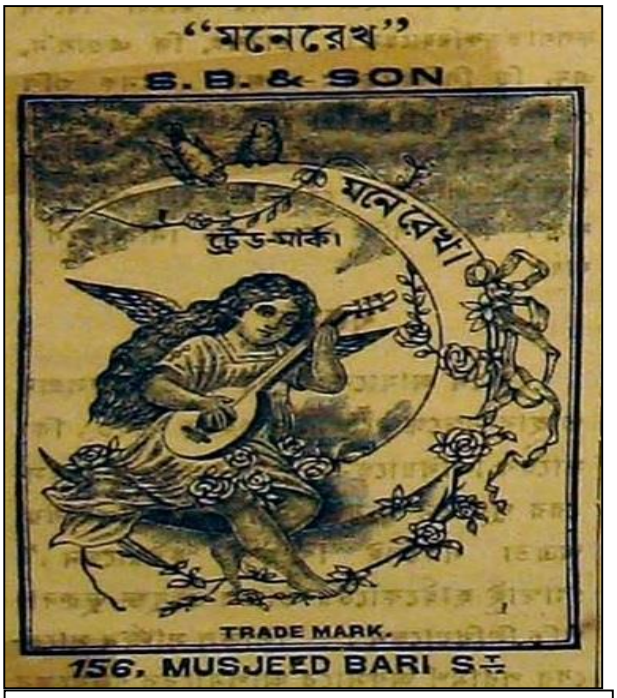


চিত্র ১.১২: ইলেক্ট্রিক ম্যাগ্নেটো গ্যালভানিক

'ভারতে নূতন সৃষ্টি। ডাক্তার রিচার্ডসনের সর্ব্ব রোগ নাশক **ইলেক্ট্রিক ম্যাগ্নেটো গ্যালভানিক ব্যাটারি** রক্তই মনুষ্যের জীবন এবং ইলেক্ট্রীসিটি এই রক্তের জীবন। ডাক্তার রিচার্ডসনের গ্যালভানিক ব্যাটারি দ্বারা ধাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক

[৫৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.১০।

বিকার, হাঁপানিকাশ, ক্ষয়কাশ, মূত্রনালী প্রদাহ মেহ, উপদংশ (গর্ম্মি), পারা কর্ত্তৃক নানাবিধ পীড়া এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগ নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়।[৫৫]



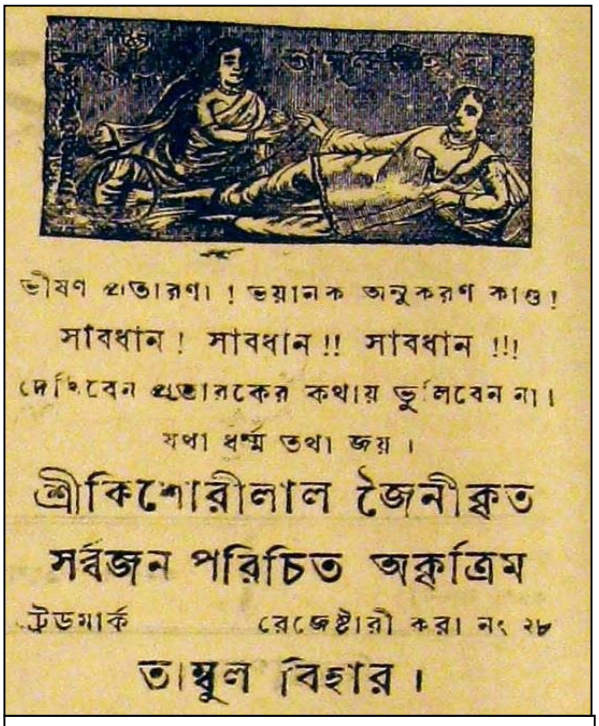
চিত্র ১.১৩: মনেরেখ ঔষধ

এস. বি এণ্ড সন কোম্পানির উদ্ভাবিত 'মনেরেখ' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২১ ফাল্গুন ১৩১১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় ফুল লতাপাতা সমেত চাঁদের উপর বসে আছে বীণা হাতে এক দেবী। বিজ্ঞাপনের বিবরণে উল্লেখ করা হয়-

সখ ও ঔষধের একত্র সমাবেশ, আপনাদের আদরের ধন 'মনেরেখ' ।

ইহা গায়ক গায়িকা ও বক্তৃতাপ্রিয় ব্যক্তিগণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। ইহার গন্ধ অতি মনোহর ও সুমিষ্ট, ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং সর্দ্দি কাশিও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয় এবং প্রত্যেক প্রশ্বাসে মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়। ইহা পানের সহিত কিম্বা সুধুমুখে ব্যবহার করা যায়। মূল্য-প্রতি শিশি চারি আনা মাত্র। ডজন মায় ডাকমাশুল তিন টাকা মাত্র। ৬ শিশির কম ভিঃপিঃ পাঠান হয় না। প্রোপ্রাইটার- এস.বি এণ্ড সন। কবিরাজ শ্রী প্রমথনাথ গুপ্ত। ১৫৬ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[৫৬]

কবিরাজ শ্রী কিশোরীলাল জৈনীকৃত 'তাম্বুল বিহার' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৯ অগ্রহায়ন ১৩০৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় এক ধনী ভদ্রলোক পালঙ্কে বালিশের উপর হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আছে যার হাতে পরম যত্নে তাম্বুলের নল ধরিয়ে দিচ্ছেন তার সুন্দরী স্ত্রী।বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-



চিত্র ১.১৪: তাম্বুল বিহার

ভীষণ প্রতারণা! ঋয়ানক অনুকরণ কাণ্ড! সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! দেখিবেন প্রতারকের কথায় ভুলিবেন না। যথা ধর্ম্ম তথা জয়। শ্রীকিশোরীলাল জৈনীকৃত সর্ব্বজন পরিচিত অকৃত্রিম। ট্রেডমার্ক রেজেষ্টারী করা নং ২৮। **তাম্বুল বিহার**। বিলাসের অপূর্ব্ব মনরঞ্জন চিত্ত বিমোহন দ্রব্য। ইহার পরিচয়

[৫৫] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৯৩ সালের ক্রোড়পত্র।
[৫৬] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩১১, পৃ.০৭।

নূতন করিয়া কিম্বা বাহুল্য করিয়া দিবার আবশ্যক নাই, কারণ ইহা সর্ব্বজন পরিচিত। তাম্বুল বিহার স্বর্গের পারিজাত, মর্ত্তের কহিনুর। প্রেমিকের প্রাণ এবং বিলাসের বৈভব, গুণে ধন্বন্তরীর অমৃত ভাণ্ড? বিলাসী ও রোগী সকলেই ব্যবহার করুন।

এমন গুণাকর দ্রব্য জগতে ইহারন্যায় আর নাই। ইহা পানের সহিত সরিষা পরিমাণ ব্যবহারে মূখের সৌগন্ধে প্রাণ মন মোহিত হয়। পিত্ত প্রকোপ নাশ, দন্তমূল দৃঢ় হয়, শুক্রহীনের শুক্র বৃদ্ধি হয়, স্নায়বিক ও উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধি করে সুনিদ্রা হয় এবং স্বপ্ন বিকার, বায়ু বিকার ধাতু বিকার প্রশমিত হয় এবং ধাতু পোষ্টাই হয়। ইহা তামাকের সহিত অর্দ্ধ রতি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে সৌগন্ধে ও আস্বাদে রসনা মন চরিতার্থ হয় এবং ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়। ইহার সৌগন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।

অধিক কি জানাইব আমার এই অপূর্ব্ব দ্রব্য যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই ইহার গুণ সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। ইহা সহর মফস্বল সকল দোকানে বিক্রয় হয়। (খরিদ করিবার সময় আমার নাম শ্রীকিশোরীলাল জৈনীকৃত তাম্বুল বিহার গোলাপ ফুল মার্কা দেখিয়া লইবেন, ঠকিবেন না)। কিম্বা আমার দোকানে পত্র লিখিলে ভিঃপিঃ পোষ্টে মাল পাঠাইয়া থাকি। মূল্য ছোট কৌটা চার আনা বড় কৌটা আট আনা। ভিঃ পিতে ছোট ৪ কৌটা বা বড় ২ কৌটা ভিন্ন পাঠান হয় না। ১টা হইতে ১২ টা পর্যন্ত মানি অর্ডার ফি, প্যাকিং ও ডাকমাশুল মোট ৬ আনা। ঠিকানা কলিকাতা ১১৯/৪ নং পুরাতন চিনা বাজার। কলিকাতার এজেন্ট।'[৫৭]


বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১২৯২ সনে সৎ-চিকিৎসক-সুলভ বিক্রমপুরে স্থাপিত হইয়া প্রশংসার সহিত যোগ্য চিকিৎসকগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ঔষধ অকৃত্রিম ও অতি সুলভ। পত্র লিখিলে ব্যবস্থা ও কেটেলগ পাঠান হয়।
শ্রীরাধাবিনোদ পাল চৌধুরী। লৌহজঙ্ঘ ঢাকা।

চিত্র ১.১৫: বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

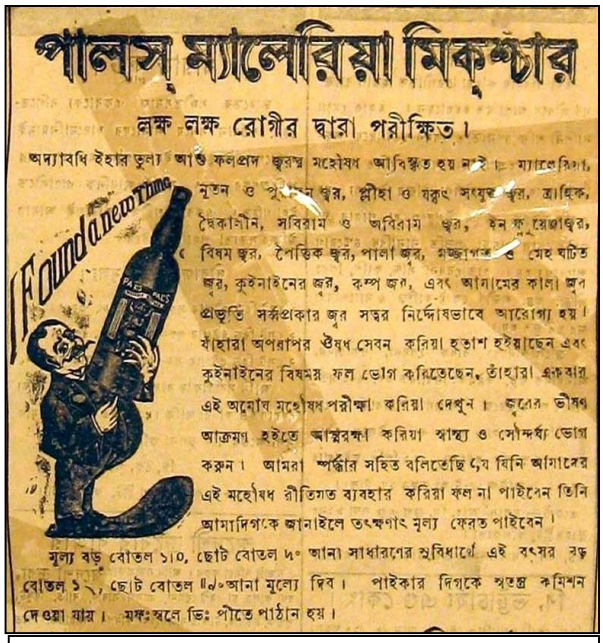
বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের একটি ব্যতিক্রমী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি বাড়ির চিত্র দেখা যায়। বাড়িটির সম্মূখভাগের চিত্র। বাড়িটির চারটি জানালা রয়েছে এবং ছাদ ঢেউটিনের। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। ১২৯২ সনে সৎ চিকিৎসক-সুলভ বিক্রমপুরে স্থাপিত হইয়া প্রশংসার সহিত যোগ্য চিকিৎসকগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ঔষধ অকৃতিম ও অতি সুলভ। পত্র লিখিলে ব্যবস্থা ও কেটেলগ পাঠানো হয়। শ্রীরাধাবিনোদ পাল চৌধুরী। লৌহজঙ্ঘ ঢাকা।[৫৮]

'পালস্ ম্যালেরিয়া মিকশ্চার' নামক একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৮ ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় লম্বা গোঁফ ও পায়ে লম্বা জুতা পরিহিত ইংরেজ বাবু বলছেন- আমি নুতন জীবন পেলাম এবং তার মূখে প্রশান্তির অভিব্যক্তি। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

[৫৭] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ অগ্রহায়ন ১৩০৫, পৃ.০২।
[৫৮] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১, পৃ.০৮।

পালস্ ম্যালেরিয়া মিকশ্চার লক্ষ লক্ষ রোগীর দ্বারা পরীক্ষিত।



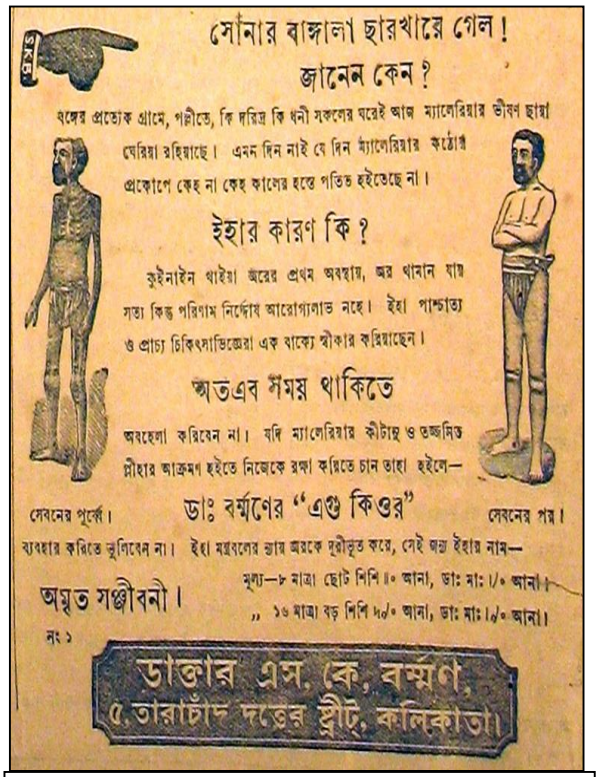
চিত্র ১.১৬: পালস্ ম্যালেরিয়া মিকশ্চার

অদ্যাবধি ইহার তুল্য আশু ফলপ্রদ জ্বরঘ্ন মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ম্যালেরিয়া নূতন ও পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ত্রাহিক, দ্বৈকালীন, সবিরাম ও অবিরাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, বিষম জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, পালা জ্বর, মজ্জাগত ও মেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনের জ্বর, কম্প জ্বর এবং আনামের কালা জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর সত্বর নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। যাঁহারা অপরাপর ঔষধ সেবন করিয়া হতাশ হইয়াছেন এবং কুইনাইনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা একবার এই অমোঘ মহৌষধ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। জ্বরের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ভোগ করুন। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছি যে, যিনি আমাদের এই মহৌষধ রীতিমত ব্যবহার করিয়া ফল না পাইবেন তিনি আমাদিগকে জানাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত পাইবেন। মূল্য বড় বোতল ১ টাকা ৪ আনা, ছোট বোতল আট আনা সাধারণের সুবিধার্থে এই বৎসর বড় বোতল ১ টাকা, ছোট বোতল ৬ আনা মূল্যে দিব। পাইকার দিগকে স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। মফঃস্বলে ভিঃপীতে পাঠান হয়। ঠিকানা- পি. মি. পাল। ২০২ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, সিমলা।[৫৯]

ডাঃ এস কে বর্ম্মণ উদ্ভাবিত **'এণ্ড কিওর'** নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৬ অগ্রহায়ন ১৩২১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন সুস্বাস্থ্যবান এবং আরেকজন ভগ্নদেহ বিশিষ্ট পুরুষ অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্টতই তাদের দৈহিক শক্তি কিংবা শক্তিহীনতা বুঝানোই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

সোনার বাঙ্গালা ছারখার গেল! জানেন কেন?

বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে , পল্লীতে, কি দরিদ্র কি ধনী সকলের ঘরেই আজ ম্যালেরিয়ার ভীষণ ছায়া ঘেরিয়া রহিয়াছে। এমন দিন নাই যে দিন ম্যালেরিয়ার



চিত্র ১.১৭: ডা: বর্ম্মনের এণ্ড কিওর

[৫৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮ ভাদ্র ১৩১২, পৃ. ০৭।

কঠোর প্রকোপে কেহ না কেহ কালের হস্তে পতিত হইতেছে না।

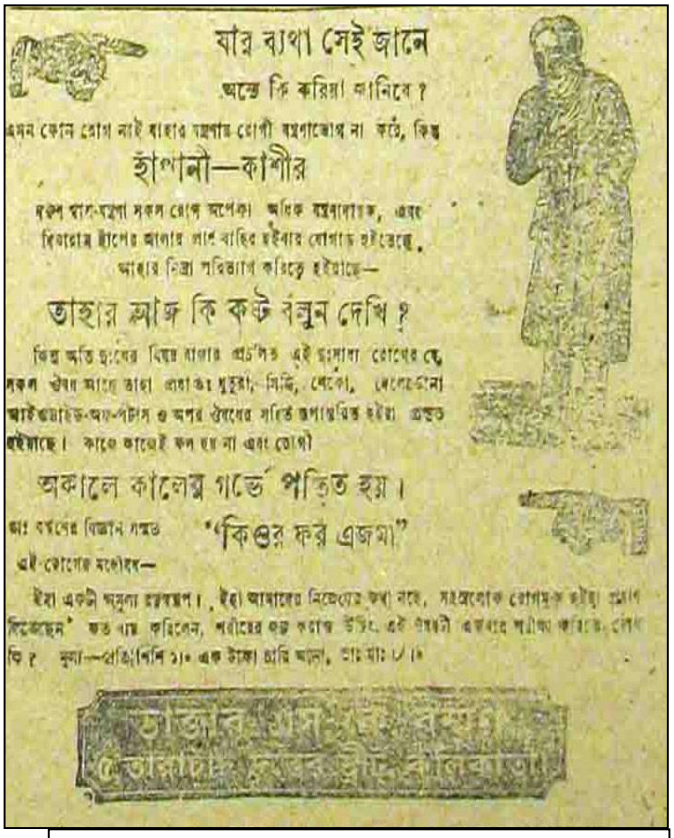
ইহার কারণ কি? কুইনাইন খাইয়া জ্বরের প্রথম অবস্থায়, জ্বর থামান যায় সত্য কিন্তু পরিণাম নির্দ্দোষ আরোগলাভ নহে। ইহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিকিৎসাভিজ্ঞেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব সময় থাকিতে অবহেলা করিবেন না। যদি ম্যালেরিয়ার কীটাম্বু ও তজ্জমিত প্লীহার আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে- **ডাঃ বর্ম্মণের 'এণ্ড কিওর'** ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না। ইহা মন্ত্রবলের ন্যায় জ্বরকে দূরীভূত করে। সেই জন্য ইহার নাম- অমৃত সঞ্জীবনী। মূল্য ৮ মাত্রা ছোট শিশি ৮ আনা, ডাঃ মাঃ ৫ আনা। ১৬ মাত্রা বড় শিশি ১০ আনা ডাঃ মাঃ ৬ আনা। ডাক্তার এস কে. বর্ম্মণ, ৫ তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[৬০]

ডাক্তার বর্ম্মণের 'কোলা টনিক' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে একটি গাছ রয়েছে এবং একটি হাতের ছবির মাধ্যমে 'কোলা টনিক' ঔষধের দিকে নির্দেশ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

অসম্ভবও কি সম্ভব হয়?

অবশ্য হয়, যদি কর্ম্মী থাকে সুদূর আফ্রিকা দেশে নিগ্রোজাতি এক প্রকার গাছের ফল খাইয়া পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি দূর করে। জানেন সে ফল কি? ইহার নাম- কোলা ফল। অদ্ভূত গুণশালী কোলার ক্রিয়া এই যে ইহা সকল সময়ে সকল অবস্থায় লোকের মনের প্রসন্নতা ও চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করে। এই জন্য ডাঃ বর্ম্মণ বহু পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে এক বৎসর পর্য্যন্ত শতাধিক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া- **কোলা টনিক** ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়াছেন।[৬১]

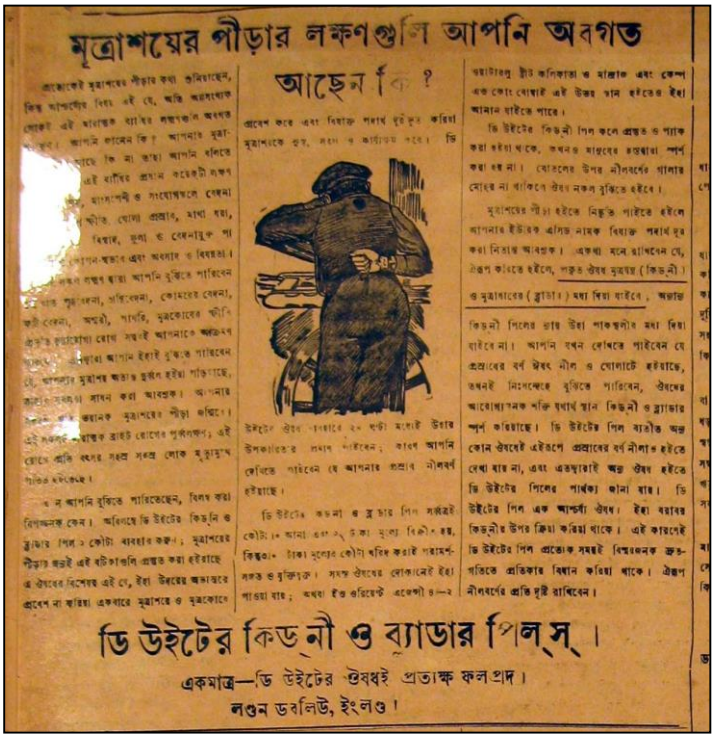

যার ব্যথা সেই জানে
অন্যে কি করিয়া জানিবে?
এমন কোন রোগ নাই যাহার যন্ত্রণায় রোগী যন্ত্রণাভোগ না করে, কিন্তু
হাঁপানী—কাশীর
যন্ত্রণা যাহা সকল রোগ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক, এবং
বিশেষতঃ হাঁপের আলায় প্রাণ বাহির হইবার যোগাড় হইতেছে,
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—
তাহার আজ কি কষ্ট বলুন দেখি?
কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় বাজার প্রচলিত এই যন্ত্রণাদায়ক রোগের যে
সকল ঔষধ আছে তাহা প্রায়ই ধুতুরা, সিদ্ধি, গাঁজা, বেলেডোনা
আইওডাইড-অব-পটাস ও অপর ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তুত
হইয়াছে। কাজে কাজেই ফল হয় না এবং রোগী
অকালে কালের গর্ভে পতিত হয়।
আঃ বর্ষের বিজ্ঞান সম্মত "কিওর ফর এজমা"
এই রোগের মহৌষধ—
ইহা একটী অমূল্য রত্নস্বরূপ। ইহা আমাদের নিজেরই কথা নহে, সহস্রলোক রোগমুক্ত হইয়া প্রাণ
দিতেছেন' ভক্ত বাক্য করিবেন, শরীরের শুদ্ধ করাক উচিৎ, এই ঔষধী একবার পরীক্ষা করিয়ে রোগ
কি? মূল্য—প্রতিশিশি ১৷০ এক টাকা আট আনা, ডাঃ মাঃ ৵৷০

চিত্র ১.১৮: 'কিওর ফর এজমা'

ডাক্তার এস.কে. বর্ম্মণ কর্তৃক উদ্ভাবিত **'কিওর ফর এজমা'** নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৫ অগ্রহায়ন ১৩২৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন লম্বা কোর্তাওয়ালা পুরুষ হাঁপানীতে কষ্ট পাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

[৬০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৬ অগ্রহায়ন ১৩২১, পৃ. ০৬।
[৬১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ. ০৬।

যার ব্যথা সেই জানে অন্যে কি করিয়া জানিবে? এমন কোন রোগ নাই যাহার যন্ত্রণায় রোগী যন্ত্রণাভোগ না কিন্তু হাঁপানী-কাশীর দরুণ শ্বাস-যন্ত্রণা সকল রোগ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক, এবং দিণ্ডারাম হাঁপের জ্বালায় প্রাণ বাহির হইবার যোগাড় হইতেছে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে-



চিত্র ১.১৯: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল্‌স

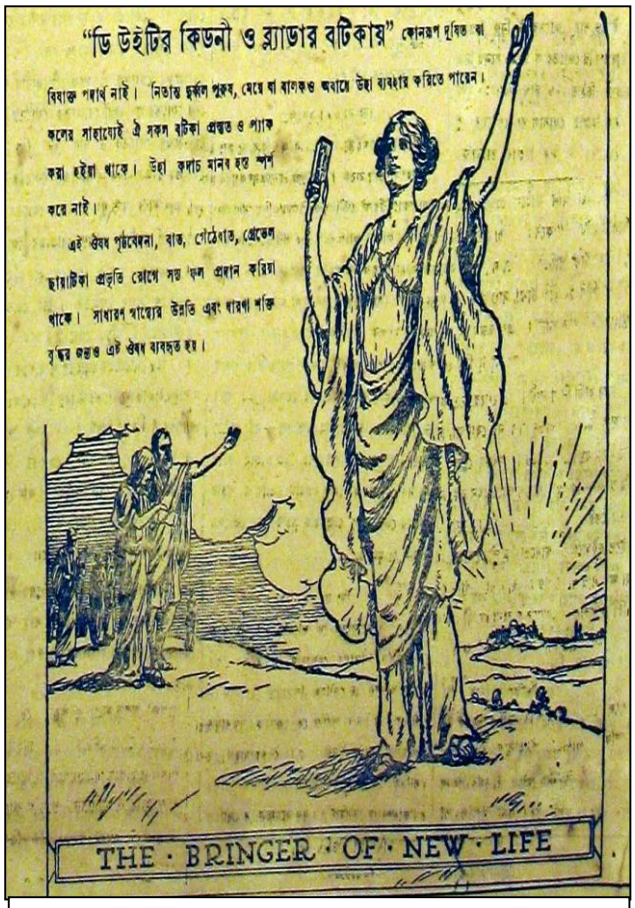
তাহার আর কি কষ্ট বলুন দেখি? কিন্তু অতি দু:খের বিষয় বাজারে এই দু:সাধ্য রোগের যে সকল ঔষধ তাহা প্রধানতঃ ধুতুরা, সিজি প্রভৃতি রূপান্তরিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কাজে কাজেই ফল হয় না এবং রোগী অকালে কালের গর্ভে পতিত হয়। ডাঃ বর্ম্মণের বিজ্ঞানসম্মত 'কিওর ফর এজমা' এই রোগের মহৌষধ। [৬২]

ই. সি. ডি উইটি এণ্ড কোং লিমিটেড কোম্পানির উদ্ভাবিত **'কিডনী ও ব্লাডার পিলস্'** নামক একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় কালো কোর্ট প্যান্ট ও মাথায় হ্যাট পরিহিত একজন ভদ্রলোক তার বাম হাত সামনের দিকে আর ডান হাত পিছনের দিকে এবং তিনি পিছন ফিরে আছেন। যার সম্মুখে চাকা সমেত একটি গাড়ি সদৃশ জিনিস। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

মূত্রাশয়ের পীড়ার লক্ষণগুলি আপনি অবগত আছেন কি? প্রত্যেকেই মূত্রাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণগুলি অবগত আছেন। আপনি জানেন কি? আপনার মূত্রাশয়ের রোগ আছে কি না তাহা আপনি বলিতে পারেন না। এই ব্যাধির প্রধান কয়েকটী লক্ষণগুলো হলো মাংসপেশী ও সংযোগস্থলে বেদনা, ঘোলা প্রস্রাব, মাথা ধরা, ফুলা ও বেদনাযুক্ত পা, অবসাদ ও বিষন্নতা।.... এই রোগে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এখন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, বিলম্ব করা বিপজ্জনক কেন। অবিলম্বে ডি উইটের কিডনি ও ব্লাডার পিল ১ কৌটা ব্যবহার করুন, মূত্রাশয়ের পীড়ার জন্যই এই বটিকাগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এ ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া একবারে মূত্রাশয়ে ও মূত্রকোরে প্রবেশ করে এবংবিষাক্ত পদার্থ দূরীভূত করিয়া মূত্রাশয়কে সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম করে। ডি উইটের ব্যবহারে ২৪ ঘন্টা মধ্যেই উহার উপকারিতার প্রমাণ পাইবেন; কারণ আপনি দেখিতে পাইবেন যে আপনার প্রস্রাব নীলবর্ণ হইয়াছে।

[৬২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ অগ্রহায়ন ১৩২৫, পৃ. ০২।

ডি উইটের কিডনী পিল কলে প্রস্তুত ও প্যাক করা হইয়া থাকে, কখনও মানুষের হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না। বোতলের উপর নীলবর্ণের গালার মোহর না থাকিলে ঔষধ নকল বুঝিতে হইবে। মূত্রাশয়ের পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আপনার ইউরিক এসিড নামক বিষাক্ত পদার্থ দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। একথা মনে রাখিবেন যে, ঐরূপ করিতে হইলে, প্রকৃত ঔষধ মুত্রযন্ত্র (কিডনী) ও মুত্রাধারের (ব্লাডার) মধ্য দিয়া যাইবে, অন্যান্য কিডনী পিলের ন্যায় উহা পাকস্থলীর মধ্য দিয়া যাইবে না। আপনি যখন দেখিতে পাইবেন যে, প্রস্রাবের বর্ণ ঈষৎ নীল ও ঘোলাটে হইয়াছে তখনই নি:সন্দেহে বুঝিতে পারিবেন, ঔষধের আরোগ্যজনক শক্তি যথার্থ স্থান কিডনী ও ব্লাডার স্পর্শ করিয়াছে। ডি উইটের পিল ব্যতীত অন্য কোন ঔষধেই এইরূপে প্রস্রাবের বর্ণ নীলাভ হইতে দেখা যায় না এবং এতদ্বারাই অন্য ঔষধ হইতে ডি উইটের পিলের পার্থক্য জানা যায়। ডি উইটের পিল এক আশ্চর্য্য ঔষধ। ইহা বরাবর কিডনীর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই কারণেই ডি উইটের পিল প্রত্যেক সময়ই বিস্ময়জনক দ্রুত গতিতে প্রতিকার বিধান করিয়া থাকে। ঐরূপ নীলবর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। **ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিলস্** একমাত্র-ডি উইটের ঔষধই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, লণ্ডন, ডবলিউ, ইংলণ্ড।[৬৩]



চিত্র ১.২০: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকা

ডি উইটের পিলের নতুন চিত্র সম্বলিত আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৫ আষাঢ় সংখ্যায়। ঢিলেঢালা পোষাকে আবৃত দেবী তুল্য একনারী জনগণের মাঝে কোন এক মহৌষধ বিতরণ করছেন এবং সবাইকে সুস্থ্য থাকার মূলমন্ত্র দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যার পিছনে উদীয়মান সূর্য্যের চিত্র রয়েছে যা জীবনের সমস্ত সংকটে আশার আলো ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে দেবীর নিকট অসুস্থ্য ও পীড়াগ্রস্থ সকলে লাইন ধরে আগমন করছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়–

'ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকায়' কোন রূপ দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। নিতান্তই দূর্ব্বল পুরুষ, মেয়ে বা বালকও অবাধে উহা ব্যবহার করিতে পারেন। কলের সাহায্যেই ঐ সকল বটিকা প্রস্তুত ও প্যাক করা হইয়া থাকে। উহা কদাচ মানব হস্ত স্পর্শ করে নাই। এই ঔষধ পৃষ্ঠবেদনা, বাত, গেঠেবাত, গ্রেভেল ছায়াটিকা প্রভৃতি রোগে সদ্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং ধারণা শক্তি বৃদ্ধির জন্যও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। The Bringer of New Life. [৬৪]

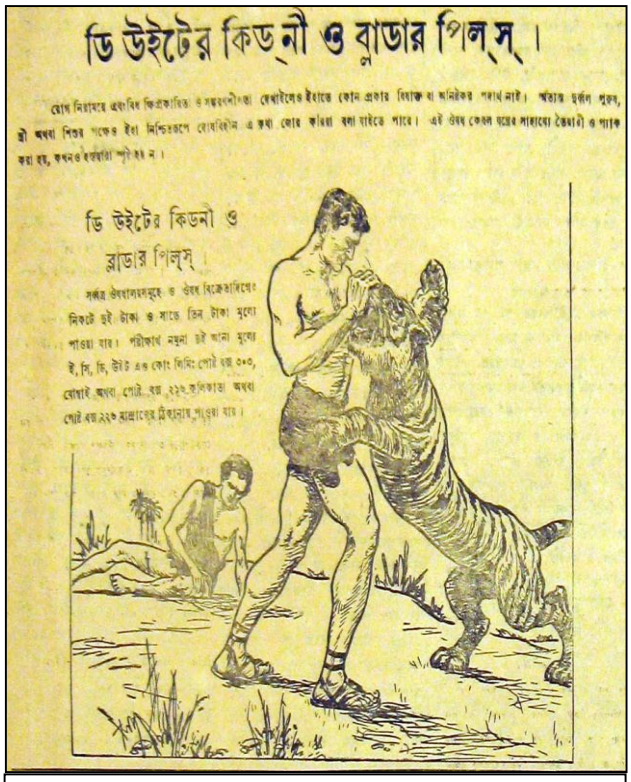
[৬৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ.০৬।
[৬৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ আষাঢ় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৮।

ডি উইটের আরেকটি বিজ্ঞাপন চিত্র প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ভাদ্র সংখ্যায়। চিত্রে দেখা যায়- একজন পীড়াগ্রস্থ সুন্দরী রমণী শয্যায় অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে। আরেকজন নারী তাকে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, যাকে নার্স বা সেবিকা বলেই মনে হয়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়–

ডি উইটের কিডনী এবং ব্লাডার পিল

তীব্রভাবে কার্য্যকরী হইলেও উহাতে কোনও অনিষ্টকর বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। দুর্ব্বল নরনারী ও বালকবালিকার পক্ষে ইহা বিশেষ শক্তিশালী। ইহা তৈয়ারী ও প্যাক হয়, এবং কদাচ হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

Friendly Aid- DE WITT'S Kidney & Bladder PILLS [৬৫]



চিত্র ১.২১: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকা

ডি উইটের আরেকটি বিজ্ঞাপন চিত্র প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২১ শ্রাবণ সংখ্যায়। চিত্রে দেখা যায়- একজন বলশালী শক্তিমান পুরুষ বাঘের সাথে যুদ্ধরত এবং বাঘকেই পরাস্থ করছেন বলেই মনে হয়। অন্য দিকে আরেকজন দুর্ব্বল লোক রাস্তায় বসে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর। চিত্রের সম্মুখ ভাগে কিছু লতাগুল্মের ছবি আঁকা হয়েছে এবং দূরে বড় তাল গাছের চিত্র অঙ্কিত।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়–

ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল্‌স।

রোগ নিরাময়ে এবং বিধ ক্ষিপ্রকারিতা সঙ্করণশীলতা দেখাইলেও ইহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত বা অনিষ্টকর পদার্থ নাই। অত্যন্ত দুর্ব্বল পুরুষ, স্ত্রী অথবা শিশুর পক্ষেও ইহা নিশ্চিতরূপে রোষবিহীন একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। এই ঔষধ কেবল যন্ত্রের সাহায্যে

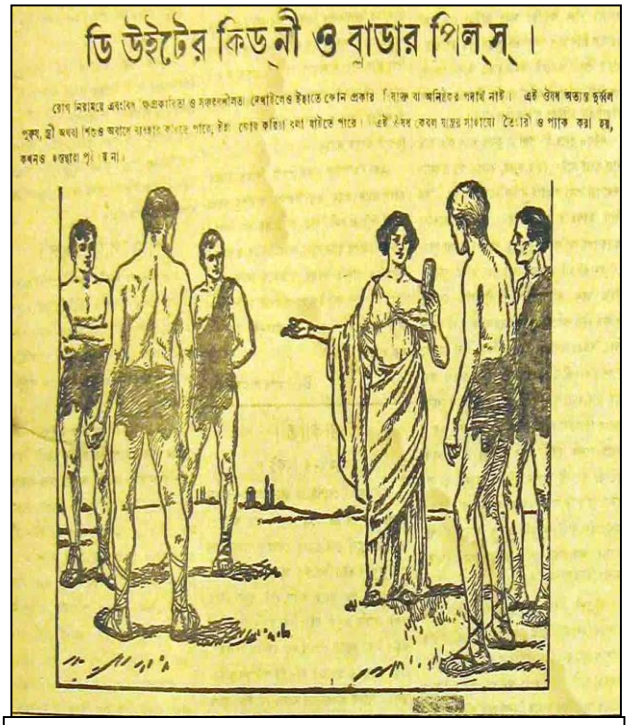


চিত্র ১.২২: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকা

[৬৫] ঢাকাপ্রকাশ, ২১ শ্রাবণ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২।

তৈয়ারী ও প্যাক করা হয়, কখনও হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

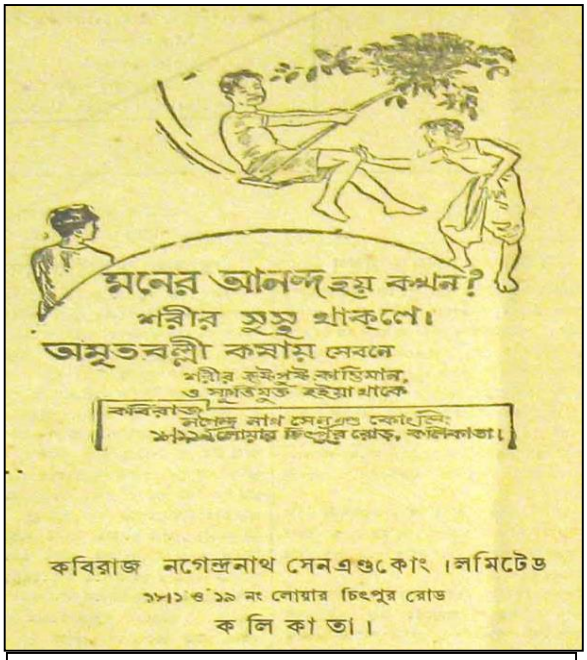
ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল্‌স।



চিত্র ১.২৩: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকা

সর্ব্বত্র ঔষধালয়সমূহে ও ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকটে দুই টাকা ও সাড়ে তিন টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থ নমুনা দুই আনা মূল্যে ই সি ডি উইট এণ্ড কোং লিমিঃ পোষ্ট বক্স ৩০৩, বোম্বাই অথবা পোষ্ট বক্স ২১৬, কলিকাতা অথবা পোষ্ট বক্স ২২৩ মাদ্রাজের ঠিকানায় পাওয়া যায়।[৬৬]

ডি উইটের আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটির চিত্রে দেখা যায় একজন মানবরূপী দেবী লোকজনকে কোন একটি ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন। ঔষধটির নাম যে ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিলস্ এর তা বলাই বাহুল্য। দেবীরূপী স্ত্রীলোকটি ঢিলে ঢালা পোষাকে আবৃত হলেও চিত্রের অন্য পাঁচজন পুরুষ লোক জাঙ্গিয়া পরিহিত। পুরুষ পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে স্ত্রীলোকটির ডানদিকে এবং বাঁকী দুই জন বামদিকে অঙ্কিত। ডান দিকের তিনজন সুদর্শন ও বলশালী পক্ষান্তরে বামদিকের দুইজন জীর্ণশীর্ণ ও রোগাক্রান্ত বলে মনে হয়। যেন রোগাক্রান্ত দুইজন ঐ বলশালীদের দেখিয়ে স্ত্রী লোকটি বলছেন-এসবই ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল্‌স্ এর ফলাফল।



চিত্র ১.২৪: ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার বটিকা

বিজ্ঞাপনের বিবরণে উল্লেখ আছে-

রোগ নিরাময়ে এবং বিধ ক্ষিপ্রকারিতা সঙ্করণশীলতা দেখাইলেও ইহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত বা অনিষ্টকর পদার্থ নাই। অত্যন্ত দুর্ব্বল পুরুষ, স্ত্রী অথবা শিশুর পক্ষেও ইহা নিশ্চিতরূপে রোষবিহীন একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। এই ঔষধ কেবল যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ারী ও প্যাক করা হয়, কখনও হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।[৬৭]

ডি উইটের বিজ্ঞাপনের মতই আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপনের চিত্র ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেডে প্রস্তুতকৃত

[৬৬] ঢাকাপ্রকাশ, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৬।
[৬৭] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা আশ্বিন ১৩২৩, পৃ. ০৬।

ঔষধটির নাম **'অমৃতবল্লী কষায়'**। ঔষধটির চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৯ এপ্রিল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত একটি বালক মনের আনন্দে গাছের ডালের সাথে দোল খাচ্ছে এবং আরেকজন গেঞ্জি ও ধূতী পরিহিত অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী বালক তাকে দোল দিচ্ছেন। অপর আরেকজন বালক তাদের আনন্দ উপভোগ করা দেখছেন।



চিত্র ১.২৫: অমৃতবল্লী কষায়

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়- মনের আনন্দ হয় কখন? করীর সুস্থ থাকলে। অমৃতবল্লী কষায় সেবনে শরীর হৃষ্টপুষ্ট কান্তিমান ও স্ফূর্তিযুক্ত হইয়া থাকে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।[৬৮]

'অমৃতবল্লী কষায়' নামক ঔষধের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৬ পৌষ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- ফুলেল প্রিন্টের শাড়ী, নাকে নাকফুল এবং হাতে চূড়ি পরিহিত এক নারী ঘোমটা অবস্থায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। যার মূখে প্রশান্তির অভিব্যক্তি প্রস্ফূটিত। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় **অমৃতবল্লী কষায়** কাজ করিবে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।'[৬৯]

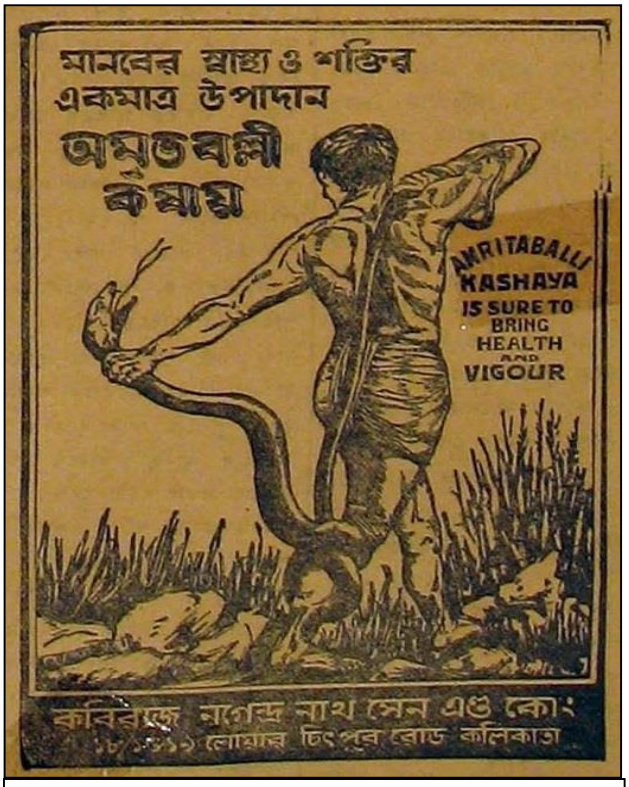


চিত্র ১.২৬: অমৃতবল্লী কষায়

'অমৃতবল্লী কষায়' নামক ঔষধের আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১লা অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনটিতে বিবরণের চেয়ে বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্যই চিত্রের ব্যবহার করেছে। চিত্রে দেখা যায় শার্ট, প্যান্ট ও জুতা পরিহিত একজন ব্যক্তির সঙ্গে শার্ট, হাফপ্যান্ট পরিহিত দুজন বালক ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলা করছে। সকলের হাতে একটি করে ব্যাট রয়েছে। সবাইকে খুব চনমনে ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। দূরে গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে।

[৬৮] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৬ বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০২।
[৬৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০১।

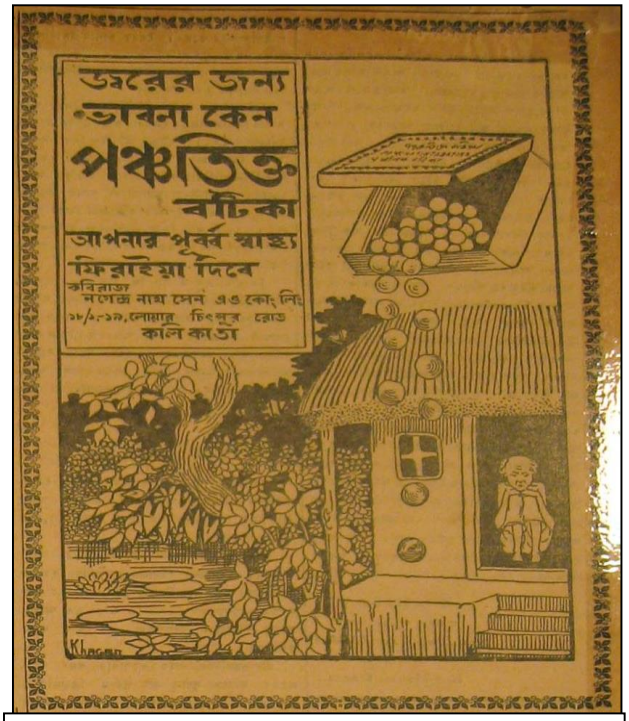
বিজ্ঞাপন চিত্রটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে- 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল।'[৭০]



চিত্র ১.২৭: অমৃতবল্লী কষায়

'অমৃতবল্লী কষায়' নামক ঔষধের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২৬ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- পাথর ও গুল্ম জাতীয় ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তির চিত্রায়ন করা হয়েছে যিনি অজগর সাপের সাথে লড়াইতে ব্যস্ত। অজগর সাপটি তার বিষদাঁত বের করে ছোবল দিতে উদ্যত কিন্তু লোকটি তাঁর বামহাত দিয়ে সাপটির গলা চেপে ধরেছেন এবং লোকটি ডান হাত দিয়ে সাপটির লেজ ধরে আছে। সাপটিও কম যায় না সে লোকটির পা পেঁচিয়ে ধরেছে। তবে লড়াইয়ে যে সাপটি হেরে যাচ্ছে ঐ বলশালী ব্যক্তির কাছে তা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞাপনের বিবরণ আগেরটির মতই সংক্ষিপ্ত যেখানে একলাইনে বলা হয়েছে- মানবের স্বাস্থ্য ও শক্তির একমাত্র উপাদান অমৃতবল্লী কষায়। AMRITABALLI KASHAYA is sure to bring HEALTH and VIGOUR. কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।'[৭১]

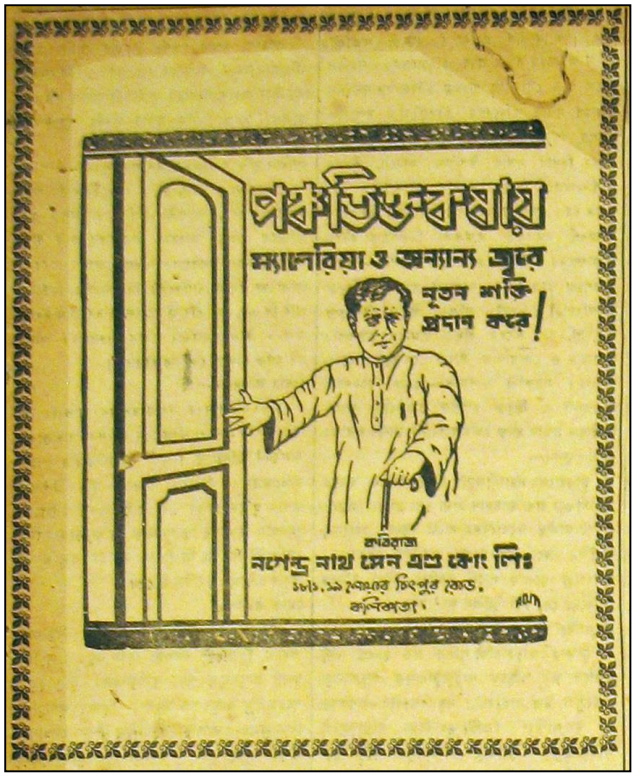


চিত্র ১.২৮: পঞ্চতিক্ত বটিকা

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেডের 'পঞ্চতিক্ত বটিকার' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১২ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- বারান্দা ও জানালা বিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যে একজন রোগাক্রান্ত লোক বসে আছে। সে দুশ্চিন্তায় মগ্ন বলে মনে হচ্ছে। ঘরের বাহিরে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা রয়েছে এবং গাছপালার সম্মুখে একটি পুকুর দেখা যাচ্ছে যার পানিতে শাপলা ফুল ভেসে আছে। গাছগুলোর মধ্যে একটি অশোক গাছ

[৭০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০২।
[৭১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৬ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০১।

বলে মনে হয়। যার বাঁকানো কাণ্ড রয়েছে। ঘরের উপরে একটি বাক্স রয়েছে যেখান থেকে গোল সদৃশ কিছু বস্তু নিচে পড়ছে। গোল সদৃশ বস্তু যে পঞ্চতিক্ত বটিকা তা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞাপনের বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত, যথা- জ্বরের জন্য ভাবনা কেন? পঞ্চতিক্ত বটিকা আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিবে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।'[৭২]



চিত্র ১.২৯: পঞ্চতিক্ত কষায়

পঞ্চতিক্ত কষায় এর আরেকটি চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ২৫ চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনে দেখা যায়- কাঠের নকশা করা একটি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্জাবী পরিহিত একজন বয়স্ক ব্যক্তি। যিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আগের বিজ্ঞাপনের মতই এটির বিবরণ বেশি নয়। বিবরণে উল্লেখ আছে-

পঞ্চতিক্ত কষায়

ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে নূতন শক্তি প্রদান করে।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড। ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।'[৭৩]

কবিরাজ কালীপদ দে কর্তৃক আবিষ্কৃত 'আশ্চর্য্য মলম' নামক আরেকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় গহনা পরিহিত একজন নারী একটি বড় চক্ষুর দিকে ডান হাতের অঙ্গুলি এবং বাম হাত দ্বারা পাঁচ পায়া বিশিষ্ট কাঠের টুলের উপরে রাখা ঔষধ ও তার প্যাকেটের দিকে নির্দেশ করছেন। নারীটির গায়ে ফুলেল প্রিন্টের শাড়ী রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-



চিত্র ১.৩০: চক্ষু রোগের জন্য 'আশ্চর্য্য মলম'

[৭২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১২ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৩।
[৭৩] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৩।

"আশ্চর্য্য মলম" রেজি নং ৬৬৭। চক্ষুরোগের চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। যদি না ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে অদ্যই ব্যবহার করিয়া ইহার আশ্চর্য্য ফল লাভ করুন। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। অসময়ের জন্য সংগ্রহ করুন। কঠিন কঠিন ব্যধির অমোঘ মহৌষধ। চক্ষুরোগ, বাত, বেদনা, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, কাশি,দন্তশূল, কাটাঘা, পোড়াঘা, ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ ও ক্ষতের আশু ফলপ্রদ ঔষধ। ভীষণ জালা হইতেছে সাবধানের সহিত ক্রয় করিবেন, ছাপা শিশি, সহিযুক্ত লেবেল, পুস্তক ও সার্টিফিকেট দেখিয়া লইবেন।

আবিষ্কারক- কবিরাজ শ্রীকালী পদ দে। ৪০/২ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন, কদমতলা, হাওড়া।[৭৪]

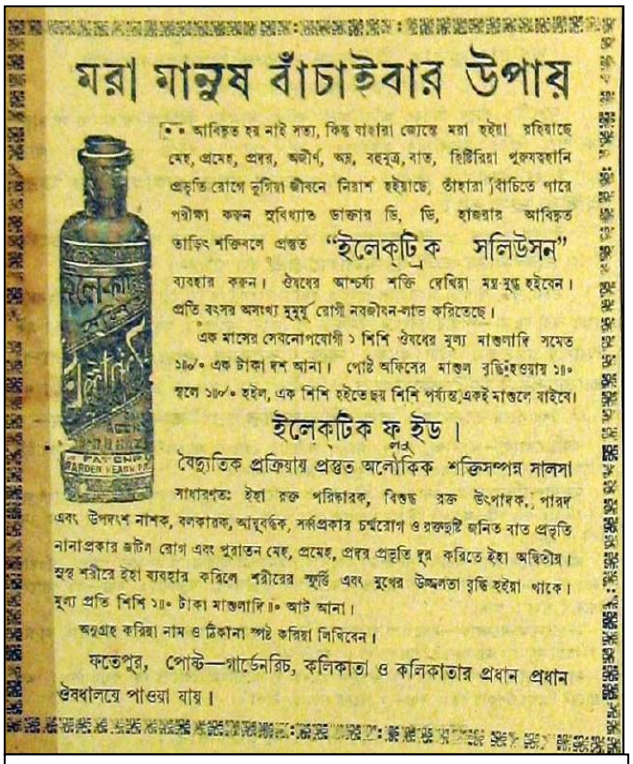
ঊনিশ শতকের সাময়িকপত্রগুলোতে প্রকাশিত বিশেষ করে চিকিৎসা বা ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে চিত্রের সমাহার দেখা যায়। ঔষুধগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলো 'মরা মানুষ বাঁচাইবার ঔষুধ' এর বিজ্ঞাপন যা চমকপ্রদ এবং আশ্চর্যজনকও বটে। বিজ্ঞাপনটি বিংশ শতকের প্রথমার্ধে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রায় সবগুলোতেই প্রচারিত দেখা যায়। 'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়' শিরোনামের বিজ্ঞাপনের বামপাশে ঔষুধের নাম ও কোম্পানীর নাম লিখিত একটি বোতলের চিত্র এবং ডানপাশে ঔষুধটির কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। শিরোনাম দেখে যে কেউ আশ্চর্যান্বিত হতে বাধ্য। কেননা আসলেই কি মরা মানুষ বাঁচানোর কোন ঔষুধ আছে? মজার বিষয় হচ্ছে শুধু পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এরকম শিরোনাম। মূলত'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়' শিরোনাম একটি লাইনের অর্ধেকাংশ যার অবশিষ্টাংশ হলো-'আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য'। অর্থাৎ পুরো লাইন হলো-**মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়** আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য। তবে আক্ষরিক অর্থে না হলেও ভাবার্থগত দিক চিন্তা করলে তাদের শিরোনামে বাস্তবিক সত্যই প্রতিভাত। কারণ কঠিন ব্যাধিওয়ালা মানুষ জীবিত থেকেও মৃতের মত। মূমুর্ষূ। যে স্বাভাবিক কোন কাজকর্ম করতে অক্ষম। যাইহোক, বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়-

> **মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়**আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু যাহারা জোন্তে মরা হইয়া রহিয়াছে মেহ, প্রমেহ, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র, বাত, হিষ্টিরিয়া, পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছে, তাঁহারা বাঁচিতে পারে। পরীক্ষা করুণ বিখ্যাত ডা. ডি. ডি. হাজরার আবিষ্কৃত তাড়িত শক্তিবলে প্র' ইলেকটিক সলিউসন' ব্যবহার করুন। ঔষুধের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতিবৎসর অসংখ্য রোগী মূমুর্ষূ রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। এক মাসের সেবনোপযোগী ১ শিশি ঔষুধের মূল্য মাশুলাদি সমেত দেড় টাকা হইবে।

[৭৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৭।

ইলেকটিক ফ্লুইড। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সালসা। সাধারণত ইহা রক্ত পরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ নাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক, সর্ব্বপ্রকার চম্মরোগ, রক্তদুষ্টি জনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরে স্ফুর্ত্তিএবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা এবং মাশুল আট আনা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখিবেন।



চিত্র- **১.৩১:** ইলেকট্রিক সলিউসন

সোল এজেন্ট ডা. ডি. ডি. হাজরা, ফতেপুর, পো. গার্ডেনরিচ, কলিকাতা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষুধালয়ে পাওয়া যায়।[৭৫]

আরেকটি বিজ্ঞাপন *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রায়শই দেখা যেত তাহলো পেশিবহুল একজন পুরুষের চিত্র এবং এরকম শরীর গঠনের ঔষুধ এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় স্যান্ড্রোগেঞ্জি পরিহিত পুরুষটি তার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে হাতের পেশী দেখানোর চেষ্টা করছে। এখানে বামহাতের আংশিক দেখা যাচ্ছে। তবে বুকের মাংশপেশীও স্ফীত এবং শক্তিমত্তার পরিচায়ক তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। মানুষটির চিত্রের নিচে এক লাইনে লেখা আছে- এরূপ স্বাস্থ্য আপনিও পেতে পারেন। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> শীতকালে স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজে হয় আর শীঘ্র হয় **অমৃতবল্লী কষায়** ব্যবহারে। **অমৃতবল্লী কষায়** তাজা রক্ত তৈরী করে। এক শিশি দেড় টাকা, মাশুল তের আনা। আর ব্যবহার করুন সর্ব্ব রোগহর

[৭৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, পৃ. ০২।

আয়র্ব্বেদের মুকুট মণি মকরধ্বজ- ৭দিন, এক টাকা মাশুল- পাঁচ আনা। অমৃতবল্লী কষায়ের সহিত একসাথে লইলে অতিরিক্ত মাশুল লাগে না। আমাদের প্রস্তুত জারিত ধাতু, মুক্তা, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ও মৃগনাভি বিশুদ্ধ ও সর্বত্র সমাদৃত।

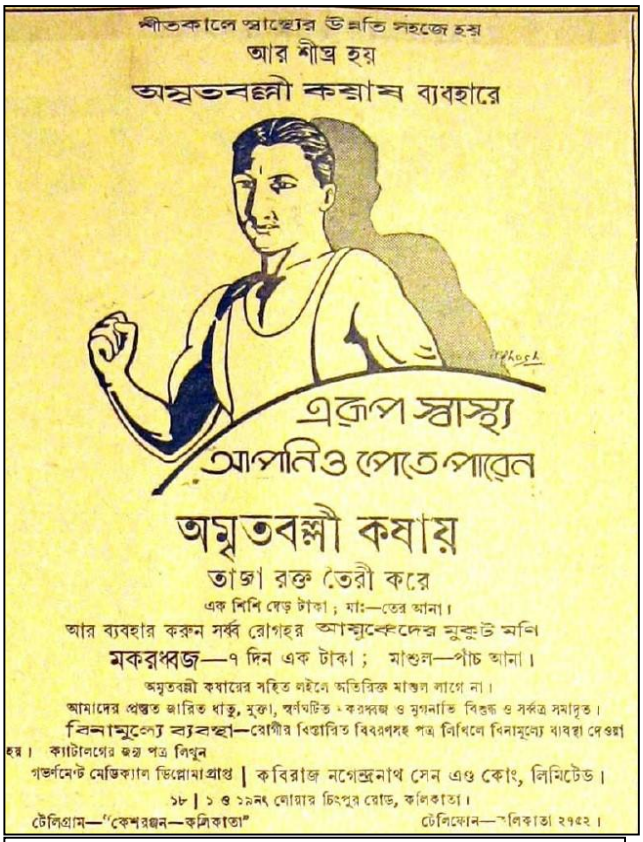
বিনামূল্যে ব্যবস্থা- রোগীরা বিস্তারিত বিবরণসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন-

গবর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত- / কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং. লিমিটেড।

১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

টেলিগ্রাম- "কেশরঞ্জন-কলিকাতা"

টেলিফোন- কলিকাতা- ২৭৫২।[৭৬]



চিত্র ১.৩২: অমৃতবল্লী কষায়

উপর্যুক্ত চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনের একটি সাধারণ মিল বা সাদৃশ্যতা চোখে পড়বে তাহলো উভয়টিতে একটি চিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র বিজ্ঞাপনে একটি চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৩৭ সালের *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে মোট তিনটি বিষয়বস্তুর চিত্রায়ন করা হয়েছে। চিত্রগুলো পশ্চাদপট বিহীন। বিষয়বস্তুতে দেখা যায়- একটি মশার চিত্র, একজন রোগগ্রস্থ পুরুষ মানুষ যার মাথায় পট্টি বাঁধা, ঔষুধের বক্স ও শিশি। মানুষের চিত্রে আরো দেখা যায় তিনি রোগগ্রস্থ অবস্থায় দুশ্চিন্তা করছেন এবং ভাবছেন অচিরেই তার মৃত্যু হবে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

[৭৬]*ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, পৃ. ০২।

ম্যালেরিয়াহবার আগেই সাবধান হতে হবে। প্রতি মিনিটে চারিজন ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। ম্যালেরিয়া সারাতে শুধু **পঞ্চতিক্ত কষায়ই পারে**। আজই এক শিশি সংগ্রহ করুন। দাম-এক শিশি ঔষুধ ১ ও কৌটা বটিকা এক টাকা মাশুল আট আনা।

আমাদের ঔষুধালয়ে সকল প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষুধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের প্রস্তুত জারিত ধাতু, মুক্তা, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ও মৃগনাভি বিশুদ্ধ ও সর্বত্র সমাদৃত।

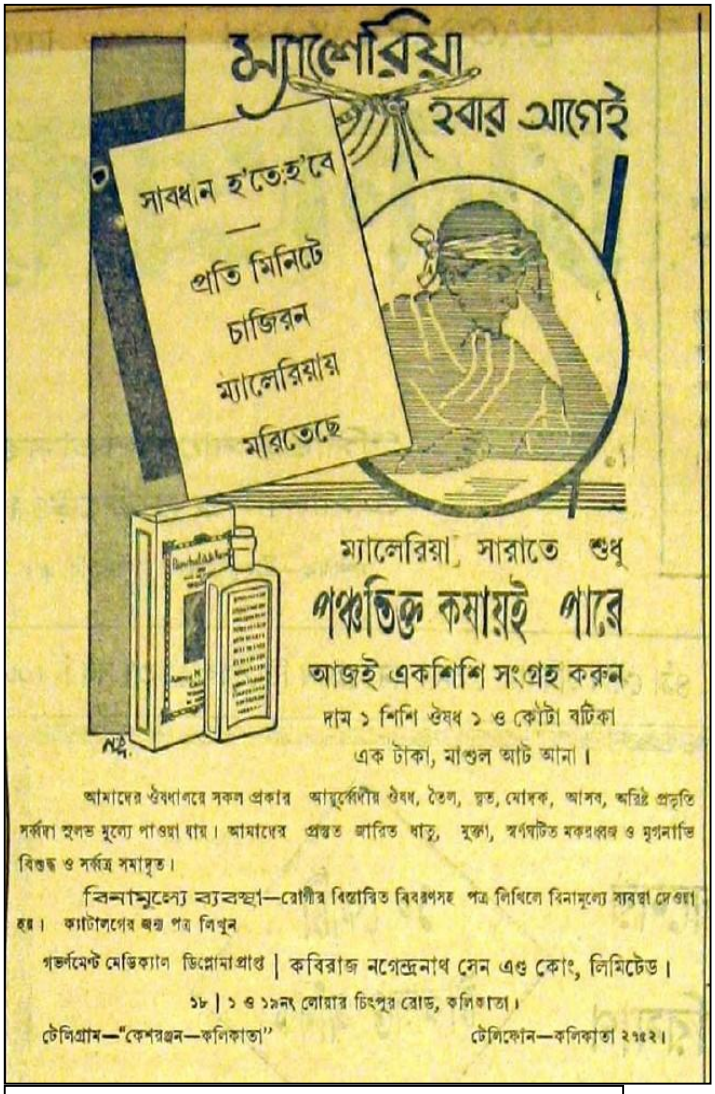
বিনামূল্যে ব্যবস্থা- রোগীরা বিস্তারিত বিবরণসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন-

গবর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত- / কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং. লিমিটেড।

১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

টেলিগ্রাম- "কেশরঞ্জন-কলিকাতা"

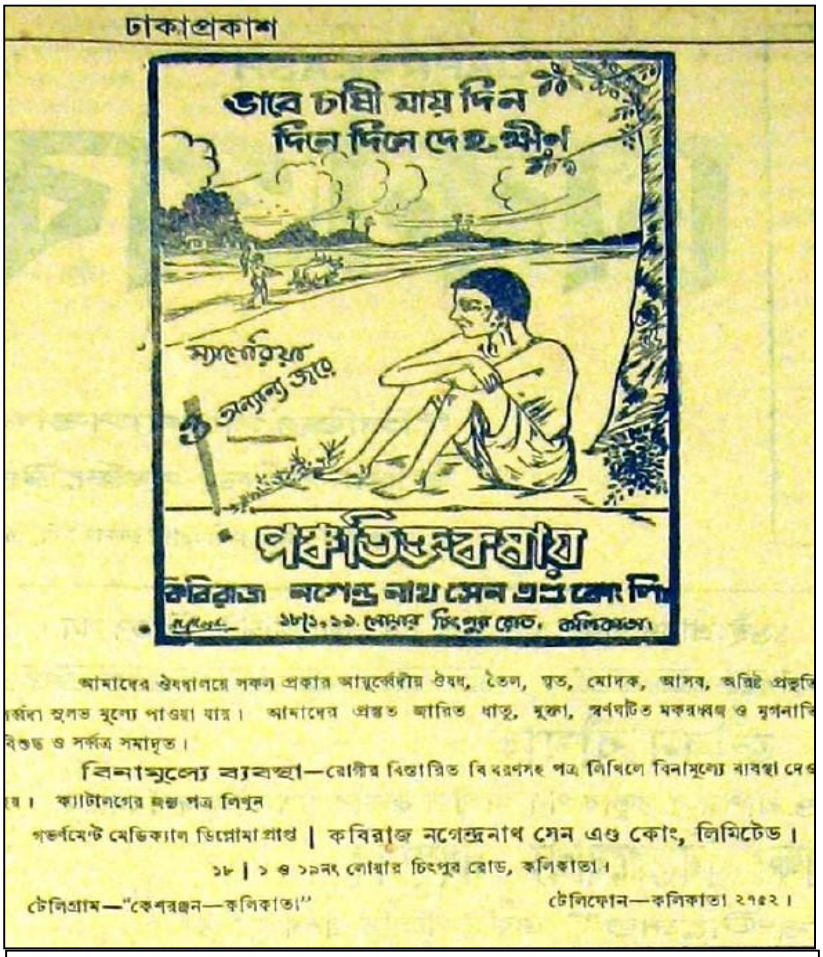
টেলিফোন- কলিকাতা- ২৭৫২।[৭৭]



চিত্র- ১.৩৩ : ম্যালেরিয়া রোগে পঞ্চতিক্ত কষায়

[৭৭]*ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, পৃ. ০২।

এই একই ঔষুধ পঞ্চতিক্ত কষায় এর আরেকটি চমৎকার বিজ্ঞাপনচিত্র প্রকাশিত হয় ১লা আগস্ট ১৯৩৭ সালের *ঢাকা প্রকাশ* এর দ্বিতীয় পাতায়। এই বিজ্ঞাপনচিত্রটির বিশেষত্ব এই যে, এটি একটি গ্রামীণ দৃশ্য সম্বলিত।চিত্রে দেখা যায় একজন কৃষক নদীর তীরে এক বৃহদাকার গাছের নিচে দুই হাঁটু ভাজ করে তার উপর দুই হাত রেখে গভার চিন্তায় মগ্ন। তার সামনে গ্রাম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। দূরে আরেকজন চাষী একজোড়া গরু এবং লাঙ্গল নিয়ে সম্মুখে ধাবমান। আকাশে সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। দৃশ্যটির উপরিভাগে দুই লাইনের একটি ছন্দ রয়েছে যাতে লেখা আছে- ভাবে চাষী যায় দিন, দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ।



চিত্র-১.৩৪ : পঞ্চতিক্ত কষায়

এই বিজ্ঞাপন দৃশ্যের নিচে **পঞ্চতিক্ত কষায়** এবং কোম্পানীর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঔষুধের নাম লিখে বুঝানোর চেষ্টা এই যে, দেহ সুস্থ্য ও সবল করতে বিশেষ করে ম্যালেরিয়া জ্বর ভালো করতে পঞ্চতিক্ত কষায় একমাত্র সমাধান।[৭৮]

পঞ্চতিক্ত কষায় ঔষুধের আরেকটি চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন চিত্র দেখা যায় *ঢাকা প্রকাশ* এর ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৭ সংখ্যায়। চিত্রের কোন পশ্চাদপট (Background) নেই। চিত্রে দেখা যায় একজন ধুতি পরিহিত ব্যক্তি ডান হস্ত উর্ধ্বে রেখে সম্মুখে ধাবমান। দেখে মনে হবে যে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছেন। বাঁচতে চাইছেন। কিন্তু তার পিছু ধাওয়া করছে একটি মশা। সম্বভত এটি ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ানো মশা। মশা যে যমের মত তাকে তাড়া করছে তা বোঝাতে মশাকে ব্যক্তিটির পিঠের উপর অঙ্কন করা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপন চিত্রটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে- পালিয়ে বাঁচা দায়। বিজ্ঞাপনে একটি শিশি চিত্রও রয়েছে। শিশির মধ্যখান এবং লোকটির দৌড়ানোর জন্য

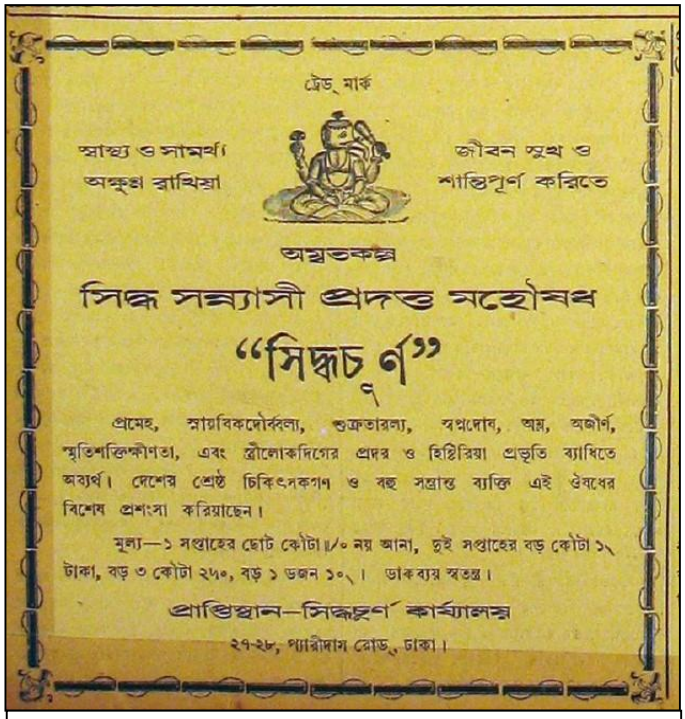
[৭৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা আগস্ট, ১৯৩৭, পৃ. ০২।

বক্রাকার রাস্তায় লিখিত রয়েছে **পঞ্চতিক্ত কষায়, ম্যালেরিয়া দূর করে।** চিত্রটির নিম্নভাগে কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা মূদ্রিত।



চিত্র- ১.৩৫ : পঞ্চতিক্ত কষায়

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় আরেকটি ঔষুধের বিজ্ঞাপনে চিত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঔষুধটির নাম **সিদ্ধচূর্ণ** । বিজ্ঞাপনের চিত্র একটি এবং অন্যান্য বিবরণ লিখিত আকারে প্রকাশিত। চিত্রটি একজন সন্যাসীর যিনি যোগাসনে বসে দুই হাতে দুটি বস্তু ঊর্ধ্বে ধরে আছেন। চিত্রটিতে পশ্চাদপট (Background) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে লেখা রয়েছে- স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অক্ষুন্ন রাখিয়া, জীবন সুখ ও শান্তিপূর্ণ করিতে অমৃতকল্প **সিদ্ধ সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধ "সিদ্ধচূর্ণ"** প্রমেহ, স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, অম্ল, অজীর্ণ, স্মৃতিশক্তিক্ষীণতা, এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে অব্যর্থ। দেশের শ্রেষ্ঠ

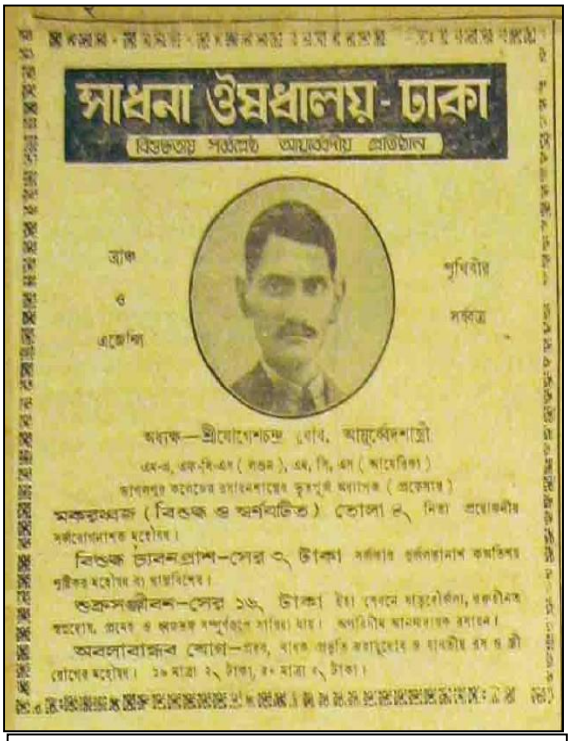


চিত্র- ১.৩৬ : সিদ্ধচূর্ণ এর বিজ্ঞাপন

চিকিৎসকগণ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই ঔষুধের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য- ১ সপ্তাহের ছোট কৌটা নয় আনা, দুই সপ্তাহের বড় কৌটা ১ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- সিদ্ধচূর্ণ কার্য্যালয়। ২৭-২৮, প্যারিদাস রোড, ঢাকা।[৭৯]

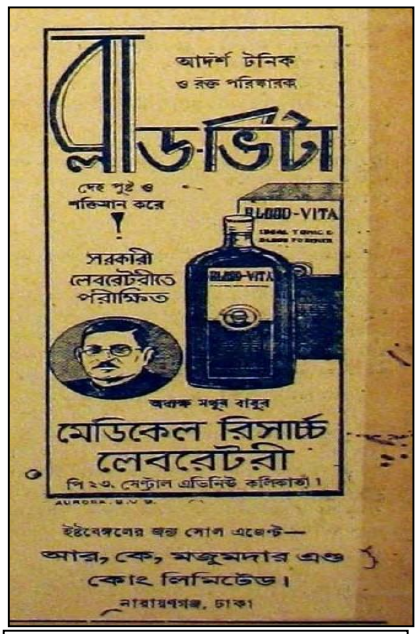
ঢাকার বিখ্যাত ঔষুধের দোকান বা ফার্মেসী **সাধনা ঔষধালয়**এর বিজ্ঞাপন অনেক আগে থেকেই *ঢাকা প্রকাশ* এ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তবে অনেক পরে এই ঔষধালয়ের স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এর একটি প্রোফাইল পিক এর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনে স্বত্ত্বাধিকারীর পরিচয় এবং এখানে প্রাপ্ত নানা প্রকার ঔষুধের নাম ও তার কার্যকারিতা এবং মূল্যলিপিবদ্ধ রয়েছে।



চিত্র- ১.৩৭ : সাধনা ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন

১৯৪০ সালে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ*এর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের ঔষুধ হিসেবে **এডওয়ার্ডস টনিক** ঔষুধটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। বিজ্ঞাপনে একটি বক্স দেখা যায় যা ঔষুধটির মোড়ক যার সম্মুখে রয়েছে একটি শিশি। মোড়ক ও শিশিটির গায়ের লেখা অস্পষ্ট তথাপি এগুলো যে এডওয়ার্ডস টনিকেরই হবে তা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞাপনে অল্প কথায় ঔষুধটির গুণাগুন লিপিবদ্ধ। যাতে লেখা আছে- এডওয়ার্ডস টনিক, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও সর্ব্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিঃ।[৮০]

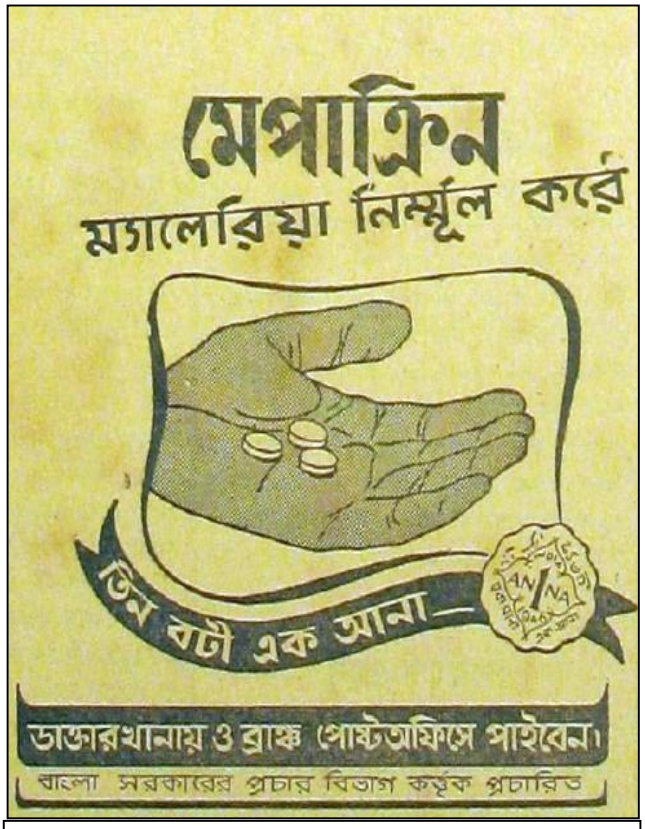
১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় অধ্যক্ষ মধুর বাবুর মেডিকেল রিসার্চ্চ লেবরেটরী কোম্পানীর একটি চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে একটি মোড়ক একটি শিশি এবং কোম্পানীর স্বত্ত্বাধিকারীর গোলাকার প্রোফাইল ছবি। ঔষুধের কার্যকারিতা হিসেবে লেখা আছে- আদর্শ টনিক ও রক্ত



চিত্র- ১.৩৮ : ব্লাডভিটা

[৭৯]*ঢাকা প্রকাশ*, ৭ই আগস্ট ১৯৩৮, পৃ. ০১।
[৮০]*ঢাকা প্রকাশ*, ৭ জুলাই, ১১ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট ১৯৪০, পৃ. ০১।

পরিষ্কারক **ব্লাড ভিটা** দেহ পুষ্ট ও শক্তিমান করে। অধ্যক্ষ মধুর বাবুর মেডিকেল রিসার্চ্চ লেবরেটরী। পি ২৩, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা।[৮১]



চিত্র- ১.৩৯ : মেপাক্রিন এর বিজ্ঞাপন

ম্যালেরিয়া রোগ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বাংলা সরকারের **মেপাক্রিন**নামক ঔষুধের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৯৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যারপ্রথম পাতায়। চিত্রভিত্তিক এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায়- একটি হাতের ছবি। হাতের পাঁচটি আঙ্গলই রেখাযুক্ত ও দৃশ্যমান। হাতের তালুতে ৩টি বটিকা রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে লেখা আছে- **মেপাক্রিন ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করে**।তিন বটী এক আনা। উল্লেখ্য যে, এক আনার একটি আধুলি বা কয়েনেরও একটি ছবি এখানে ছাপা হয়েছে। আর ঔষুধটির প্রাপ্তিস্থান হিসেবে লেখা আছে- ডাক্তারখানা ও ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে পাইবেন। বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।[৮২]

১৯৪৭ সালের *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় চর্ম রোগ বিষয়ক একটি ঔষুধের ইংরেজি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ঔষুধটির নাম সাপাট লোশন। বিজ্ঞাপনে চর্মরোগ বিশেষ করে দাউদ রোগে আক্রান্ত একটি পা এবং চুড়ি পরিহিত একটি হাতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রটির পশ্চাদপট বা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। চিত্রটিতে দেখা যায় চুড়ি পরিহিত হাতটি পায়ের পাতায় দাউদ আক্রান্ত স্থানে লোশন লাগিয়ে দিচ্ছেন।



চিত্র- ১.৪০ : সাপাট লোশনের বিজ্ঞাপন

[৮১]*ঢাকা প্রকাশ*, ৫ এপ্রিল ১৯৪২, পৃ. ০৪।
[৮২]*ঢাকা প্রকাশ*, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, পৃ. ০১।

সাপাট লোশনের বিজ্ঞাপন চিত্রটির বিবরণে ইংরেজিতে লেখা আছে-

For RINGWORM & SKIN DISEASES. World Famous since Last 50 Years. Do Not spoil clothes. Beware of irritation. **SAPAT LOTION. Sapat & Co. Bombay. 2**[৮৩]

১৯০০ সালের ১৭ মার্চ The Bengal Times পত্রিকায় চুলকানী সমস্যা নিরাময়ের জন্য CUTICURA SOAPবিজ্ঞাপনে চিত্রে ব্যবহার লক্ষণীয়। চিতে দেখা যায়- জুতা পরিহিত একজন ব্যক্তি দুই ধাপ বিশিষ্ট একটি জিনিসের উপর বাম পা রেখে পায়ের গোড়ালির উপরিভাগে চুলকাচ্ছে। তিনি যে এই সমস্যা খুবই বিরক্ত তা স্পষ্ট। কেননা দুই হাত দিয়েই তিনি চুলকাচ্ছেন। বিজ্ঞাপনে বিবরণ অংশে ইংরেজিতে লেখা আছে-

CUTICURA THE GREAT SKINCURE. ITCHING SKIN HUMOURS instantly relieved by CUTICURA..... MOTHERS to know that CUTICURA Soap is the greatest of skin purifiers and healthycare as well as purest and sweetest of toilet and baby soaps.[৮৪]



চিত্র- ১.৪১ : কিউটিক্যুরা সাবান এর বিজ্ঞাপন

CUTICURA Soap এর আরেকটি চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালের ৩১ মার্চ। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সর্বমোট চারটি চিত্র ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটির উপরিভাগে সাবানটির নাম এবং তার নিচে চারটি ভাগ এবং প্রত্যেক ভাগের শিরোনাম এবং উপকারিতা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ। শিরোনাম চারটি যথাক্রমে- For the Complexion, For Red Rough Hands, For Hair and Scalp, For

[৮৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৭, পৃ. ০১।

[৮৪] *The Bengal Times,* 17 March 1900; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৩৭।

Sanative Uses.[৮৫]এখানে (১) For the Complexion শিরোনামের অনুচ্ছেদের চিত্রটিতে দুইজন ব্যক্তি পিঠে পিঠ লাগিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। বামপাশের জন দেখতে কুশ্রী কিন্তু ডান পাশের সুন্দর। বামপাশের জনের মুখে সম্ভবত পিম্পল বা ব্রণ জাতীয় রোগ হয়েছে একারণে তাকে অসুন্দর দেখাচ্ছে। আর ডান পাশের জনের মুখে পিম্পল বা ব্রণ জাতীয় কিছুই নেই। দুইজনের মুখের পার্থক্য দ্বারা ২টি বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, একজন কিওটিকুরা সাবান ব্যবহারের কারণে সুন্দর দেখাচ্ছে অন্যজন এটি ব্যবহার করে না।অথবা বামপাশের কুশ্রী ব্যক্তিটিও যদি এই সাবান ব্যবহার করে তাহলে সেও সুশ্রী একটি মুখমণ্ডল পেতে পারে।



চিত্র- ১.৪২ : কিউটিক্যুরা সাবান এর বিজ্ঞাপন

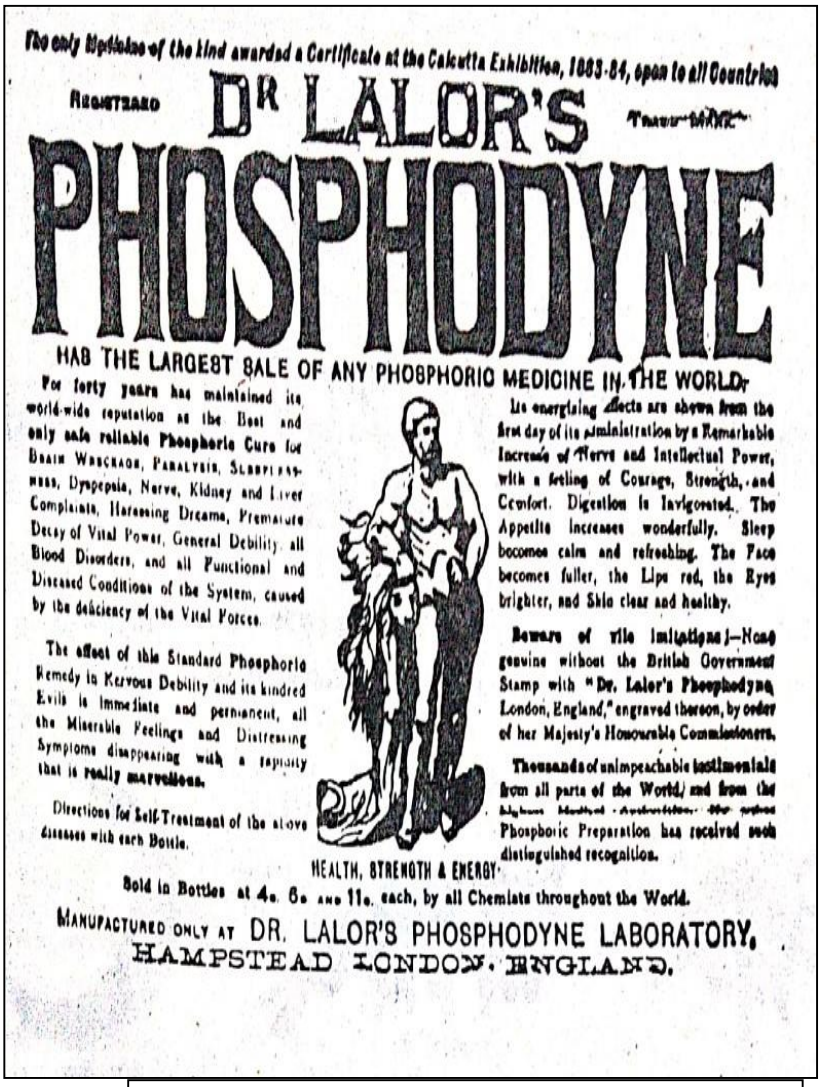
(২)For Red Rough Hands শিরোনামের অনুচ্ছেদের চিত্রটিতে একজন ব্যক্তির (সম্ভবত নারী) ডান হাত যার বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল ছড়ানো থাকলেও অন্য ৩টি আঙ্গুল ভাঁজ করা। আর হাতের পাতার মধ্যখানে একটি লালচে দাগ। যদিও সাদা কালো ছবি হওয়ায় লাল মনে হচ্ছে না। তবে শিরোনামের লাল লেখা দেখে মনে হয় এই রোগটির রং লাল।

[৮৫]*The Bengal Times,* 31 March 1900; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৩৯।

(৩) For Hair and Scalpশিরোনামের অনুচ্ছেদের চিত্রটিতে একজন রমণী তার দীঘল কালো চুল আঁচড়ানোর চেষ্টা করছে। ছবিটি দেখতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যদি কোন রমণী দীঘল কালো ও মসৃণ চুল পেতে চায় তাকে কিওটিকুরা সাবান ব্যবহার করতেই হবে।

(৪) For Sanative Usesশিরোনামের অনুচ্ছেদের চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে একজন নারী সম্ভবত মুখ ধৌত করছেন। তবে তিনি কি কোন বেসিন কিংবা এ জাতীয় কিছু চিত্রটিতে অনুপস্থিত। এর দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোন ধরনের ধৌত করারকাজে কিওটিকুরা সাবানের ব্যবহার অদ্বিতীয়।

১৯০৪ সালের ২৭ জুলাই *The Bengal Times* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় লন্ডন ভিত্তিক Dr. Lalor's Phosphodyne Laboratory কর্তৃক প্রস্তুতকৃত PHOSPHODYNE নামের ঔষুধের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি দুইটি কলাম রয়েছে যার মধ্যখানে একটি চিত্র বিদ্যমান। চিত্রটিতে দেখা যায় একজন পেশীবহুল ও বলবান একজন পুরুষ সম্ভবত গাঁধা জাতীয় পশুর ঘাড়ের উপর ডান হাত রেখে হেলান দেওয়ার ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান আছে। পুরুষটির উর্ধ্বাংগ নগ্ন।চিত্রটির নিচে তিনটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে যথা- Health, Strength & Energy(সুস্বাস্থ্য, শক্তিশালী এবং ক্ষমতা)[৮৬]। এই তিনটি শব্দ দেখে যে কেউ অনুমান করতে পারবে যে, এটি একটি বলবর্দ্ধক বা সুস্বাস্থ্যের জন্য এই ঔষুধের জুরি মেলা ভার।


The only Medicine of the kind awarded a Certificate at the Calcutta Exhibition, 1883-84, open to all Countries

DR LALOR'S

PHOSPHODYNE

HAS THE LARGEST SALE OF ANY PHOSPHORIC MEDICINE IN THE WORLD.

For forty years has maintained its world-wide reputation as the Best and only safe reliable Phosphoric Cure for Brain Wreckage, Paralysis, Sleeplessness, Dyspepsia, Nerve, Kidney and Liver Complaints, Harassing Dreams, Premature Decay of Vital Power, General Debility, all Blood Disorders, and all Functional and Diseased Conditions of the System, caused by the deficiency of the Vital Forces.

The effect of this Standard Phosphoric Remedy in Nervous Debility and its kindred Evils is immediate and permanent, all the Miserable Feelings and Distressing Symptoms disappearing with a rapidity that is really marvellous.

Directions for Self-Treatment of the above diseases with each Bottle.

Its energising effects are shown from the first day of its administration by a Remarkable Increase of Nerve and Intellectual Power, with a feeling of Courage, Strength, and Comfort. Digestion is Invigorated. The Appetite increases wonderfully. Sleep becomes calm and refreshing. The Face becomes fuller, the Lips red, the Eyes brighter, and Skin clear and healthy.

Beware of the Imitations.—None genuine without the British Government Stamp with "Dr. Lalor's Phosphodyne, London, England," engraved thereon, by order of her Majesty's Honourable Commissioners.

Thousands of unimpeachable testimonials from all parts of the World, and from the highest Medical Authorities, the whole Phosphoric Preparation has received such distinguished recognition.

HEALTH, STRENGTH & ENERGY.

Sold in Bottles at 4s. 6s. and 11s. each, by all Chemists throughout the World.

MANUFACTURED ONLY AT DR. LALOR'S PHOSPHODYNE LABORATORY, HAMPSTEAD LONDON. ENGLAND.

চিত্র- ১.৪৩ : ফস্ফোডাইন এর বিজ্ঞাপন

[৮৬]*The Bengal Times*, 27 July 1900; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৪৯।

ঢাকার সাময়িকপত্রের চিত্রবিহীন বিজ্ঞাপনসমূহের বিষয়বস্তু ছিল আরো বৈচিত্র্যময়। এগুলোতে সাধারণত বর্ণের ছোট ও বড় করার মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাউদ বা যেকোন পাচরা নাশক ঔষুধও বাদ পড়েনি। এরকম দুইটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকা প্রকাশ*এর ১৮৭২ সালের একটি সংখ্যার প্রথম পাতায়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

প্লীহা ও দাউদের মহৌষধ। মাশুল সহিত নিম্নলিখিত রূপে বিক্রয় হইবে।

প্লীহা - পৌনে তিন আনা

দাউদ- পৌনে এক আনা

শ্রী শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়

পণ্ডিত সোহাগদল সার্কেল স্কুল পো: লৌহজঙ্ঘ, জেলা ঢাকা।

অন্যটিতে উল্লেখ করা হয়-

এন. কে. চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং, বাবুর বাজার

আমাদের দোকানে এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট পাঁচরা নাশক সাবান বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। অন্যান্য নানাপ্রকার নূতন জিনিশও বিক্রয় হইতেছে।

ঢাকা। ১লা আষাঢ়। ১২৭৯।[৮৭]

'সিদ্ধচূর্ণ' ঔষুধের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখের *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায়। মূল ব্যতিক্রম বিজ্ঞাপনটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনটিতে কোন চিত্র না থাকলেও বর্ডার নকশা পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে বাংলায় উল্লেখ করা হয়–

সন্ন্যাসী প্রদত্ত দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধ

সিদ্ধচূর্ণ

স্নায়বিক দৌব্বল্য, স্বপ্নদোষ, স্মৃতি ও ধারণা-শক্তি-ক্ষীণতা, অম্ল, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য

রক্তাল্পতা, প্রমেহ, স্ত্রীলোকদিগের প্রদর প্রভৃতি ব্যাধিতে বহুপরীক্ষিত ও একমাত্র অব্যর্থ

চিকিৎসকগণ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ ঔষধের বিশেষ প্রশংসা

[৮৭]*ঢাকা প্রকাশ*, ১লা আষাঢ়, ১২৭৯।

করিয়াছেন এবং ৩৫ বৎসর যাবৎ সহস্র সহস্র রোগী

ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছেন।

মূল্য:- দুই সপ্তাহের এক কৌটা ২ টাকা। প্যাকিং খরচ ও ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

স্ত্রীলোকদের শ্বেত-প্রদরে অব্যর্থ

"লিউগো"

সিদ্ধচূর্ণের সহিত নিয়ম মত সেবন করিলে স্ত্রীলোকদের শ্বেত-প্রদর অতি সত্ত্বর আরোগ্য হয়।

মূল্য:- ২ সপ্তাহের সেবনের ১ শিশি ২ টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

সোল এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটার– শ্রীসুধার বিহারী চক্রবর্ত্তী।

২৭-২৮ প্যারী দাস রোড, ঢাকা

A divine remedy that commands wide fame

Siddhachurna

Cures Nervous debility, Acidity, Dyspepsia,

Loss of Memory and Spermatorrhoea etc.

And Leucorrhoea in Females.

Price- One packet of Two weeks- Rs. 2/- only.

Postage and Packing cost extra.

If taken regularly with our Siddhachurna

Leugo

Will speedily and perfectly cure white –Leucorrhoea in Females.

One phial of two weeks- Rupees 2/- only.

Postage and Packing cost extra.

Sole Agent & Distributor- **Sudhir Behari Chakravorty**

27/28, Pyari Das Road, Dacca[88]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিজ্ঞাপনটি একই ফ্রেমে আবদ্ধ হলেও তা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে বর্ণিত থাকায় ব্যতিক্রমি ধারা চালু করেছে। কেননা ইতিপূর্বে এরকম একই বিজ্ঞাপনে দুইটি ভাষার ব্যবহার বিরল ছিল। সাধারণত ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার সাময়িকী (যেমন– *ঢাকা প্রকাশ*) তে বিজ্ঞাপন বাংলায় এবং ইংরেজি ভাষার সাময়িকী (যেমন– দি বেঙ্গল টাইম্‌স) তে বিজ্ঞাপন ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। অর্থাৎ পত্রিকার মূল ভাষা বাংলা হলেও বিজ্ঞাপন ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপন প্রকৃতপক্ষেই নূতন ধারা চালু করেছিল বলেই প্রতিভাত হয়। এর কারণ বিশ্লেষণে বলা যায় যে, তৎকালীন সময়ে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে তারই পরিচয় বহন করে।

২. জমিজমা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত একটি বিজ্ঞাপন। ঊনিশ শতকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবংসর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকসমূহ বিশেষ করে *ঢাকা প্রকাশ* এবং *দি বেঙ্গল টাইম্‌স* পত্রিকাগুলোতে জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে ছাপা হতো। যদিও এই বিজ্ঞাপনগুলোতে চিত্রের ব্যবহার খুব একটা দেখা যেত না এবং বিজ্ঞাপনটি হতো একেবারে সংক্ষিপ্ত। সাধারণত জমি বিক্রয়ের কথা বিজ্ঞাপনের শিরোনামেই লেখা থাকতো এবং বিজ্ঞাপন গর্ভে শুধু জমির অবস্থান, প্লট নম্বর এবং যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ থাকতো।

১৯৩৭ সালের ১১ এপ্রিল*ঢাকা প্রকাশ* এ প্রকাশিত এরকম একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> জমি বিক্রয়
>
> ঢাকা পুরানাপল্টন মহল্লার অন্তর্গত সেগুনবাগিচাস্থিত ৩১ নং প্লট বিক্রয় হইবে। পঞ্চায়েত অফিসে অনুসন্ধান করুন।[৮৯]

১৯৪১ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় বাড়ি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। এতে বলা হয়-

বাড়ী বিক্রয়

[৮৮]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৪৭, পৃ.০৪।

[৮৯]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৮শে চৈত্র ১৩৪৩;১১ এপ্রিল ১৯৩৭, পৃষ্ঠা নং ৪।

ঢাকা সহরের ১৫ নং দিগবাজারস্থ দোতালা, তেতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। দিগবাজার ৫৩ নং বাড়ীতে অনুসন্ধান করুন।[৯০]

উল্লেখ যে, উক্ত বিজ্ঞাপনটি একাধিকবার *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। জমি বিক্রয়ের জন্য নিলাম হইবার খবর ও তারিখ সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকা প্রকাশ* এর ২১ জুন ১৯৪২ সংখ্যায়। সংযুক্তি হিসেবে জমির স্বত্ত্ব-মালিকানার তপছিলও উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

জমি বিক্রয় বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, সহর ঢাকা দিগবাজার নিবাসী বাবু চারুচন্দ্র দাস দেউলিয়া ষ্টেটে ঢাকা জি. জজ সাহেব বাহাদুরের নিযুক্তিয় রিসিভার শ্রী গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ওরফে জি. ঘোষ মহাশয়ের ষোল আনা নিষ্কর লাখেরাজ স্বত্ত্ব দখলিয় নিম্ন তপছিল বর্ণিত খালী জমি ডি. জজ সাহেবের ২৯/৪/৪২ তারিখের অর্ডার অনুযায় আগামী ৩রা জুলাই বাংলা ১৩ আষাঢ় তারিখ শুক্রবার দিবস বেলা ১টার সময় জজ আদালতের নেযামতের বারান্দায় নিলাম বিক্রয় হইবে। উক্ত ভূমির বাবদ ১৪০০ টাকা পর্য্যন্ত ইতিপূর্ব্বেoffer পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ১৪০০ টাকা হইতে নিলাম ডাক আরম্ভ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত ডাক হইলে নিলাম মঞ্জুর করা হইবে। খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ যথাসময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া নিলাম ডাকিবেন এবং সর্বোচ্চ ডাক মঞ্জুর হইলে তখনই মূল্যের এক চতুর্থাংশ টাকা দিতে হইবে। উক্ত ভূমির পরিমাণ, পরিচয় স্বত্ত্বাদি সম্পর্কে খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করিয়া নিবেন। তজ্জন্য রিসিভারের কোনরূপ দায়িত্ব থাকিবেক না।

নিবেদক- জি. ঘোষ, রিসিভার।[৯১]

তপছিল

জিলা ঢাকা থানা সুত্রাপুর সদর সবরেজেষ্টারী ও মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকাধীন পং জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা কালেক্টরীর ৩.৭৬ বি ১নং তৌজিভুক্ত পারগেণ্ডারিয়া লাখেরাজ কৃষ্ণমোহন দাস অন্তর্গত রিসিভারের লাখেরাজ স্বত্ব বিশিষ্ট খাস দখলিয় ভূমি যাহার চৌহদ্দি পশ্চিমে রিসিভারের অধীনে সাধারণ স্বেচ্ছাধীন উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়া শ্রীভোলানাথ দে মাঝি গং বাড়ী, উত্তরে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক একোয়ার করা খালি ভূমি, পূর্ব্বে সাবেক গোরস্থানের জায়গা হাল গভর্ণমেন্ট কর্তৃক একোয়ার করা খালি ভূমি, দক্ষিণে ৮ বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ বাড়ীর উত্তরস্থ পাকা পরদা এই চৌহদ্দি বিচ্ছিন্ন লাখেরাজ ভূমি ময় উত্তরস্থ ও পূর্ব্ব দিকস্থ গড় যাহা ১নং ওয়ার্ডের ৭০ নং সিটভূক্ত ও সে. মে মৌজা সহর ঢাকায় ১০৬৮১ নং মালিকী খতিয়ানের অন্তর্গত

[৯০] *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ঠা আশ্বিন ১৩৪৮;২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, পৃষ্ঠা নং ২।
[৯১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ই আষাঢ়, ১৩৪৯সন; ২১জুন ১৯৪২, পৃষ্ঠা নং ০২।

১০৬৮৩ নং খতিয়ানের অধীনস্থ ১০৬৮৪ নং খতিয়ানের ১৭৮ দাগ ষোল আনা এবং উক্ত ১০৬৮৩ নং খতিয়ানের ১৭৫/১৭৭ দাগের অংশ ময় উক্ত ভূমি হইতে পশ্চিমে শশীভূষণ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে যাতায়াতের জন্য উক্ত ভূমির পশ্চিমস্থ রিসিভারের স্বত্ব দখলিয় ভূমি যাহাতে বর্ত্তমানে তাহার অধীনে সাধারণ স্বেচ্ছাধীন উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়া গণের বাড়ী আছে, সেই সমস্ত ভূমির উত্তর পার্শ্ব দিয়া রিসিভারের সরকারী ৩ হাত পরিসর রাস্তার স্থাপন দিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে যাতায়াতের স্বত্বসহ উক্ত ভূমির দক্ষিণ মাথার মাপ পূর্ব্ব পশ্চিম রোক অনুমান ৭৬ ফুট, উত্তর মাথার মাপ ঐ রোকে অনুমান ৭০½ফুট, উত্তর দক্ষিণ রোকে পূর্ব্ব মাথার মাপ ময় উপরস্থ ৯ ফুট পরিসর গড়সহ অনুমান ৯৩½ফুট এবং ঐ রোকে পশ্চিম মাথার মাপ অনুমান ৮৪½ফুট । ভূমির পরিমাপ অনুমান (নয় কাঠা)।

নিবেদক–

জি. ঘোষ, রিসিভার।[৯২]

প্রকাশ থাকে যে, বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন শুধু উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা বিশেষ করে *ঢাকাপ্রকাশ* এ প্রকাশিত তা নয়। ইংরেজি বহুল প্রচারিত দি বেঙ্গল টাইম্‌স পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। জমি বিক্রয়ের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় দি বেঙ্গল টাইমস পত্রিকার ১৮৮৩ সালের ৯ জুন সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে দেখা যায়–

For Sale

A pucka two storied house no. 39 Armeniantollah and a piece of Land, nos. 38 and 71, Armeniantollah, Dacca.

The sale will take place on the above premises, on Monday, the 18th June 1883, at 4 p.m.

The Purchaser must pay to me, immediately on the lot being knocked down, 25 per centum on the amount of his purchase money, another balance of the purchase money on the 15th day after the stale inclusive of such day. In default of Which, the sum already paid shall be forfeited, and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property and the sum so forfeited.

For all particular apply to me.

[৯২] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জুন ও ৯ আগষ্ট ১৯৪২, পৃ.০২।

ROMAKUNTA NUNDY

Dacca

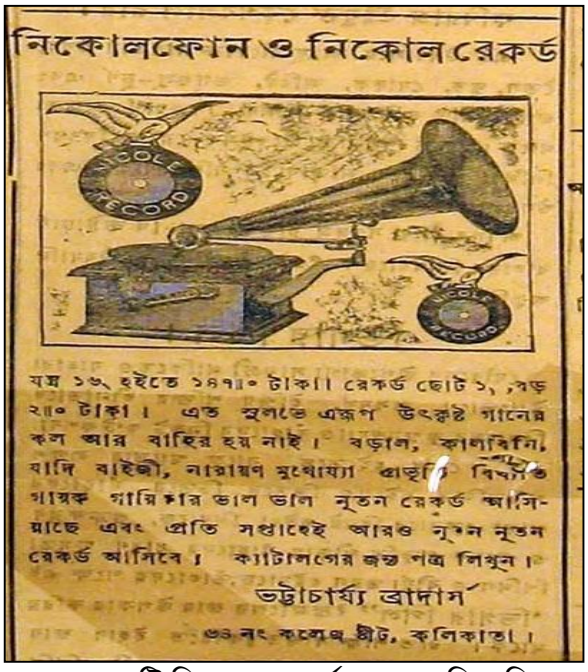
Late

The 8th June 1883

Reciever, Estate of

Mrs. D. J. CAYCHICK[93]

৩. আধুনিক মেশিনারিজ সংক্রান্ত



আঠারোশো সালে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। মানুষের কাজে কর্মে শিল্পের ব্যবহার বাড়তে থাকে। গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা, মিল, ফ্যাক্টরি। উৎপাদিত হতে থাকে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য নানা সামগ্রী হোক তা চলাচলের জন্য যানবাহন কিম্বা মনের আনন্দের খোড়াক যোগানো গান শোনার যন্ত্র।

সংগীত যন্ত্র নিকোলফোনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৮ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একটি নিকোলফোন ও দুটি নিকোল রেকর্ডের যন্ত্রের ছবি। নিকোল রেকর্ডের চিত্রটি একটি বড় ঈগলের পায়ের সাথে ঝুলানো বলেই মনে হয়।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

নিকোলফোন ও নিকোল রেকর্ড

যন্ত্র ১৬ টাকা হইতে ১৪৭ আট আনা টাকা। রেকর্ড ছোট ১ টাকা, বড় ২ টাকা । এত সুলভে এরূপ উৎকৃষ্ট গানের কল আর বাহির হয় নাই। বড়াল, কালবিনি, যাদি বাইজী, নারায়ন মুখায্যা প্রভৃতি বিখ্যাত গায়ক গায়িকার ভাল ভাল নূতন রেকর্ড আসিয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহেই আরও নূতন নূতন রেকর্ড আসিবে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[৯৪]

চিত্র ৩.১: নিকোলফোন ও নিকোল রেকর্ড

[৯৩] *The Bengal Times*, 9 June 1883; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪২০।

[৯৪] ঢাকাপ্রকাশ, ১৮ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।

গ্রামোফোন ও টাইপরাইটার কোম্পানীর গ্রামোফোনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একটি গ্রামোফোনের তিনটি মাইক সদৃশ যন্ত্র একটি ছোট রেকর্ড এবং আরেকটি ছোট গ্রামোফোন যার সামনে বসা রয়েছে একটি কুকুর। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

গ্রামোফোন। গ্রামোফোন।

আপন আপন গৃহে বসিয়া সর্বসাধারণের সহিত নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার এমন সুযোগ আর নাই। আসল গ্রামোফোন যন্ত্রে এবং প্রত্যেক রেকর্ডে উপরের মার্কা দেখিয়া লইবেন। আমাদের আসলপিনের বাক্সের উপর 'কুকুর কলের গান শুনিতেছে' এই ছবি দেখিয়া ক্রয় করিবেন।

মূল্য ৩নং কল ২২ টাকা আট আনা,৩ নং কল এ ৩৭ টাকা আট আনা, ৪নং কল ৫০ টাকা, ঐ সাউণ্ড আরম, ৬৫ টাকা, ৫ নং টেপার্ড আরম ৮২ টাকা, ১২ নং ডবল স্প্রীং ১১২ টাকা আট আনা, ১৩ নং তিন ডবল স্প্রীং ১৫০ টাকা, ১৪ নং তিন ডবল স্প্রীং ১৮৭ টাকা আট আনা, ১৫ নং তিন ডবল স্প্রীং ২২৫ টাকা।

সকল ভাষার নূতন নূতন রেকর্ড প্রতিদিন বিলাত হইতে আমদানী হইতেছে। আসুন, নূতন নূতন গান শুনুন এবং পছন্দ মত দেখিয়া ক্রয় করুন। কল খারাপ হইলে আমরা অতি স্বল্প ব্যয়ে মেরামত করিয়া থাকি।

আমরা ভিপিতে মফঃস্বলে মাল পাঠাইয়া থাকি। বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

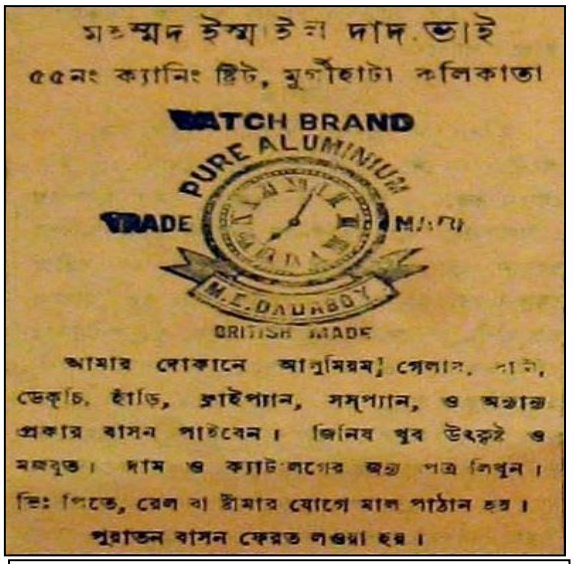
গ্রামোফোন এণ্ড টাইপরাইটার কোম্পানীর একমাত্র এজেন্ট। আর. সি মুখার্জি, বাবুবাজার, ঢাকা।[৯৫]



চিত্র ৩.২: গ্রামোফোন ও টাইপরাইটার

[৯৫] ঢাকাপ্রকাশ, ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

খাঁটি এলুমিনিয়ামের বাসনকোসনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- একটি ঘড়ি। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি ঘড়ি মার্কা এলুমিনিয়ামের তাই প্রকাশ করছে।



চিত্র ৩.৩: পিওর এল্যুমিনিয়াম

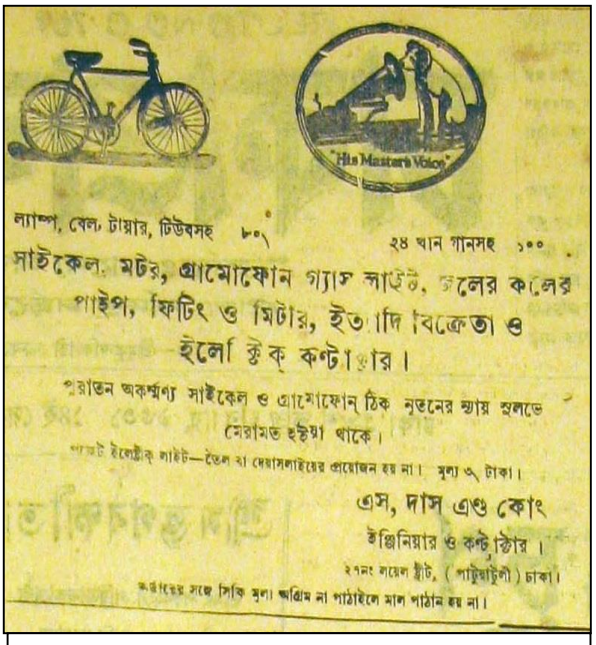
বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

মহম্মদ ইস্মাইল দাদু ভাই

৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, মুর্গীহাটা, কলিকাতা।

আমার দোকানে আলুমিনিয়াম গেলাস, বাটী, ডেকচি, হাঁড়ি, ফ্রাইপ্যান, সসপ্যান ও অন্যান্য প্রকার বাসন পাইবেন। জিনিষ খুব উৎকৃষ্ট ও মজবুত। দাম ও ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। ভিঃ পিতে রেল বা ষ্টীমার যোগে মাল পাঠান হয়। পুরাতন বাসন ফেরত লওয়া হয়।[৯৬]

সাইকেল ও গ্রামোফোনের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ২৯ ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি বাই সাইকেল ও একটি গ্রামোফোনের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।



চিত্র ৩.৪: সাইকেল ও গ্রামোফোন

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

ল্যাম্প, বেল, টায়ার, টিউবসহ সাইকেল ৮০ টাকা

২৪ খান গানসহ গ্রামোফোন ১০০ টাকা

সাইকেল, মটর, গ্রামোফোন, গ্যাস লাইট, জলের কলের পাইপ, ফিটিং ও মিটার ইত্যাদি বিক্রেতা ও ইলেক্ট্রিক কন্টাক্টার। পুরাতন অকর্ম্মণ্য সাইকেল ও গ্রামোফোন ঠিক নূতনের ন্যায় সুলভে মেরামত হইয়া থাকে।

এস. দাস এণ্ড কোং, ২৭ নং লয়েল ষ্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।[৯৭]

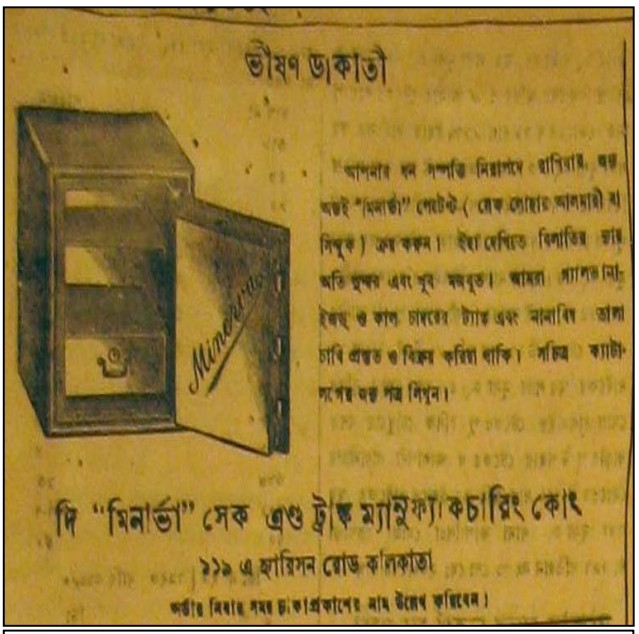
[৯৬] ঢাকাপ্রকাশ, ৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৬।
[৯৭] ঢাকাপ্রকাশ, ২৯ ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০২।

দি মিনার্ভা সেক এণ্ড ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং এর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৭ চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট ট্রাঙ্কের চিত্র দেখা যায়। যা খোলা অবস্থায় রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

ভীষণ ডাকাতী

আপনার ধন সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার জন্য আজই মিনার্ভা পেটেন্ট (রেল লোহার আলমারী বা সিন্দুক) ক্রয় করুন। ইহা দেখিতে বিলাতির ন্যায় অতি সুন্দর এবং খুব মজবুত। আমরা গ্যালভানাইজঙ ও কাল চাদরেরর ট্যাঙ্ক এবং নানাবিধ তালা চাবি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া থাকি। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।[৯৮]



চিত্র ৩.৫: মিনার্ভা সেক এণ্ড ট্রাঙ্ক মান্যুফ্যাকচারিং

গ্রামোফোনের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি বাক্স দেখা যায় যার উপরে গানের ডিস্ক রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

হরণ বিহীন

আসল 'কুকুর মার্কা' গ্রামোফোন মেসিন

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতী ডবল স্প্রিং মোটর মেহগ্নি পালিশ করা, ক্যাবিনেট একজিভিশন সাউণ্ড বক্সসহ। এই মেসিনের আওয়াজ অতি স্পষ্ট ও উচ্চ। এত অল্প মূল্যে সৃদুঢ় মেসিন বাজারে আর নাই। মূল্য ৯০ টাকা আট আনা।

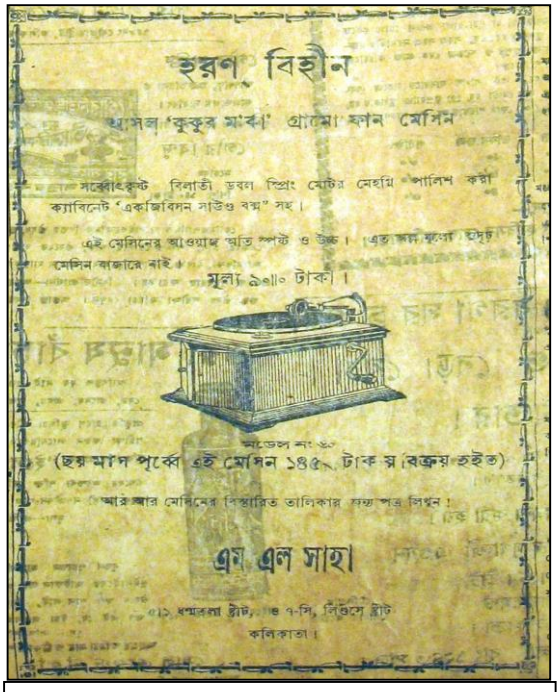
মডেল নং ৬০।

(ছয় মাস পূর্ব্বে এই মেসিন ১৪৫ টাকায় বিক্রয় হইত।)

আর আর মেসিনের বিস্তারিত জানতে পত্র লিখুন।

এম এল সাহা

৫/১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ও ৭-সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[৯৯]



চিত্র ৩.৬: কুকুর মার্কা গ্রামোফোন

[৯৮] ঢাকাপ্রকাশ, ৭ চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।
[৯৯] ঢাকাপ্রকাশ, ৪ঠ বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

মানুষের ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত 'লোহার কড়ি' নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লোহার কড়ির ৪টি চিত্র দেখা যায়।

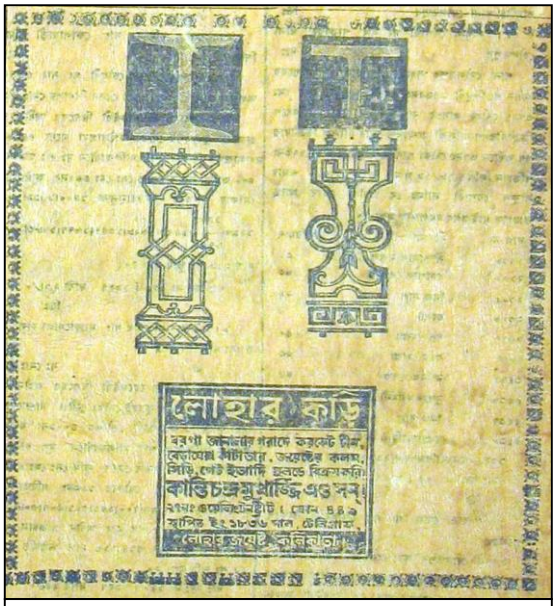
বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

লোহার কড়ি

বরগা জানালার গরাদে, করফেট টীন, বেড়াঘেরা কাঁটাতার, জয়েন্টের কলম, সিড়ি, গেট ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি।

কান্তি চন্দ্র মূখার্জ্জি এণ্ড সন্স

২৭ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ফোন ৪৪৯, স্থাপিত ইং ১৮৩৬, টেলিগ্রাফ। লোহার জয়েন্ট, কলিকাতা।[১০০]



চিত্র ৩.৭: লোহার কড়ি

ঊনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় আধুনিক মেশিনারিজের কিছু বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহার না থাকলেও পরে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের সুবিধার্থে অন্যান্য চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনের সাথে মেশিনারিজের বিজ্ঞাপনেও চিত্র ব্যবহার শুরু হয়। তবে মজার বিষয় হচ্ছে এসমস্ত বিজ্ঞাপনের বেশিরভাগেই আধুনিক মেশিনের ছবি অনুপস্থিত।

ঢাকা প্রকাশ এর ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসের একটি সংখ্যায় চিত্রবিহীন একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় যাতে মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রের সহজ লভ্যতার বিষয়টি দেশবাসীকে অবহিত করা হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

> গিরিশ যন্ত্রালয় নামে একটি নূতন যন্ত্রালয় আমাদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে সুলভে সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাহার প্রয়োজন হয়, আমাদিগের প্রতি কার্য্যভার প্রদান করিতে পারেন।[১০১]

ঢাকা প্রকাশ সাময়িকীতে মেসিন প্রেস এর বিজ্ঞাপনও যথেষ্ঠ গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। পত্রিকাটির ১৮৮৬ সালের ১ আগস্ট সংখ্যায় এরকম একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। যেখানে উল্লেখ করা হয় যে-

[১০০] ঢাকাপ্রকাশ, ৪ঠ বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।
[১০১] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ অগ্রহায়ন, ১২৭৬; ২৮ নভেম্বর ১৮৬৯

ঢাকাতে মেসিন-প্রেস এক নূতন জিনিস। এই প্রেসে প্রতিদিন দশহাজারের অধিক কাগজ ছাপান যাইতে পারে। ঢাকায় আর কোন প্রেসেই তিন হাজারের অধিক ছাপান যায় না। এজন্য কোন প্রেসেই সকালে সকালে সস্তা মূল্যে কাজ পাওয়া যাইত না। ঢাকা বাসীর এই ক্ষতি দূর করিবার জন্য বহু ব্যয়ে এই প্রেস আনা হইয়াছে। আমরা এত সস্তায় কাজ দিতেছি যে, ঢাকাতে কি কলিকাতাতে কোথাও এর সস্তা পাইবার উপায় নাই। দাখিলা কি পুস্তকাদি যে কোন কাজ হউক, আমরা অপেক্ষা সস্তা দরে অল্প সময়ে সুন্দররূপে ছাপাইয়া দিব।

এখানে তিন হাজার দাখিল (অস্পষ্ট) ৩০ খান বই পৌনে চারি আনায় বিক্রি হয়। ওকালত নামা কি ফিরিস্ত হাজার কার মূল্য সালে ষোল টাকা।

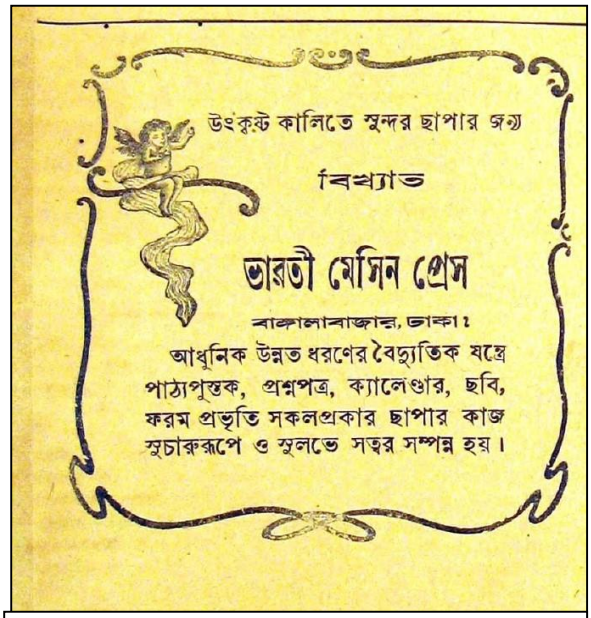
ঢাকা প্রকাশেরে মূল্য অসমর্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য ডাক মাসুল সহিত তিন টাকা করা হইয়াছে। আমার নিকট মূল্য ও চিঠিপত্র পাঠাইলে যাহার যে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে।

ঢাকা-বাঙ্গলাযন্ত্র শ্রীগুরু গঙ্গা আইচ চৌধুরী

১৭ শ্রাবণ, ১২৯৩; ১ আগস্ট, ১৮৮৬।[১০২]

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের চিত্র দেখলে প্রথমবার মনে হবে এটি কোন ড্রাগোনের চিত্র। কিন্তু আরেকটু সময় নিয়ে দেখলে ছবির মূল বিষয়বস্তু বোঝা যাবে এবং দেখা যাবে ড্রাগোন নয় সেখানে একটি পাখা বিশিষ্ট একজন বালিকা বসে আছে যার সদীর্ঘ কেশ রয়েছে। এই আঁকাবাঁকা কেশ দেখেই প্রথমদৃষ্টিতে তাকে ড্রাগোন মনে হয়। আবার বিজ্ঞাপনটির চারপাশের বর্ডারও চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। যাইহোক প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

> উৎকৃষ্ট কালিতে সুন্দর ছাপা হয়। **বিখ্যাত ভারতী মেসিন প্রেস**বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।আধুনিক উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র, ক্যালেণ্ডার, ছবি, ফরম

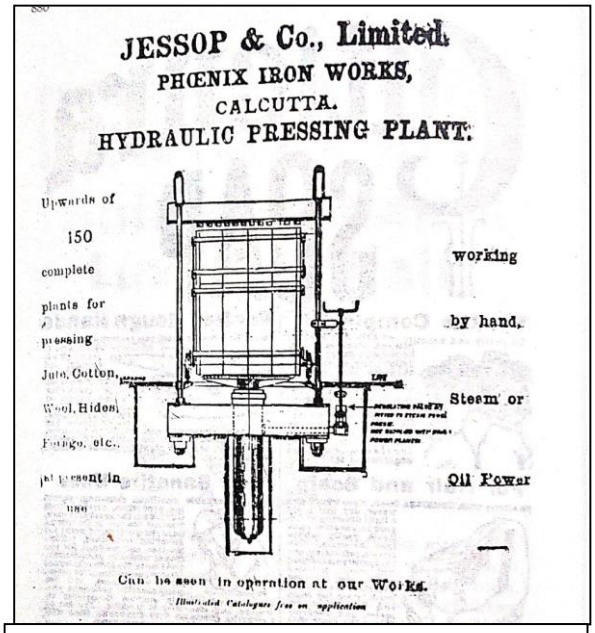


চিত্র ৩.৮: ভারতের মেসিন প্রেস

[১০২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ শ্রাবণ, ১২৯৩; ১ আগস্ট, ১৮৮৬।

প্রভৃতি সকলপ্রকার ছাপার কাজ সুচারুরূপে ও সুলভে সত্বর সম্পন্ন হয়।[১০৩]

১৯০০ সালের ৪ঠা এপ্রিল *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয়JESSOP & Co. |Limited এর Hydraulic Pressing Plant[১০৪] নামক আধুনিক যন্ত্রের। বিজ্ঞাপনে যন্ত্রটির একটি রেখাচিত্র প্রকাশিত হয় এবং কোন অংশ কিভাবে কাজ করে তা নির্দেশক চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।



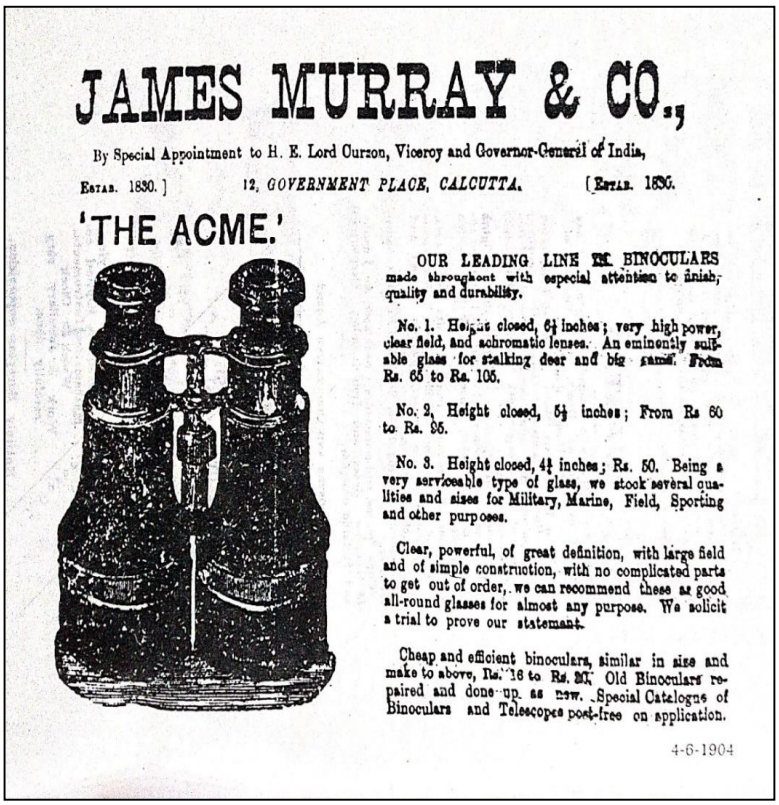
চিত্র ৩.৯: হাইড্রলিক প্রেসিং প্লানট

[১০৩]*ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, পৃ. ০২।

[১০৪]*The Bengal Times,* 4 April 1900; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৪০।

১৯০০ সালের ৪ঠা এপ্রিল *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয় JAMES MURRAY & CO. নির্মিতThe Acme নামের অত্যাধুনিক বাইনোকুলার যন্ত্রের। বিজ্ঞাপনের বামপাশে বাইনোকুলারের ছবি এবং ডানপাশে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। যন্ত্রটির গুণাগুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> .....Clear, powerful, of great definition, with large field and of simple construction, with no complicated parts to get out of order, we can recommend these as good all-round glasses for almost any purpose. We solicit a trail to prove our statement. [১০৫]



JAMES MURRAY & CO.,

By Special Appointment to H. E. Lord Curzon, Viceroy and Governor-General of India,

ESTAB. 1830.] 12, GOVERNMENT PLACE, CALCUTTA. [ESTAB. 1830.

'THE ACME.'

OUR LEADING LINE IN BINOCULARS made throughout with especial attention to finish, quality and durability.

No. 1. Height closed, 6½ inches; very high power, clear field, and achromatic lenses. An eminently suitable glass for stalking deer and big game. From Rs. 65 to Rs. 105.

No. 2. Height closed, 5½ inches; From Rs 60 to Rs. 95.

No. 3. Height closed, 4½ inches; Rs. 50. Being a very serviceable type of glass, we stock several qualities and sizes for Military, Marine, Field, Sporting and other purposes.

Clear, powerful, of great definition, with large field and of simple construction, with no complicated parts to get out of order, we can recommend these as good all-round glasses for almost any purpose. We solicit a trial to prove our statement.

Cheap and efficient binoculars, similar in size and make to above, Rs. 16 to Rs. 30. Old Binoculars repaired and done up as new. Special Catalogue of Binoculars and Telescopes post-free on application.

4-6-1904

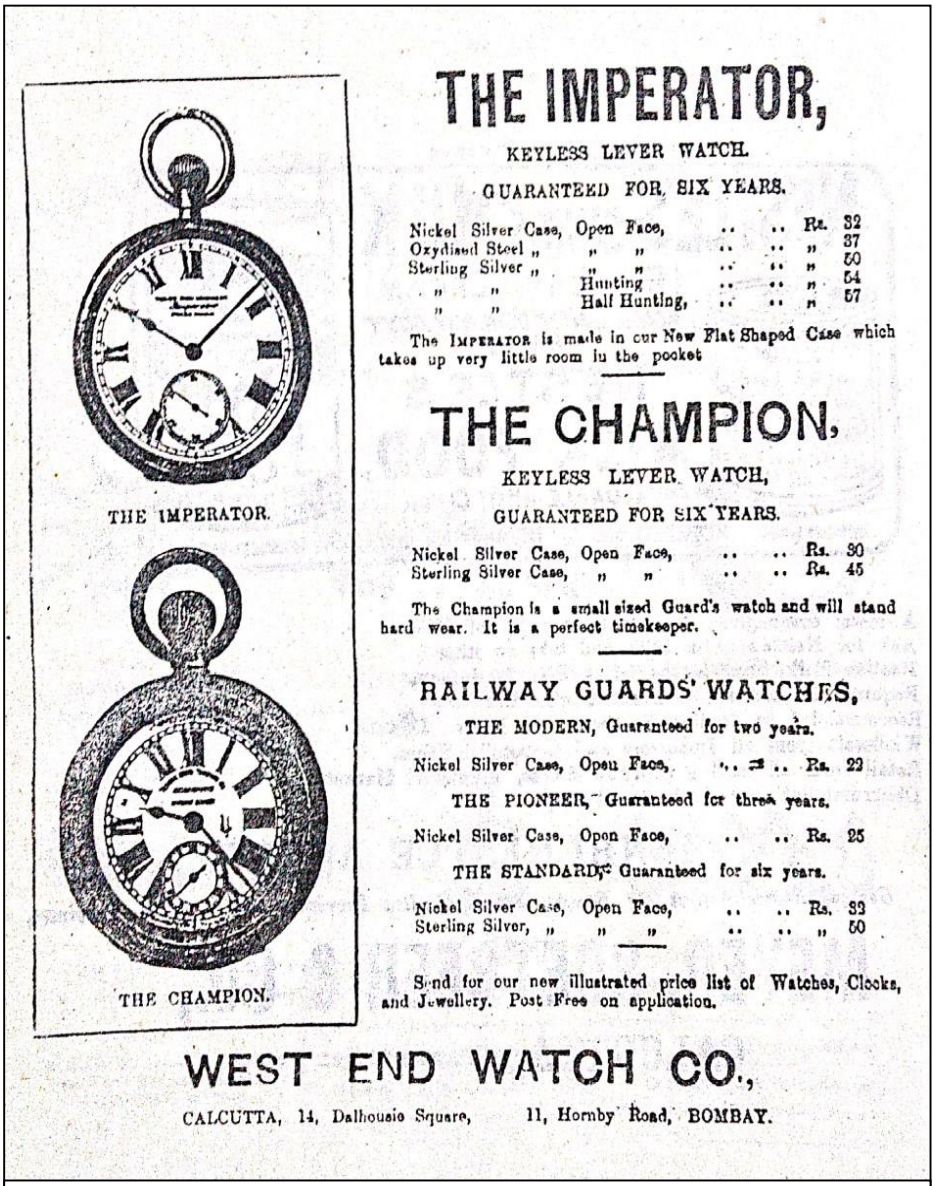
চিত্র- ৩.১০ : বাইনোকুলার এর বিজ্ঞাপন

১৯০৪ সালের ৩ ডিসেম্বর *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত WEST END WATCH CO. কোম্পানীর পশ্চিম দিক নির্দেশক ঘড়ির বিজ্ঞাপন।প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বাম পাশে দুটি পশ্চিম নির্দেশক দুটি ঘড়ির চিত্র এবং ডানপাশে ঘড়ি দুটির মূল্যসহ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। ঘড়ি দুটির একটির নামThe Imperatorএবং অন্যটি The Champion[১০৬]। ঘড়ি দুটির প্রধান গুণ হলো- Keyless Lever Watch.

[১০৫]*The Bengal Times,* 4 June 1904; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৪৪।

[১০৬]*The Bengal Times,* 3 December 1904; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৫২।

দুটি ঘড়িতেই ৬ বছরের গ্যারান্টি এবং দাম ৩২ রূপি থেকে ৫৭ রূপির মধ্যে কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞাপনটিতে Railway Guard Watches ঘড়ির বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।



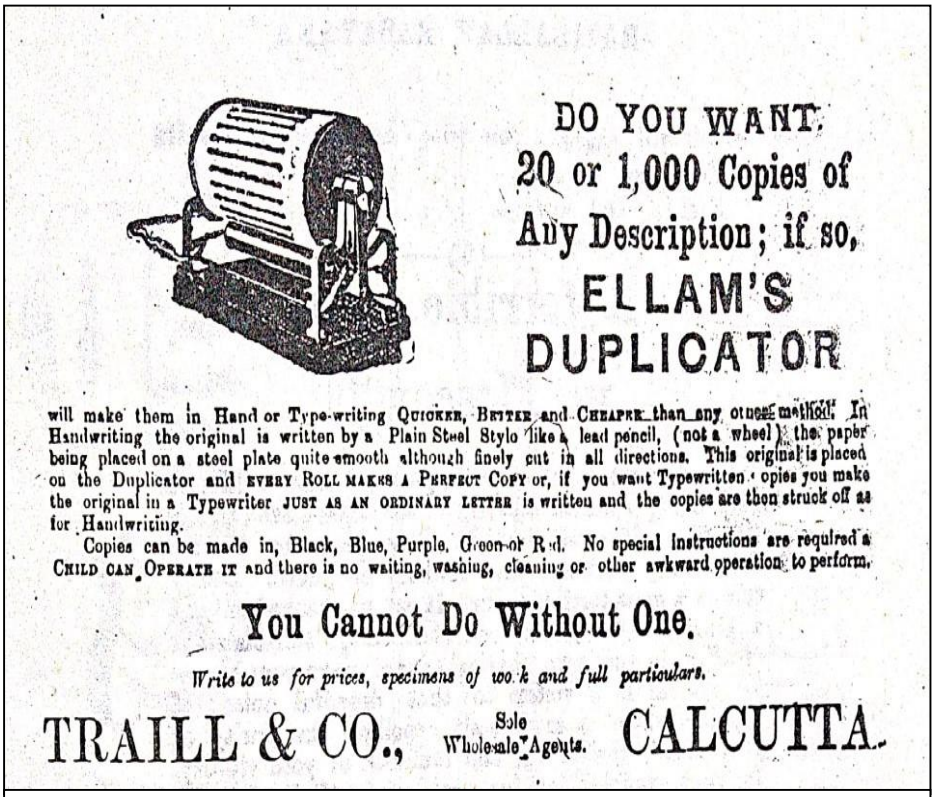
বিজ্ঞাপন চিত্র- ৩.১১ : পশ্চিম দিক নির্দেশক ঘড়িরবিজ্ঞাপন

১৯০৪ সালের ৭ ডিসেম্বর *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত TRAIL & CO. কোম্পানীর ফটোকটি মেশিনেরবিজ্ঞাপন। এতে মেশিনের একটি রেখাচিত্র ছাপা হয়।

উপরের দিকে গোলাকার ডিজাইন এবং নিম্নাংশে স্ট্যাণ্ড এর চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনটির বামপাশে মেশিন এবং ডানপাশ ও নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। বাম পাশে বড় ফন্টের ইংরেজিতে লেখা আছে- DO YOU WANT 20 OR 1,000 Copies of Any Description; if so, ELLAM's

DUPLICATOR.[১০৭]লেখার এই অংশ দেখেই বুঝা যাচ্ছে কেউ যদি ২০ বা ১,০০০ এর বেশি কোন কিছু ছাপাতে চায় বা কপি করতে চায় তাহলো তার জন্য ELLAM's DUPLICATORএকমাত্র ভরসা।

১৯০৪ সালের ৭ ডিসেম্বর *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত TRAIL & CO. কোম্পানীর ফটোকটি মেশিনের বিজ্ঞাপন।


DO YOU WANT
20 or 1,000 Copies of
Any Description; if so,
ELLAM'S
DUPLICATOR

will make them in Hand or Type-writing QUICKER, BETTER and CHEAPER than any other method. In Handwriting the original is written by a Plain Steel Stylo like a lead pencil, (not a wheel); the paper being placed on a steel plate quite smooth although finely cut in all directions. This original is placed on the Duplicator and EVERY ROLL MAKES A PERFECT COPY or, if you want Typewritten copies you make the original in a Typewriter JUST AS AN ORDINARY LETTER is written and the copies are then struck off as for Handwriting.

Copies can be made in, Black, Blue, Purple, Green or Red. No special instructions are required a CHILD CAN OPERATE IT and there is no waiting, washing, cleaning or other awkward operation to perform.

You Cannot Do Without One.

Write to us for prices, specimens of work and full particulars.

TRAILL & CO., Sole Wholesale Agents. CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন চিত্র- ৩.১২ : ডুপ্লিকেটর এর বিজ্ঞাপন

বাংলায় গার্মেন্ট্স শিল্পের পূর্বসূরী হিসেবে সূতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখা যায় *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৯৪০ সালের ৭ জুলাই তারিখের পত্রিকায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায়–

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি–

লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল্স লিমিটেড্

বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছে–

বর্ত্তমান মন্দার দিনে সম্পূর্ণ নিরাপদে টাকা খাটাইবার মত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

[১০৭]*The Bengal Times,* 12 December 1904; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৫৩।

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন:-

হেড অফিস ও মিল

নবীগঞ্জ, পো: আ. বন্দর, নারায়নগঞ্জ

কলিকাতা অফিস

১২, ডালহৌসি স্কয়ার

জেনারেল অর্গ্যানাইজার– পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম

মি: এন, ঘোষাল

(ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার-রাইটার)

০২, জনসন রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গে সূতার ডিষ্ট্রীবিউটার

মেসার্স বসু দাশ এণ্ড কোং

২৮, ওয়াটার ওয়ার্কস, ঢাকা[১০৮]

উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনটি ৩টি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত– লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল্‌স্ লিমিটেড এর বহুল প্রচার ও প্রসার। যা সূতা ব্যবহারকারী গার্মেন্ট্‌স গুলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দ্বিতীয়ত– বিজ্ঞাপনটির মূল উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠানে অর্থলগ্নী কারী ব্যক্তিবর্গ কিংবা ছোট-বড় প্রতিষ্ঠানের খোঁজ করা। এক্ষেত্রে অর্থ লগ্নীকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত লভ্যাংশের শতকরা হার ৫টাকা বলে ঘোষণা করা হয়। এজন্য আগ্রহীদের জন্য নারায়নগঞ্জ এবং কোলকাতা অফিসে যোগাযোগের জন্য ঠিকানাও সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও অনেকে অর্থ বিনিয়োগ করে ঠকেন এবিষয়টি উল্লেখ করে বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয় সম্পূর্ণ নিরাপদে টাকা খাটাইবার মত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড স্পিনিং মিল্‌স্ লিমিটেড। তৃতীয়ত– তৎকালীন সময়কে পূর্ব বঙ্গের জন্য অর্থনৈতিক মন্দা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থা চললে যেমন বাজার অস্থিতিশীল থাকে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা কঠিন হয়, প্রতারক চক্রের দৌরাত্ম বাড়তে থাকে তেমনি অবস্থার ইঙ্গিত পাই উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনটিতে। আবার ঐতিহাসিকভাবেও আমরা দেখলাম বিজ্ঞাপনটি প্রচারের তিন বছরের মধ্যে ১৯৪৩ সালে বাংলায় দূর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে। এই দিক বিবেচনায় আমরা বলতেই পারি যে, তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা যথার্থ ছিল বলেই মনে হয়।

[১০৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ জুলাই ১৯৪০, পৃ.০১।

৪. রূপচর্চা বা প্রসাধনী সংক্রান্ত

নারীদের রূপচর্চা করা তাদের নিত্যাকার স্বভাব। এজন্য বর্তমান কালের স্বনামধন্য কোম্পানীগুলো নারীর প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি ও বাজার জাত করে থাকে। ঠিক তেমনি উনিশ শতকের কোম্পানীগুলো বিশেষ করে প্রসাধনী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিনিয়ত তাদের পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন করে থাকে এবং বিজ্ঞাপন চিত্রেও ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে মহিলাদের মাথার চুলের জন্য বিভিন্ন প্রকার তৈল, শরীর পরিষ্কারক হিসেবে সাবান ও সুগন্ধে জন্য স্নো এর চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনের ব্যাপকতা দেখা যায়। উনিশ শতকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় প্রসাধনী সামগ্রীর যে বৈচিত্র্যতা গুলো লক্ষণীয় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

নারীর প্রসাধনী সামগ্রীর চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং বৈচিত্র্যময়তা দেখা যায় কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনের কেশরঞ্জন তৈলের বিজ্ঞাপনে। বিদ্যমান উদাহরণ বিশ্লেষণে দেখা যায় পণ্যটির প্রথম চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৫ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন নারী কোল বালিশের হেলান দিয়ে বসে আছে। যার হাতে চূড়ি ও গলায় গহনা দেখা যাচ্ছে। তবে তার কেশ মাথা ও ঘাড় ঢেকে রেখেছে। নারীর সম্মুখে একটি ফুলদানি রয়েছে যাতে নারিকেল গাছের ন্যায় পাতা সমৃদ্ধ ছোট প্রজাতির একধরণের গাছ রয়েছে। নারী চিত্রটির চারপাশে কেশরঞ্জন তৈলের উপকারিতা এবং গুণাগুণ সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

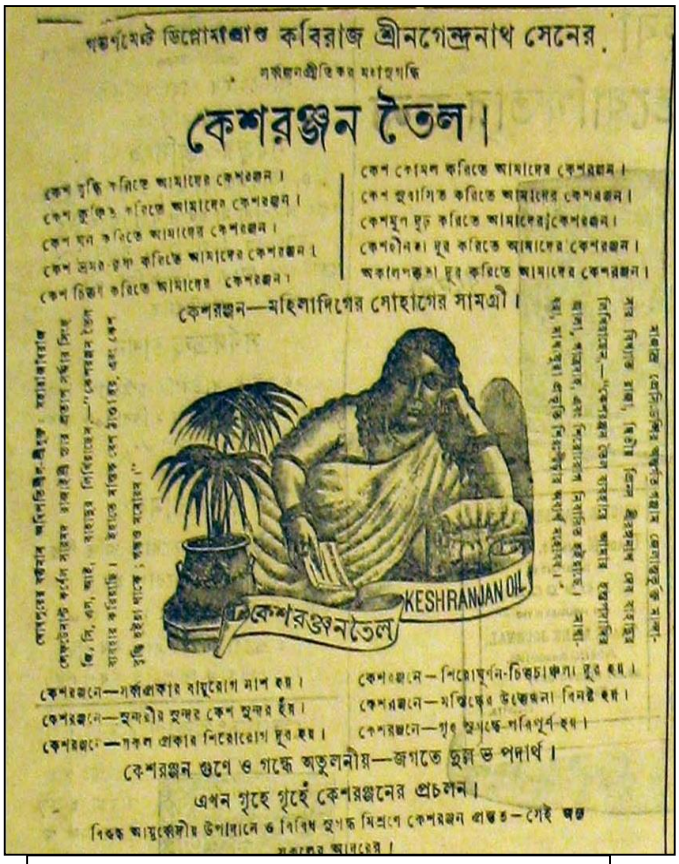
বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

গভর্ণমেন্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনের সর্ব্বজন প্রীতিকর মহাসুগন্ধি কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ কুঞ্চিত করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ ঘন করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ ভ্রমর কৃষ্ণ করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ চিত্তন করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ কোমল করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ সুবাসিত করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশ দৃঢ় করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশহীনতা দূর করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। অকালপক্কতা দূর করিতে আমাদের কেশরঞ্জন। কেশরঞ্জন-মহিলাদিগের সোহাগের সামগ্রী।

কেশরঞ্জনে- সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নাশ হয়।

কেশরঞ্জনে- সুনারীর সুন্দর কেশ সুন্দরহ য়।



চিত্র ৪.১: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জনে- সকল প্রকার শিরোরোগ দূর হয়।

কেশরঞ্জনে- শিরোঘূর্ণন-চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়।

কেশরঞ্জনে- মস্তিষ্কের উত্তেজনা বিনষ্ট হয়।

কেশরঞ্জনে- গৃহ সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

কেশরঞ্জন গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়- জগতে দুল্লভ পদার্থ। এখন গৃহে গৃহে কেশরঞ্জনের প্রচলন। বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদানে ও বিবিধ সুগন্ধ মিশ্রণে কেশরঞ্জন প্রস্তুত- সেই জন্য সকলের আদরের।'[১০৯]



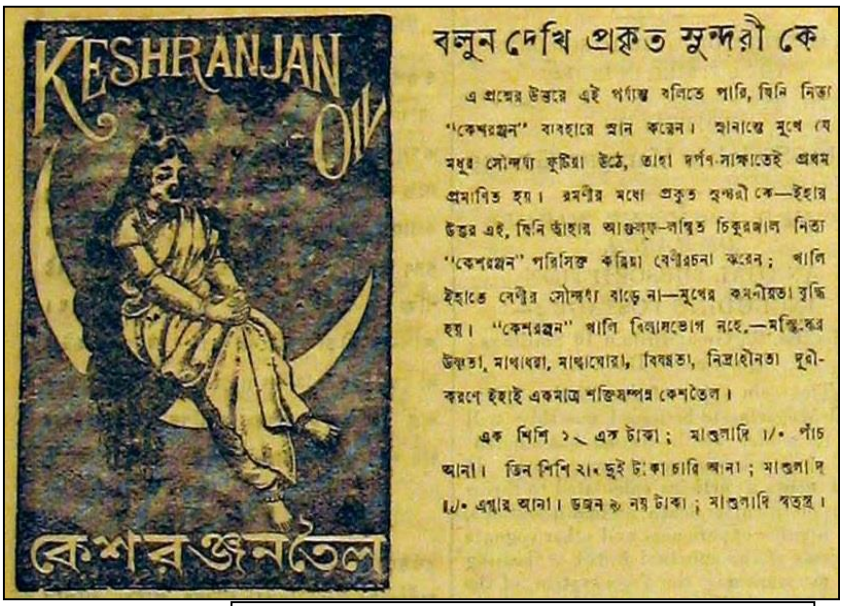
চিত্র ৪.২: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় লম্বা কেশধারী এক নারী অর্ধচন্দ্রের উপর বসে আছেন যার হস্তদ্বয় পায়ের উপর সুন্দরভাবে স্থাপিত। নারীটির পড়নে চিকন সুতার শাড়ী এবং হাতে চুড়ি ও গলায় গহনা পরিহিত। মনে হচ্ছে নারীটি কেশরঞ্জন ব্যবহার করে অনেক খুশি এবং তৃপ্ত। চিত্রটি[১১০] নিম্নরূপ–

উপর্যুক্ত চিত্রটি ব্যবহার করে বিবরণে খানিকটা ভিন্নতা আনয়ন করে কর্তৃপক্ষ। যা প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৬ বৈশাখ সংখ্যায়।
বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'বলুন দেখি প্রকৃত সুন্দরী কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য কেশরঞ্জন ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মূখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে- ইহার উত্তর এই, যিনি তাহার আগুলফ লম্বিত চিকুরজাল নিত্য 'কেশরঞ্জন' পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন; খালি ইহাতে বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে না- মুখের কমনীয়তা বৃদ্ধি হয়।



চিত্র ৪.৩: কেশরঞ্জন তৈল

[১০৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৮।
[১১০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৮ চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৮।

'কেশরঞ্জন' খালি বিলাষভোগ নহে, -মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষন্নতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল।

এক শিশি ১ টাকা, মাশুলাদি পাঁচ আনা।

তিন শিশি ২ টাকা ৪ আনা, মাশুলাদি এগার আনা। ডজন ৯ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।[১১১]

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৮ ভাদ্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন সুকেশা সুন্দরী নারী মাথা খানিকটা বাঁকিয়ে আছে। তিনি সাধারণ জামা পরিহিত। বিজ্ঞাপনের বিবরণেও খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষণীয়, যাতে বলা হয়-

কেশরঞ্জন তৈল। লক্ষ কণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি!!

রাজা মহারাজা বলেন- কেশরঞ্জন তৈল কেশ-তৈলের সম্রাট। যেমন এক চন্দ্র জগতের তমোনাশ করে, তেমন একা কেশরঞ্জন নিজের ঔজ্জল্যে বিলাসীর চিত্তের অন্ধকার হরণ করে। সকলেরই মূখে একই কথা- মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মসৃণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে আর সর্ব্বোপরি মহাসুগন্ধে ইহাই অদ্বিতীয়।


কেশরঞ্জন তৈল

লক্ষকণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি !!

রাজা মহারাজা বলেন,—কেশরঞ্জন তৈল কেশ-তৈলের সম্রাট। যেমন এক চন্দ্র জগতের তমোনাশ করে, তেমন একা কেশরঞ্জন নিজের ঔজ্জল্যে বিলাসীর চিত্তের অন্ধকার হরণ করে। সকলেরই মুখে একই কথা - মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মসৃণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে আর সর্ব্বোপরি মহাসুগন্ধে ইহাই অদ্বিতীয়।

হাইকোর্টের জজেরা বলেন,- যাঁহারা দিবারাত্রি মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, যাঁহাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, কেশরঞ্জন তৈল তাঁহাদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। মানসিক পরিশ্রমজনিত দারুণ চিত্তাবসাদ ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে কেশরঞ্জন তৈল মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন।

বড় বড় ব্যারিষ্টারেরা বলেন'—কেশরঞ্জন মাথার

চিত্র ৪.৪: কেশরঞ্জন তৈল

হাইকোর্টের জাজেরা বলেন- যাঁহারা দিবারাত্রি মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, যাঁহাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, কেশরঞ্জন তৈল তাঁহাদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিত্তাবসাদ ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে কেশরঞ্জন তৈল মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন।[১১২]

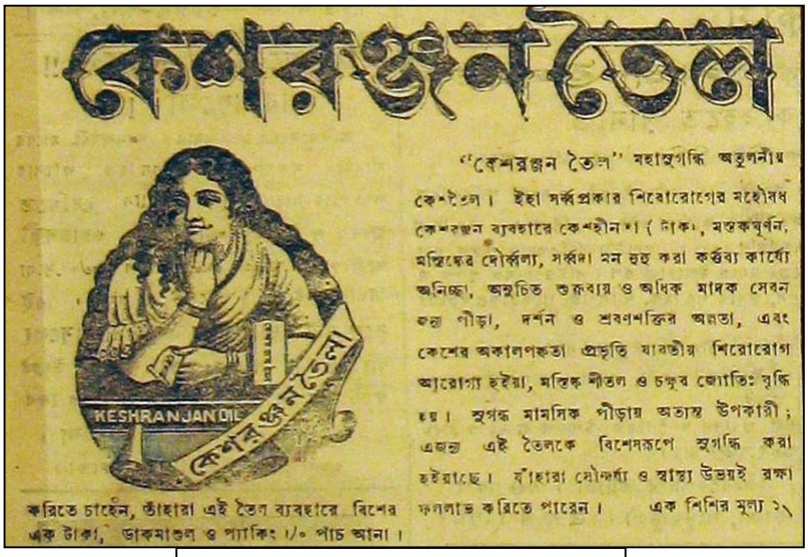
কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় সুকেশা একজন নারী ডান হাত দিয়ে থুতনি ধরে রেখে ভালো কোন কিছু ভেবে সুখানুভব করছেন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

কেশরঞ্জন তৈল।

'কেশরঞ্জন তৈল' মহাসুগন্ধি অতুলনীয় কেশ তৈল। ইহা সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের মহৌষধ। কেশরঞ্জন ব্যবহারে কেশহীনতা টাক, মস্তকঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, সর্বদা মন হু হু করা, কর্ত্তব্য কায্যে অনিচ্ছা, অনুচিত শুক্রব্যয়,

[১১১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৬ বৈশাখ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।
[১১২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৮ ভাদ্র ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।

অধিক মাদক সেবন জন্য পীড়া, দর্শন ও শ্রবণশক্তির অল্পতা এবং কেশের অকালপক্কতা প্রভৃতি যাবতীয় শিরোরোগে আরোগ্য, মস্তিষ্ক শীতল ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।[১১৩]



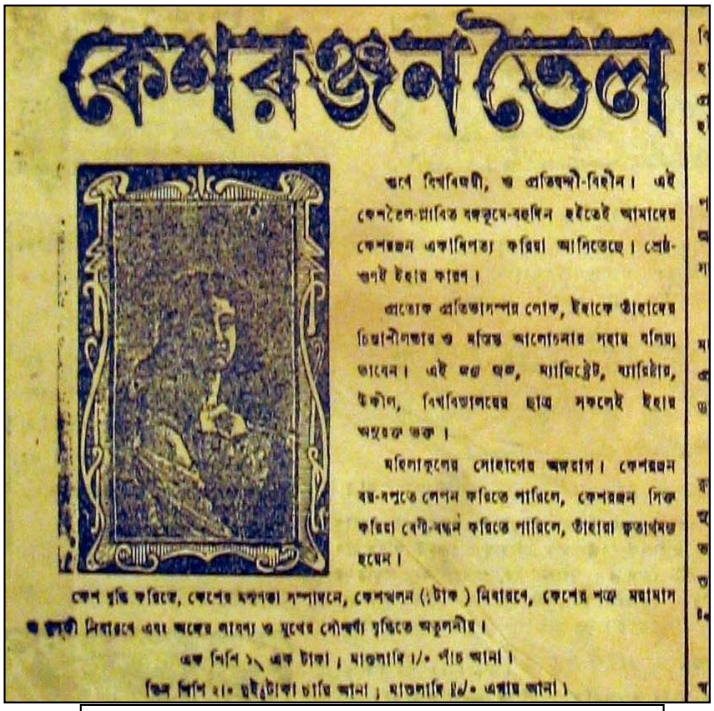
চিত্র ৪.৫: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় বর্ডার নকশা সমৃদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে সুকেশী একজন নারীর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

কেশরঞ্জন তৈল

গুণে বিশ্ববিজয়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন। কেশ তৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।[১১৪]



চিত্র ৪.৬: কেশরঞ্জন তৈল

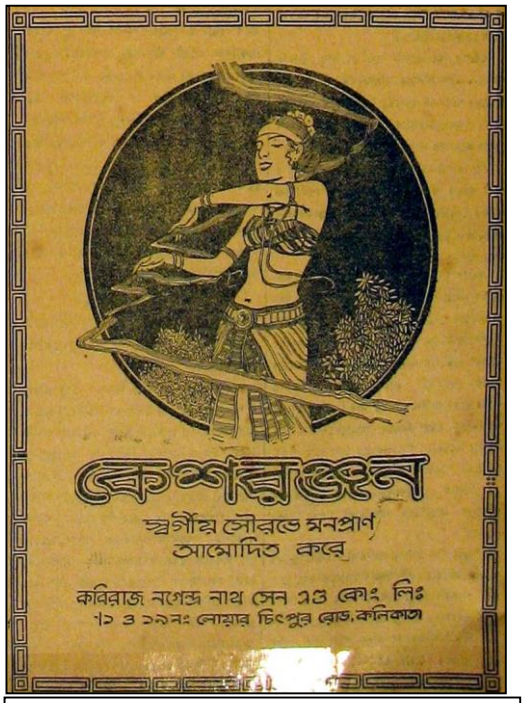
কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি ব্যতিক্রমি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় চিকন মিহি সূতার শাড়ী ও ভারী গহনায় আবৃত একজন নারী দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্ঞাপনের বিবরণ বেশি নয়, যাতে বলা হয়েছে-

[১১৩] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।
[১১৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।

আমাদের শারদীয়া সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। শারদীয়া শ্রেষ্ঠ উপহার।[১১৫]



চিত্র ৪.৭: কেশরঞ্জন তৈল



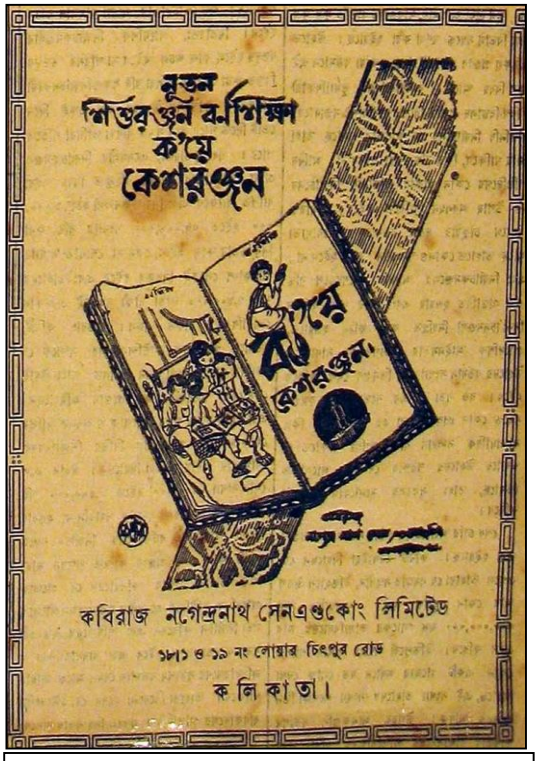
চিত্র ৪.৮: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ় সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একটি বর্ণ শিক্ষা বই যা খোলা অবস্থায় আছে। বইটির বাম পাশের পৃষ্ঠায় কয়েকজন বালক বালিকার ছবি রয়েছে এবং ডান পাশের পৃষ্ঠায় একজন বালকের চিত্র রয়েছে। ডান পাশের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 'ক' য়ে কেশরঞ্জন।

বিজ্ঞাপনটির বিবরণ নিম্নরূপ-

নতুন শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা

ক'য়ে কেশরঞ্জন।।[১১৬]

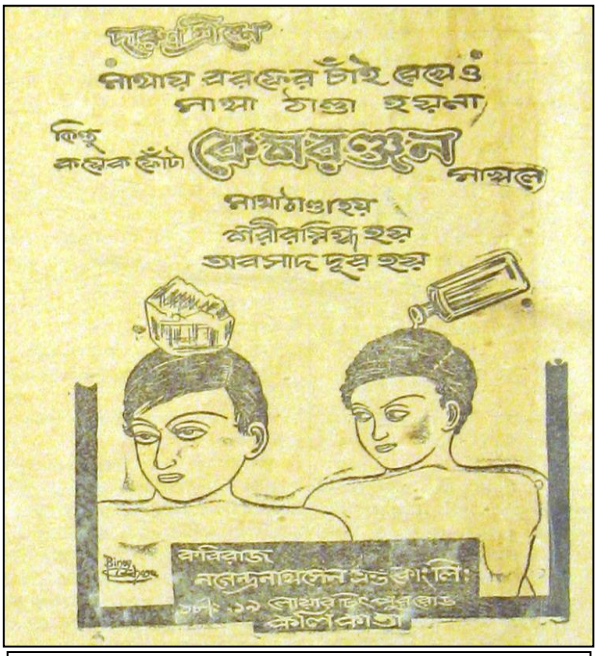


চিত্র ৪.৯: কেশরঞ্জন তৈল

[১১৫] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ ভাদ্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।
[১১৬] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১২ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি চমৎকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৫ শ্রাবণ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় স্বল্প পোশাকে আবৃত একজন নারী । যার সুদীঘল কালো কেশ রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

কেশরঞ্জন স্বর্গীয় সৌরভে মনপ্রাণ আমোদিত করে।[১১৭]



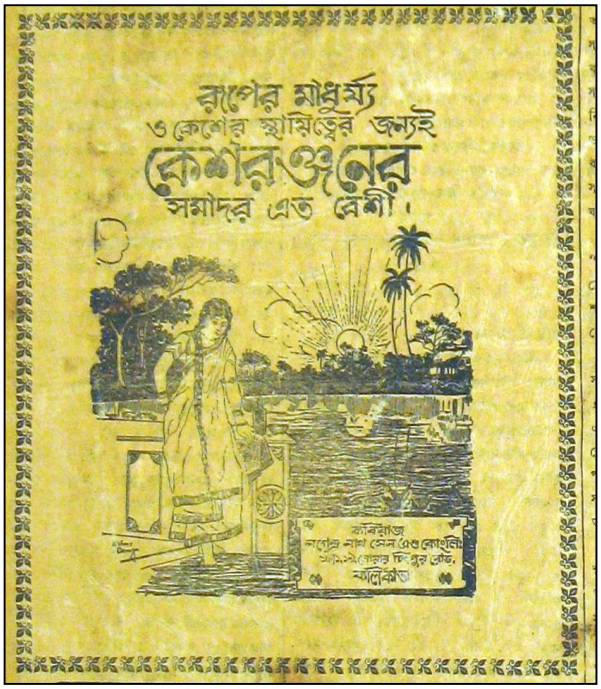
চিত্র ৪.১০: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি চমৎকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় দুজন নারী। একজন বরফ খণ্ড মাথায় রেখেছে এবং আরেকজন মাথায় তৈল জাতীয় কিছু ঢালছে। তৈল জাতীয় বলতে কেশরঞ্জন তৈলকে বুঝানো হচ্ছে তা নিশ্চিত। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'দারুণ গ্রীষ্মে মাথায় বরফের চাঁই রেখেও মাথা ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু কয়েক ফোঁটা কেশরঞ্জন মাখলে মাথা ঠাণ্ডা হয়। শরীর স্নিগ্ধ হয়। অবসাদ দূর হয়।[১১৮]

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একটি গ্রামীণ দৃশ্যে লম্বা কেশওয়ালা একজন নারী পুকুর পাড়ে বসে এক পা পানি নিমজ্জিত করেছে। দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে যার পিছন দিক হতে সূর্য উদীয়মান। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'রূপের মাধুর্য্য ও কেশের স্থায়ীত্বের জন্যই কেশরঞ্জনের সমাদর এত বেশী।'[১১৯]

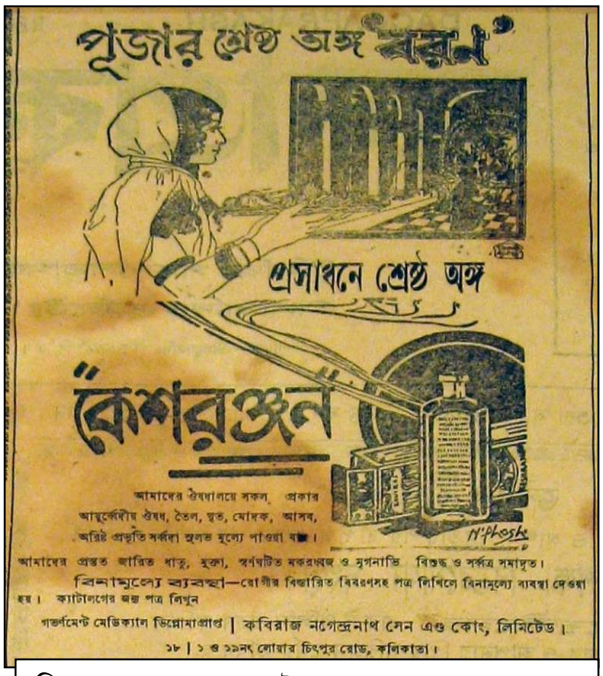


চিত্র ৪.১১: কেশরঞ্জন তৈল

[১১৭] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।
[১১৮] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৩ বৈশাখ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৮।
[১১৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ চৈত্র ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৩।

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি ব্যতিক্রমী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৩ আশ্বিন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন নারী পূঁজা অর্চনা করছেন। নিচে কেশরঞ্জন তৈলের বোতল ও প্যাকেট রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

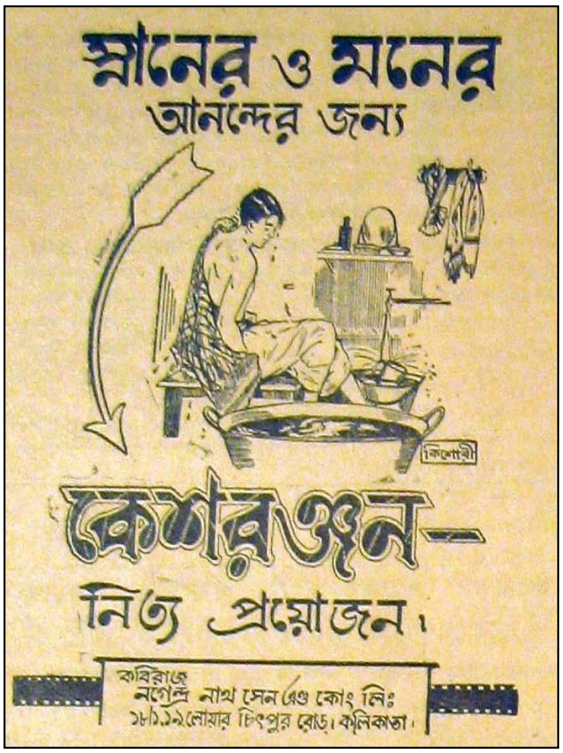
'পূঁজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'বরণ'- প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।[১২০]



চিত্র ৪.১২: কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একজন পুরুষ স্নানরত। কক্ষে স্নান সামগ্রী সাজানো গোছানো রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'স্নানের ও মনের আনন্দের জন্য কেশরঞ্জন নিত্য প্রয়োজন।'[১২১]



চিত্র ৪.১৩: কেশরঞ্জন তৈল

[১২০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ আশ্বিন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.০২।
[১২১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ চৈত্র ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০২।

পি.এম বাকচির সুবাসিনী তৈলের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে মোট তিনজন দেবীর চিত্র দেখা যায়। সমগ্র চিত্রে ফুল ও লতাপাতার সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে ইন্‌ক কন্ট্রাক্টর

পি.এম বাকচির সুবাসিনী তৈল, কালী অটডিরোজ ওষধাদি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদি।

দর্জি পাড়া কেমিকেল ওয়ার্কস।

৫/১ কৈলাস দাসের লেন, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[১২২]



চিত্র ৪.১৪: সুবাসিনী তৈল

শ্রী অখিলচন্দ্র শীল কর্তৃক আবিষ্কৃত জলপাই তৈল হতে 'চম্পক কুসুম' তৈলের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে নানা রকম ছোট বড় ফুলের সমারোহ দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'চম্পক কুসুম তৈল।

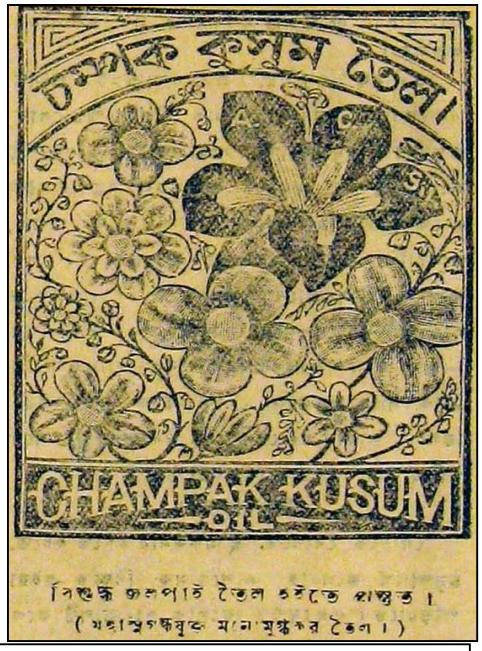
বিশুদ্ধ জলপাই তৈল হইতে প্রস্তুত। (মহাসুগন্ধিযুক্ত মনোমুগ্ধকর তৈল।)

এই তৈল ব্যবহার করিলে চুলের ড়োড়া শক্ত হয়, অকালে চুল পাকে না, মাথা শীতল হয়, হাত পা ও শরীরের জালা নিবারণ হয়, মন প্রফুল্ল থাকে, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়, মাথার মগজ বৃদ্দি করে, চুল খুব কাল হয়। শরীরের রং পরিষ্কার হইয়া চেহারা গোলাপ ফুলের ন্যায় হয়।

এই তৈল একবার মাখিলে ৩০ ঘন্টা কাল পর্য্যন্ত দেহে সুগন্ধ থাকিবে।

ঠিকানা- শ্রী অখিলচন্দ্র শীল। ১৩৬ নং আপার চিৎপুর রোড, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।[১২৩]

[১২২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৮।
[১২৩] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৮।



চিত্র ৪.১৫: চম্পক কুসুম তৈল

নারীর চুলের যত্নের প্রসাধনী ছাড়াও শরীর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করতে সাবান দিয়ে গোসল করা একান্ত আবশ্যক। সাবান হিসেবে লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপন উনিশ শতকে সাপ্তাহিক *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশ হলেও চিত্রের ব্যবহার অনেক পরে দেখা যায়। লাক্স সাবানের তৈরিকারক কোম্পানীর নাম- লিভার ব্রাদার্স কোম্পানী যা বর্তমানে ইউনিলিভার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

লাক্স সাবানের একটি চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৫ আষাঢ় সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে একজন নারী ও লাক্স সাবানের প্যাকেট দেখা যায়। নারীর মুখে প্রশান্তির হাসি বিদ্যমান। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

সুখপ্রদ সুগন্ধযুক্ত লাক্স টয়লেট সাবান মাখিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে অতি সহজেই আপনার বর্ণশ্রী অনুপম কান্তি ধারণে করিয়াছে। সিনেমার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীবর্গের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক সাবান।

Claudett Colbert এর অভিমত শুনুন। হলিউড ও ইংলণ্ডের ৮৫৭ জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে ৮৪৬ জনই তাহাদের অনুপম দেহকান্তি রক্ষা করিবার জন্য লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন। সকল কর্ত্তৃপক্ষই তাহাদের সুবৃহৎ ষ্টুডিওতে এই সাবান ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। লাক্স টয়লেট সাবানের কোমল ও স্ফূর্তিদায়ক ফেনা শরীরে ও লোমকূপে সঞ্চিত সকল ময়লা সম্পূর্ণরূপে দূর করে এবং ত্বক কোমল ও উজ্জল করে। লাক্স টয়লেট সাবান আপনার প্রসাধনে ব্যবহার করুন এবং অন্যান্য রূপবাণীয় রূপরাণীদের ন্যায় আপনার লাবণ্যশ্রী রক্ষায় যত্নবান হউন।[১২৪]

[১২৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।



চিত্র ৪.১৬: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে একজন ছোট চুলের অধিকারী নারীকে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম।

ফিল্মে দেহ সৌষ্ঠবের সামান্য খুঁতও ধরা পড়ে। সুতরাং ছায়াচিত্রে অভিনেত্রীগণ নিজেদের অনুপম রূপলাবণ্য বজায় রাখার জন্য সর্ব্বদাই লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সর্ব্বদাই দেহচর্ম্ম মসৃণ ও সতেজ রাখে। আপনিও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

সুন্দরী রেণী এডোরী বলেন:- যৌবনশ্রী দেহ কান্তির উপরই সমধিক নির্ভর করে। এই সাদা সুগন্ধি সাবান দেহচর্ম্ম মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে। এজন্যই আমরা ইহার এত বেশী পক্ষপাতী।[১২৫]

[১২৫] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৫ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৫।



চিত্র ৪.১৭: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে একজন নারীকে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

হলিউডের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত।

সুন্দরী রূখ চেটারটন বলেন:- "আমি সর্ব্বদাই লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। ইহাতে দেহের চর্ম্ম ও কান্তি নিখুত থাকে।

সুন্দরী রমণীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আদৃত।

কিভাবে দেহের চর্ম্ম মসৃণ ও কমনীয়তা বজায় রাখা যায় তাহা ফিল্ম অভিনেত্রীগণের বিশেষ জানা আছে। কারণ দেহের সামান্য খুঁতও ক্যামেরাতে ধরা পড়ে। সে জন্যই বিখ্যাত ফিল্ম সে জন্যই বিখ্যাত ফিল্ম ষ্টুডিওগুলিতে

সৌন্দর্য্য প্রসাধনের জন্য লাক্স টয়লেট সাবান সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। আপনার দেহের চর্ম্মের প্রতিও তদ্রুপ যত্ন নিতে পারেন। ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহারের উপযোগী।[১২৬]



চিত্র ৪.১৮: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১ ফাল্গুন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে কালো পোষাক পরিহিত এক নারীকে দেখা যায় । বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

সৌন্দর্য্যই **রমণীগণের অমূল্য সম্পদ।**

সুন্দরী মেরী নোলেন বলেন:- কমনীয় দেহকান্তিই স্ত্রী লোকের আকর্ষনী শক্তির মূলে নিহিত। আমি সর্ব্বদাই লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করিয়া আসিতেছি; কারণ ইহা ব্যবহারে দেহচর্ম্ম কোমল এবং মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

ফিল্মের উপযোগী দেহের রং উজ্জ্বল রাখিতে সক্ষম।

[১২৬] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

হলিউডের বিখ্যাত সুন্দরীগণের অনুপম রূপ-লাবণ্য লাক্স টয়লেট সাবানের ব্যবহারের দ্বারাই সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছে। সুন্দরীগণ শরীরের রং ও আভা বজায় রাখিবার জন্য সকল সময়েই এই সাবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। দেহের চর্ম্ম সতেজ রং উজ্জ্বল রাখিবার জন্য আপনি লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন। ইহার গুণে এবং সুগন্ধে আপনি মুগ্ধ হইবেন।[১২৭]



চিত্র ৪.১৯: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৮ ফাল্গুন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে এক নারীকে দেখা যায় । বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

এই সাবান ব্যবহারে রূপলাবণ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রতিবারেই ফিল্মে আপনার প্রিয় অভিনেত্রীকে অধিকতর সুন্দর দেখিতে পান। ইহার কারণ জানেন কি? লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহারে দেহের কোমলতা ও সৌন্দর্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আপনিও পরীক্ষা করুন।

[১২৭] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৫।

সুন্দরী মেরিয়ানস্ মার্স বলেন:- দেহচর্ম্মের মসৃণতা রক্ষা করিতে লাক্স টয়লেট সাবানের সমকক্ষ আর নাই। আমি সর্ব্বদাই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকি।[১২৮]



চিত্র ৪.২০: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৩ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে এক নারীকে দেখা যায়। যা আগের বিজ্ঞাপনের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

এই রমণীর সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইবেন।

মনোমোহিনী রমণী Leila Hyama বলেন, আমি সর্ব্বদাই লাক্স টয়লেট সোপ ব্যবহার করি। ইহাতে আমার গায়ের চর্ম্ম অতি কোমল ও মসৃণ থাকে। তোমার প্রেয়সী কালো বা গৌরাঙ্গী হউন,- ছায়াচিত্রের সুন্দরীগণ এবং যেকোন স্ত্রীলোক ইহা স্বীকার করিতে পারেন না যে, সুন্দরচর্ম্মেই সৌন্দর্য্যে আরম্ভ হয়। [১২৯]

[১২৮] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।
[১২৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৩ চৈত্র ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।



চিত্র ৪.২১: লাক্স সাবান

লাক্স সাবানের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে এক নারীকে দেখা যায় যার মূখ প্রদর্শনে ভিন্নতা দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

Carole Lombard প্রকৃত সুন্দর চর্ম্ম লোভনীয় এবং চমপ্রদ চেহারা প্রদান করে। আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে, লাক্স টয়লেট সাবান চর্ম্ম কোমল এবং ফুলের পাপড়ির ন্যায় মসৃণ রাখে।[১৩০]

তৎকালে 'সানলাইট' নামে আরেকটি সাবানের ব্যবহার ও বিজ্ঞাপন প্রচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাবানটি কাপড় কাচা সাবান হিসেবেই বেশী সমাদৃত ছিল। সাবানটির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৯৩৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে কালো পোষাক পরিহিত এক নারীকে দেখা যায় যিনি সাবানের প্যাকেটের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

শুভ সংবাদ!

সানলাইট সাবানের দাম কমিল।

[১৩০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১ অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

এই সাবানে ব্যয় কম ও পরিশ্রমও কম- কিন্তু কাজ পাইবেন বেশী। ইহা দামে কমিল কিন্তু পূর্ব্ববৎ খাঁটী আছে। এই সাবানে কাপড় কাচিলে টেকসই হয় বেশী। অল্প পরিশ্রমে পরিষ্কারও হয় বেশী। সুতরাং কাচিতে হইবে কম। তবে আর বিলম্ব করেন কেন? কম দামের ও কম পরিশ্রমের সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করুন। দেরী করিবেন না। আপনার সমস্ত কাপড়েই এই সাবান ব্যবহার করিবেন অন্যথা হতাশ হইবেন।[১৩১]



চিত্র ৪.২২: সানলাইট সাবান

সানলাইট সাবানটি যে শুধু কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হত তা নয় যার প্রমাণ পাওয়া যায় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রথম চিত্রে দুজন মহিলা চা খেতে খেতে কথা বলছে এবং অন্য ছবিতে ঐ দুজন মহিলাই কিছুদিন পর ফল খেতে খেতে কথা বলছে এমন ভঙ্গিমা দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

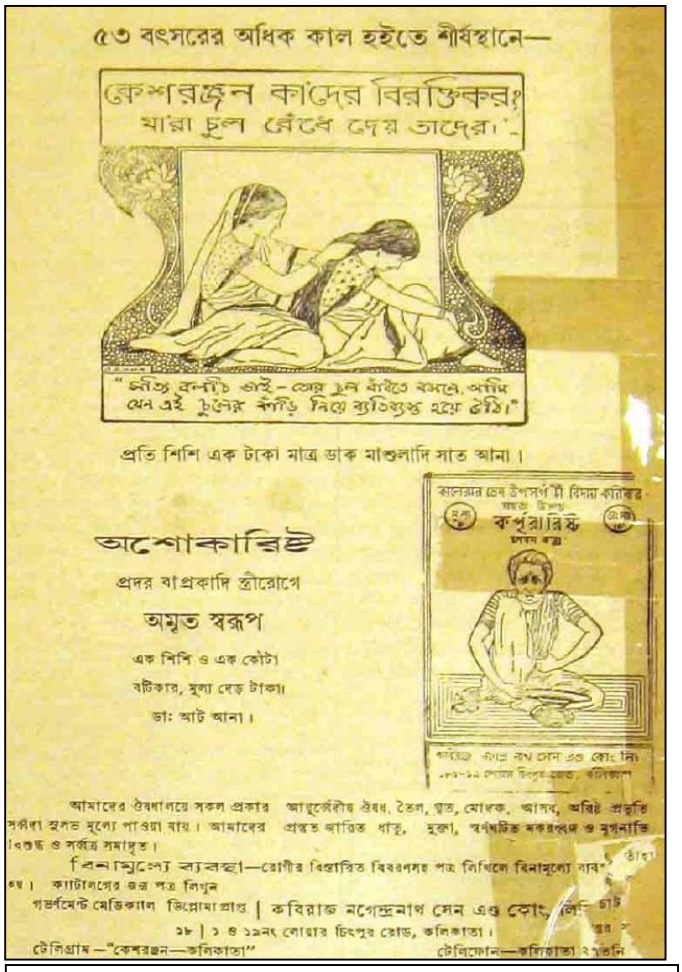
সাদা সূক্ষ্ম দামী বস্ত্রাদি এবং চকচকে পোষাকাদি রক্ষা করিবার নিয়ম।

'তোমার গৃহের সব জিনিসপত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে আমি প্রশংসা না করে থাকিতে পারি না। (আশ্চর্য্য হচ্ছি)।

'সানলাইট' সাবানে সব জিনিষ ধৌত করি বলিয়াই এরূপ হয়। আমি আমার ধোপাকেও ইহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি। সাধারণ কাপড়ও দামীনস।[১৩২]

[১৩১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৩ ডিসেম্বর ১৩৪১, পৃ.০৮।
[১৩২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রূপচর্চা বা প্রসাধনীর পন্যের ব্যবহার যেমন বাড়তে থাকে তেমনি চিত্তাকর্ষক চিত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রসাধনীর মধ্যে চুলের তৈলের বিজ্ঞাপন প্রায়শই দেখা যেত। *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৯৩৯ সালের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং. লিমিটেড এর 'কেশরঞ্জন' তেলের বিজ্ঞাপন প্রণিধানযোগ্য।বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় শাড়ি পরিহিত দুইজন মহিলার ছবি। একজন বয়স্ক মহিলা অন্যজন অল্প বয়সী এক রমণীর চুল বেঁধে দিচ্ছে। সম্ভবত বয়স্ক মহিলার নাতি। অল্প বয়স্ক রমণীটি দুই পা ভাঁজ করে হাটুর নিচে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। দৃশ্যটির ডানে ও বামের বর্ডার নকশা চমৎকার যার মধ্যখানে দুইটি গোলাপ ফুল বর্ডারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। চিত্রটির উপরে লিখিত আছে- **কেশরঞ্জন কাদের বিরক্তিকর? যারা চুল বেঁধে দেয় তাদের।** আর নিম্নাংশে লিখিত আছে- **সত্যি বলছি ভাই-তোর চুল বাঁধতে বসলে আমি যেন এই চুলের কাঁড়ি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি।** এর নিচে মূল্য হিসেবে উল্লেখ আছে- প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র মাশুলাদি সাত আনা।[১৩৩] বিজ্ঞাপনটির নিচের দিকে প্রস্তুতকারক কোম্পানী হিসেবে কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং. লিমিটেড এর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ আছে।



চিত্র- ৪.২৩ : কেশরঞ্জন তেলের বিজ্ঞাপন

[১৩৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২রা এপ্রিল ১৯৩৯, পৃ. ০৩।

মেয়েদের প্রসাধনীর মধ্যে চুল লম্বা করা, চুল পড়ে যাওয়া রোধ করার তৈল বা প্রসাধনী, সাবান বিজ্ঞাপনের বিশেষ জায়গা দখল করে ছিল। *The Bengal Times*পত্রিকার ১৯০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়প্রকাশিতবিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায়- একজন রমণী চিরণী দিয়ে তার কালো কেশ আঁচড়াচ্ছেন। নিজের চুল নিয়ে যে তিনি সন্তুষ্ট তা তার মূখের অভিব্যক্তিতে প্রতিভাত।'Make Your Hair Grow'শিরোনামের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

Make Your Hair Grow with warm shampoos of CUTICURA SOAP and light dressings of Cuticura, purest of emollient skin. This treatment at once stop falling hair, remove crusts, scales and dandruff, soothes irritated, itching surfaces, stimulates the hair follicles, supplies the roots with energy and nourishment, and makes the hair grow when all else fails.[১৩৪]



চিত্র- ৪.২৪ : কিউটিক্যুরা সাবানের বিজ্ঞাপন

[১৩৪]*The Bengal Times*, 17 February 1900; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৩২।

১৯০৪ সালের জুলাই মাসের ২৭ তারিখে*The Bengal Times* সংখ্যায় একটি চমকপ্রদ ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়বস্তু হলো শ্যাম্পু জাতীয় লিক্যুইড সাবান। বিজ্ঞাপনটি চমকপ্রদ এই কারণে যে, এটিতে একজন মানুষের লম্বা দুইটি হাত দেখানো হয়েছে তবে কোন মূখমণ্ডলের ছবি নেই। লম্বা হাত দুইটির মধ্যে একটি ডানহাত ও আরেকটি বামহাত। হাত দুইটি নির্দেশক হাত বললেও ভুল হবে না। দেখে মনে হবে যে, দুই হাত দ্বারা একটি বিজ্ঞাপনের পোস্টার উচুতে ধরে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটিতে ইংরেজিতে লিখিত আছে-

TRY IT IN YOUR BATH.

SCRUBB'SAMMONIAcloudy fluid.

MARVELLOUS PREPARATION.

Refreshing as a Turkish Bath.

Invaluable for all Toilet Purposses.

Splendid Cleansing Preparation for the Hair.

Removes Stains and Grease Spots from Clothing,etc.

Restores the Colour to Carpets.

Allays the irritation caused by Mosqito Bites.

Invigorating in Hot Climates. Cleans Plate and Jewellery.

or sale by all Grocers and Chemists

SCRUBB & Co. Ltd, Guilford St. London, S.E.[135]

[১৩৫]*The Bengal Times,* 27 July 1904; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র,* ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৪৯।



চিত্র- ৪.২৫ : ক্রাব্‌স অ্যামোনিয়ার বিজ্ঞাপন

১৯০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত CUTICURA সাবানের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে দুটি হাতের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। হাত দুটির একটি ডান হাত অন্যটি বাম হাত। কোন হাতেরই বৃদ্ধাঙ্গুল দেখা যাচ্ছে না। চিত্রে হাতের আঙ্গুলের পাশ বোঝাতে ফোঁটা ফোঁটা এবং ডোরা কাটা নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও চিত্রটিতে কালো রঙের পশ্চাদপট (Background) ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রের কালো রঙের পশ্চাদপটে হাতের চিত্রের পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে- SOFT WHITE HANDS IN ONE NIGHT. Produced by **CUTICURA SOAP**. One Night Treatment for Sore

Hands.[১৩৬]এই বিজ্ঞাপন চিত্রটিবড় হাতের ইংরেজি লেখাগুলো দেখেই মনে হবে যে, একমাত্র কিওটিক্যুরা সাবানই পারে এরকম নরম ও কোমল হাত উপহার দিতে। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চাদপট (Background) এর ব্যবহার সাধারণত বিজ্ঞাপন চিত্রে খুব কমই দেখা যায়।



চিত্র- ৪.২৬ : কিউটিক্যুরা সাবানএর বিজ্ঞাপন

CUTICURA সাবানের আরেকটি চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপন১৯০০ সালের ২০ জানুয়ারী *The Bengal Times*পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।প্রকাশিত চিত্রে দেখা যায় একজন স্কার্ট পরিহিত নারী গলফ খেলছেন এবং দূরে ভেড়া জাতীয় পশু চারণভূমিতে বিচরণ করছে। নারীর চিত্রটি গলফ বলটি হিট করার পূর্ব মূহুর্তের সময়কার। চিত্রটিতে নাটকীয়তা ভরপূর। নারীর চিত্রটি শারিরীক অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বলটিতে আঘাত করবেন। চিত্রটিতে পশ্চাদপট (Background) হিসেবে তৃণজাতীয় লতাগুল্ম বুঝাতে ছোট ছোট রেখার অবতারণা চমৎকার হয়েছে। চিত্রটির ডান পাশে Golf Rash শিরোনামে এই খেলা থেকে সৃষ্ট সকল প্রকার জীবানু থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে কিওটিক্যুরা সাবানের গুণাগুণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়াও Save Your Hair,

[১৩৬]*The Bengal Times,* 3 February 1900; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৫০।

Save Your Handsশিরোনামে কিওটিক্যুরা সাবানের কার্যকারিতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। কিওটিক্যুরা সাবান সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা আছে-

.....CUTICURA Saop the most effective skin purifying soap in the world, as well as purest and sweetest for toilet, bath, and nursery, when followed bygentle (unclear)with CUTICURA, the greatskin cure and purest of emollients, is most cleansing, cooling, purifying, and refreshing. [১৩৭]



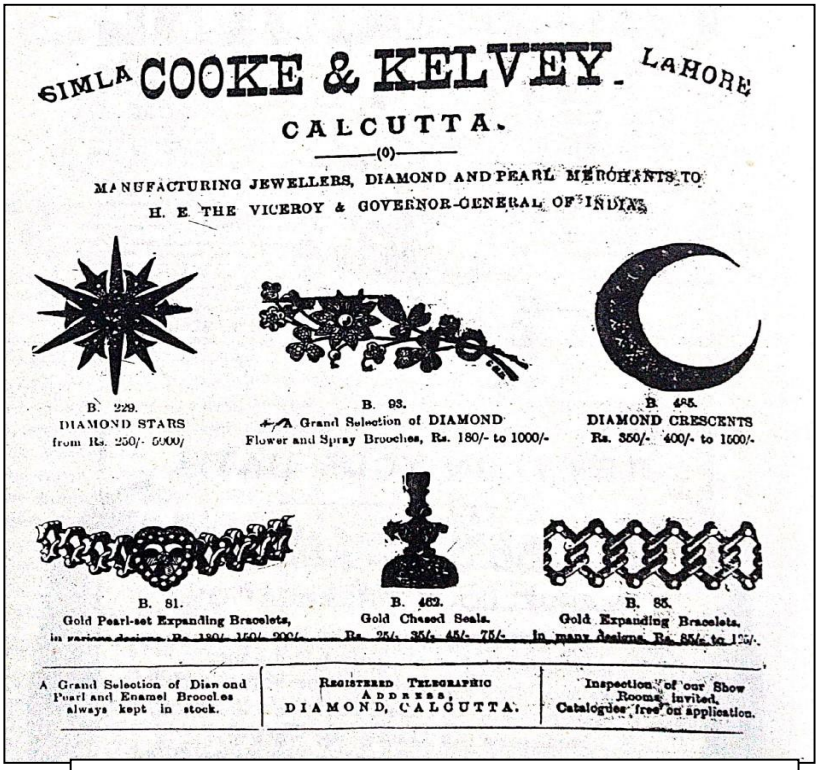
চিত্র- ৪.২৭ : কিউটিক্যুরা সাবান এর বিজ্ঞাপন

[১৩৭]*The Bengal Times*, 20 January 1900; মুনতাসীর মামুন, *ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪২৯।

৫. জুয়েলারি বা গহনা সংক্রান্ত

উনিশ শতকের পূর্ব বঙ্গের একটি বৃহত্তম নগরী হিসেবে ঢাকায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে তা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়। নারীদের ব্যবহৃত অলংকার সামগ্রীতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে সময়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনেও গহনা সামগ্রীর চিত্র সংযোজিত হতে দেখা যায়। সাপ্তাহিক *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকার যে সমস্ত বিজ্ঞাপনে গহনা সংক্রান্ত চিত্র ছাপা হয়েছে সেগুলোর বিবরণ ও চিত্রের বর্ণনা নিম্নে বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো-

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে *The Bengal Times* সংখ্যায় একটি জুয়েলারীর বিজ্ঞাপনে চিত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। যা বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিজ্ঞাপনটি বিখ্যাত জুয়েলারী নির্মাতা প্রতিষ্ঠানCOOKE & KELVEY কোম্পানীর। বিজ্ঞাপনের লেখা দেখে বুঝা যায় এটির তিনটি শাখা রয়েছে যেগুলো হলো- কোলকাতা, শিমলা ও লাহোর।বিজ্ঞাপনে তিনটি ডায়মণ্ড এবং তিনটি স্বর্ণ এর ডিজাইন এবং মূল্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ডায়মণ্ড তিনটি হলো- 1. Diamond STARS, 2. Diamond Flower and Spray Brooclies& 3.Diamond Crescentsএবংস্বর্ণ তিনটির ডিজাইন হলো-1.Gold Pearl-set Expanding Bracelets, 2. Gold Chesed Seals & 3. Gold Expanding Bracelets.[138]এই জুয়েলারী গহনাগুলোর ডিজাইন দেখতে অনেক সুন্দর মনে হয়।



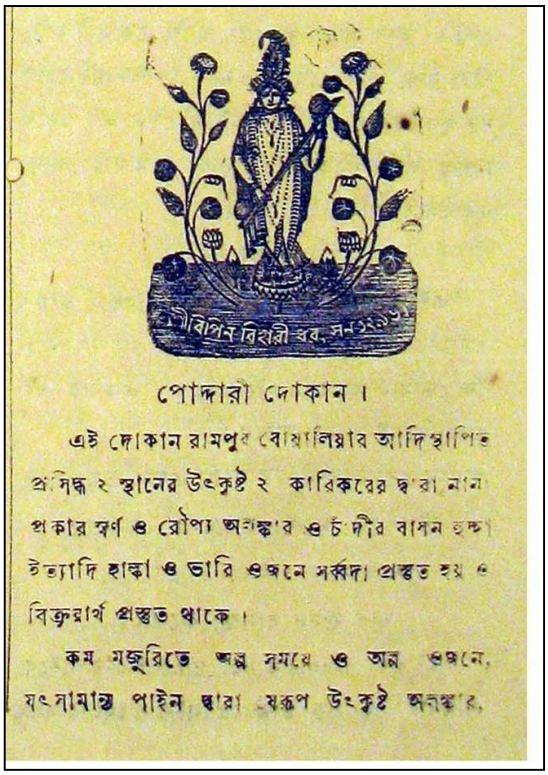
চিত্র- ৫.১ : নূতন ডিজাইনের অলংকার

[১৩৮]*The Bengal Times,* 12 October 1904; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৪৫০।

বিপিন বিহারী ধর কর্তৃক উদ্ভাবিত'পোদ্দারী দোকান' নামক একটি পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৮৮৯ সনের ২৪ নভেম্বর সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় দেবীরূপী এক নারীর ছবি যার দুইপাশে লতাপাতা বিশিষ্ট ফুলের গাছ রয়েছে। ফুলগুলো দেখে শাপলা কিংবা পদ্ম ফুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাতা শাপলা কিংবা পদ্ম ফুলের মত নয়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

পোদ্দারী দোকান।

এই দোকান রামপুর বোয়ালিয়ার আদি স্থাপিত প্রসিদ্ধ ২ স্থানের উৎকৃষ্ট ২ কারিকরের দ্বারা নানা প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার ও চাঁদীর বাসন হুক্কা ইত্যাদি হাল্কা ও ভারি ওজনে সর্ব্বদা প্রস্তুত হয় ও বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কম মজুরিতে অল্প সময়ে ও অল্প ওজনে যৎসামান্য পাইন দ্বারা যেরূপ উৎকৃষ্ট অলংকার.....।[১৩৯]



চিত্র- ৫.২ : পোদ্দারী দোকান

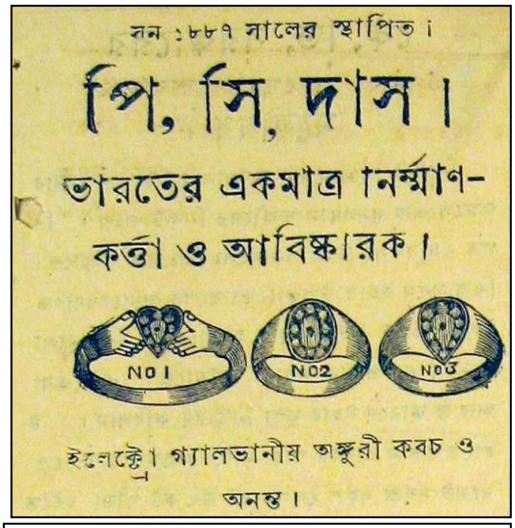
পি. সি. দাস কোম্পানীর 'ইলেক্ট্রো কেমিকেল সোনার অঙ্গুরী ও বোতাম' পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৭ ফালগুণ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে মোট ৬ টি নকশার অঙ্গুরী বা অনন্তের ছবি দেখা যায়।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়- সন ১৮৮৭ সালের স্থাপিত। **পি. সি দাস।**

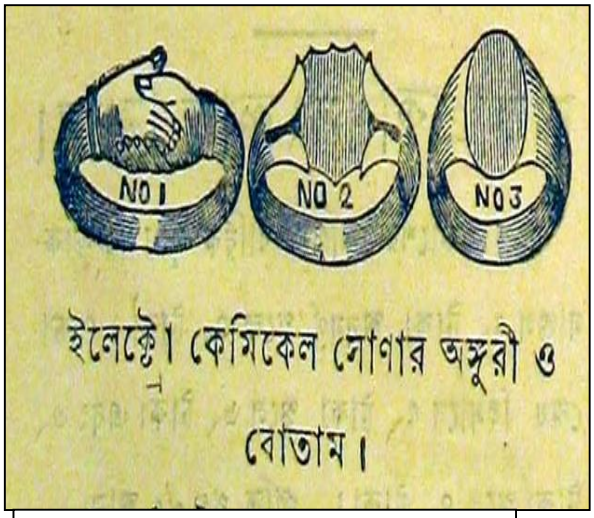
ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

[১৩৯] ঢাকাপ্রকাশ, ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রি., পৃ.০১।

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।[১৪০]

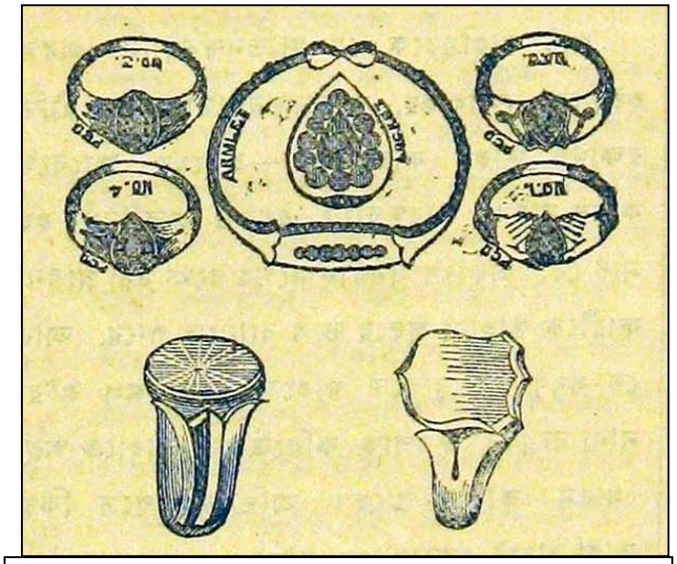


চিত্র- ৫.৩ : ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গরী



চিত্র- ৫.৪ : ইলেক্ট্রো কেমিকেল অঙ্গুরী

উপর্যুক্ত পি. সি দাস এর আরো কিছু গহণা তথা অঙ্গুরী বা অনন্তের ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২০ চৈত্র সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনে মোট ৮টি নকশার আংটি বা অঙ্গুরীর ছবি সংযোজিত হয়েছে। সবগুলোই নূতন নূতন নকশা বিশিষ্ট যা ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করবে বলেই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস।



চিত্র- ৫.৫ : পিসি দাসের অঙ্গুরী

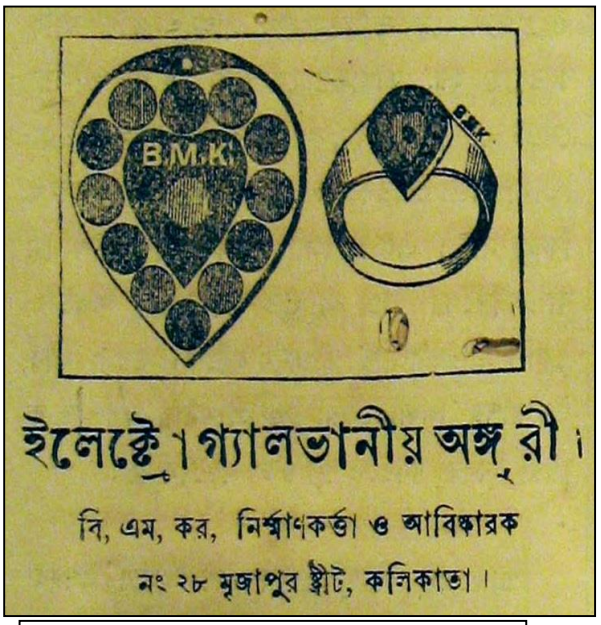
বি এম. কর কর্তৃক নির্মিত 'ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গুরী' নামক আরেকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় ইংরেজিতে B.M.K. খোদিত একটি অঙ্গুরীর অনেকটা পানপাতার মত নকশার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

[১৪০] ঢাকাপ্রকাশ, ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রি., পৃ.০১।

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গুরী।

বি. এম. কর, নির্ম্মাতাও আবিষ্কারক

নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[১৪১]



চিত্র- ৫.৬ : নূতন ডিজাইনের অলংকার

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত 'অষ্টধাতু অনন্ত' নামক আরেকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৯ পৌষ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি অষ্টধাতুর অনন্ত এর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। অষ্টধাতুর সবগুলোর নামের আদ্য অক্ষর সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধাতুগুলো হলো- স্ব=স্বর্ণ, রৌ=রৌপ্য, তা=তামা, দ=দস্তা, রা= রাং, সী= সীসা, লৌ= লৌহ ও পা= পারদ। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

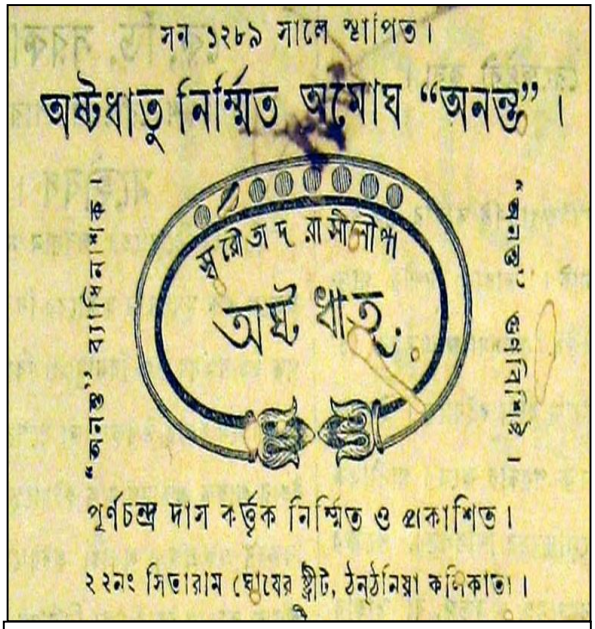
সন ১২৮৯ সালে স্থাপিত।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ অনন্ত।

অনন্ত ব্যাধিনাশক। অনন্ত গুণবিশিষ্ট।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

২২ নং সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।[১৪২]



চিত্র- ৫.৭ : অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ অনন্ত

[১৪১] ঢাকাপ্রকাশ, ১লা অগ্রহায়ন ১২৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০১।
[১৪২] ঢাকাপ্রকাশ, ২৯ পৌষ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১০।

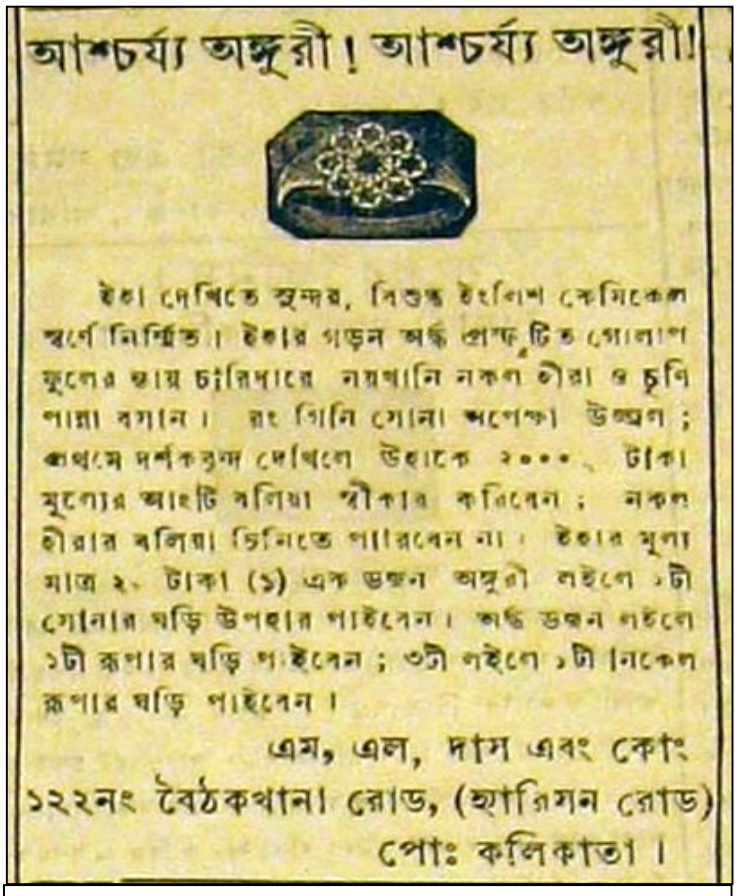
এম এল দাস এণ্ড কোং এর 'আশ্চর্য্য অঙ্গুরী' নামক আরেকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ আষাঢ় সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি সুন্দুর ফুলেল নকশা বিশিষ্ট অঙ্গুরীর চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

আশ্চর্য্য অঙ্গুরী! আশ্চর্য্য অঙ্গুরী!

ইহা দেখিতে সুন্দর, বিশুদ্ধ ইংলিশ কেমিকেল স্বর্নে নির্ম্মিত। ইহার গড়ন অর্দ্ধ প্রস্ফূটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় চারিধারে নয়খানি নকল হীরা ও চূণি পান্না বসান। রং গিনি সোনা অপেক্ষা উজ্জ্বল; প্রথমে দর্শকবৃন্দ দেখিলে উহাকে ২০০০ টাকা মূল্যের আংটি বলিয়া স্বীকার করিবেন। নকল হীরার বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ইহার মূল্য মাত্র ২ টাকা। একডজন অঙ্গুরী লইলে ১টা সোনার ঘড়ি উপহার পাইবেন; ৩টা লইলে ১টী নিকেল রূপার ঘড়ি পাইবেন।

এমএল দাস এবং কোং

১২২ নং বৈঠকখানা রোড, (হ্যারিসন রোড), পোঃ কলিকাতা। [১৪৩]


আশ্চর্য্য অঙ্গুরী! আশ্চর্য্য অঙ্গুরী!

ইহা দেখিতে সুন্দর, বিশুদ্ধ ইংলিশ কেমিকেল স্বর্ণে নির্ম্মিত। ইহার গড়ন অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় চারিধারে নয়খানি নকল হীরা ও চূণি পান্না বসান। রং গিনি সোনা অপেক্ষা উজ্জ্বল; প্রথমে দর্শকবৃন্দ দেখিলে উহাকে ২০০০ টাকা মূল্যের আংটি বলিয়া স্বীকার করিবেন; নকল হীরার বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ইহার মূল্য মাত্র ২৲ টাকা (১) এক ডজন অঙ্গুরী লইলে ১টী সোনার ঘড়ি উপহার পাইবেন। অর্দ্ধ ডজন লইলে ১টী রূপার ঘড়ি পাইবেন; ৩টী লইলে ১টী নিকেল রূপার ঘড়ি পাইবেন।

এম, এল, দাস এবং কোং
১২২নং বৈঠকখানা রোড, (হ্যারিসন রোড)
পোঃ কলিকাতা।

চিত্র- ৫.৮ : এম এল দাসের আশ্চর্য্য অঙ্গুরী

[১৪৩] ঢাকাপ্রকাশ, ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

৬. গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত

উনিশ শতকে পূর্ব বাংলা বিশেষ করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকীগুলোতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কবি, লেখক, ঔপন্যাসিক প্রমূখদের মূদ্রিত গ্রন্থাদি যেমন প্রচারিত হতো তেমনিভাবে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রচারিত বা প্রচারিতব্য পত্রিকাদি প্রকাশনার বিষয়টিও ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হতো। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় নূতন প্রচারিতব্য 'আরতী ভাণ্ডার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়-

> **আরতী ভাণ্ডার**
>
> উক্তনামে একখানী ৮ ফর্মা সাময়িকপত্র আমাদিগের যত্নে আগামী মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উহাতে বঙ্গ সাহিত্য সংসারের নানা বিষয় লিখিত হইবে। মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার আট আনা। ছয় খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেক খণ্ডে তিন আনা।
>
> শ্রী কালিদাস মিত্র ও শ্রী হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ম্যানেজার।[১৪৪]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এরকম আরেকটি প্রচারিতব্য পত্রিকার আগাম ঘোষণা দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> আমি ভবিষ্যতে আমা হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রচরণ কার্য্য দর্শন করিতেছি। একশত জন গ্রাহকের পত্র পাইলে তাহা প্রচারণ করিব। মূল্য মাসিক ডাক মাসুলসহ তিন আনা পত্রের আয়তন ৮ পেঁজি ফর্মার এক ফর্মা।
>
> -মাসিকপত্র, সম্পাদক। [১৪৫]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এরকম আরেকটি *সংবাদসার* নামে প্রচারিতব্য পত্রিকার আগাম ঘোষণা দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংবাদসার নামে একখানি অভিনব মাসিক পত্রিকা প্রতিমাসে যথানিয়মে গদ্য পদ্য রচিত বিবিধ হিতকর প্রবন্ধে পুরিত হইয়া প্রকাশিত হইবেক। ইহার

---

[১৪৪]*ঢাকা প্রকাশ*, ৯ নভেম্বর ১৮৬৯;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৩৪।

[১৪৫]*ঢাকা প্রকাশ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৩৪।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, মাসিক চারি আনা ডাক মাসুল ||0 আনা মাত্র নির্ধারিত হইল। যে কোন মহাশয় ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষ করিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দূর্গাচরণ মিত্রের ইষ্ট্রিট ৮ নম্বর দাওয়াল গলিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীরেক পত্র লিখিবেন। - সম্পাদক। [১৪৬]

সাপ্তাহিক 'বঙ্গবন্ধু'পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হওয়ার ঘোষণাটিও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ৪ আগস্ট ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়-

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু ও মুদ্রাযন্ত্র।

বাংলা ১২৭৭সনের ১লা শ্রাবণ হইতে ১২৭৯ সনের ১৬ই আষাঢ় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৎসর কাল 'বঙ্গবন্ধু' পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা চারি ফর্ম্মার আয়তনে *সোম প্রকাশ* এর আকারে বাহ্যিক ও আন্তরিক শ্রী সম্পন্ন হইয়াছে। রাজনৈতিক আলোচনা, সামাজিক আলোচনা ও সাময়িক আলোচনা ও ধর্ম্ম নৈতিক আলোচনা, এম্মিধ চারি বিভক্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ সহকারে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। লিখা, কাগজ ও ছাপা সকলই যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় তৎপক্ষে সকল প্রকারের আয়োজন করা হইতেছে। সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুর মূল্য নিম্নলিখিত সুলভ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

(ঢাকাতে ও বিদেশে)

অগ্রিম বার্ষিক (৪৮ খণ্ডে)- ৭

অগ্রিম ষান্মাষিক (২৪ খণ্ডে)- ৪

অগ্রিম ত্রৈমাসিক (১২ খণ্ডে)-২

অগ্রিম প্রতি সংখ্যা- তিন আনা

পশ্চাদেয়- যতমাস অন্তরে মূল্য আদায় হইবে অগ্রিমের উপরে ততসিকি অধিক দিতে হইবে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষরাদি সমুদয় কলিকাতা হইতো নূতন আনা হইতেছে। উ্কত যন্ত্রে সুবিধার সহিত নিয়মিত সময়ে ও উৎকৃষ্ট রকমে কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। যাহারা সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুর গ্রাহক হইতে চাহেন কিম্বা নূতন যন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন করিতেইচ্ছা করেন তাহারা শ্রীযুক্ত

[১৪৬]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ এপ্রিল ১৮৭০;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৩৫।

বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দী ঢাকা বাংলা বাজার এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন বা তত্ত্ব করিবেন।

-বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধায়কগণ।[১৪৭]

এই রকম আরেকটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোষণা এবং উহার মূল্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ২৭ এপ্রিল ১৮৭৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে-

ভারত-সুহৃদ

অত্যাশ্চর্য উপন্যাস ও বিধি সম্ভারপূর্ণ মাসিকপত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ছয় আনা।

-শ্রী অম্বিকাচরণ রায়, নান্নার। পোঃ রোয়াইল, ঢাকা।

বিক্রমপুর প্রকাশ নামে আরেকটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোষণা এবং উহার মূল্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ২৮ নভেম্বর ১৮৮০ তারিখে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে-

বিক্রমপুর প্রকাশ

(মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন)

অগ্রিম বার্ষিখ মূল্য (ময় ডাকমাসুল) ৩ টাকা। ঢাকা, শ্রীনগর বীরতারা বিক্রমপুর প্রকাশ কার্য্যালয়।

- শ্রী মহিন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী[১৪৮]

সদানন্দ নামে আরেকটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোষণা এবং উহার মূল্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে-

সদানন্দ

বিদ্রুপপত্র ও সমালোচনা

বর্তমান সনের বৈশাখ হইতে কলিতে কলি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা মফস্বলে ময় রাহা খরচ আনা। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

---

[১৪৭]*ঢাকা প্রকাশ*, ৪ আগস্ট ১৮৭২;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৩৮।

[১৪৮]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ নভেম্বর, ১৮৮০;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৪১।

-শ্রী হরিহর নন্দী কার্য্যাধ্যক্ষ, ঢাকা গিরিশযন্দ্র। [১৪৯]

শিল্প ও কৃষি পত্রিকা নামে আরেকটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোষণা এবং উহার মূল্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ৩০ আগস্ট ১৮৮৫ তারিখে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে-

> তাহিরপুর কৃষি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। শিল্প ও কৃষি পত্রিকা।
>
> গত বৈশাখ হইতে বাহির হইতেছে। কেবলমাত্র বার্ষিক বার আনা ডাক মাসুলেই বিতরণের জন্য একজনের নামে প্রতি সংখ্যার কতগুলি পত্রিকা এক সঙ্গে পাঠান যাইতে পারে। বিলম্বে প্রার্থণা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।[১৫০]

১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসের আরেকটি বিজ্ঞাপনে বই বিক্রয় সংক্রান্ত একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়। যথা-

> নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত মূল্য ১|| টাকা মাত্র। ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে অথবা বাবুর বাজার আমার দোকানে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। [শ্রী অনাথ বন্ধু মৌলিক][১৫১]

১৮৭২ সালে *ঢাকা প্রকাশ* এর আগস্ট মাসের একটি সংখ্যার বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত বইয়ের মূল্যসহ প্রাপ্তিস্থান বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়। যথা-

> বিজয় কামিনী, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, গ্রহনেচ্ছুগণ বাবুর বাজার নবকান্ত বাবুর দোকানে, কালী বাবুর বাসায় এবং বেজগাঁ মুন্সী বাটিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মুল্য ||আনা বিদেশে ||/আনা। [শ্রী দিগিন্দ্র প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ২৮ শ্রাবণ ১২৮৯, ১১ আগস্ট ১৮৭২][১৫২]

---

[১৪৯]*ঢাকা প্রকাশ*, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮২;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৪৫।

[150]*ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৮৫;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৪৬।

[১৫১]*ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ কার্ত্তিক, ১২৭৬; ১৪ নভেম্বর ১৮৬৯।

[১৫২]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ শ্রাবণ ১২৭৯; ১১ আগস্ট ১৮৭২।

এরকম বই এর আরেকটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের *ঢাকা প্রকাশ* সংখ্যায়-

> বসন্তকুমারী নাটক।
>
> শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত।
>
> কলিকাতা নূতন বাঙ্গলা বস্ত্রালয় এবং আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ১২ আনা।
>
> শ্রী আইনদ্দীন বিশ্বাস
>
> কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া
>
> ২৮ মাঘ ১২৭৯; ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩।[১৫৩]

আঠারো শতকে শুধু বই প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুল প্রচার ও প্রসারেরই ব্যবস্থা করা হতো তা নয়। গুণী লেখকদের স্বহস্তে লিখিত অপ্রকাশিত কোন কবিতা, গান কিংবা যে কোন পাণ্ডুলিপি কারো কাছে সংরক্ষিত থাকলে তা খোজ করার জন্যও প্রসিদ্ধ প্রকাশকগণ তৎকালীন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিত। এরকমই একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় *ঢাকা প্রকাশ* এর ১২ নভেম্বর ১৮৭৬ সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনটিতে উল্লেখ করা হয়-

> কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মীয় স্বজনের নিকট তৎকৃত যে সকল কবিতা অপ্রকাশিত আছে, উক্ত মহাত্মগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট তাহা প্রেরণ করিলে আমি মুদ্রিত করিয়া কবিবরের নি:সহায় সন্তানদিগকে পুস্তকের স্বত্ব দিতে কামনা করি। এতদ্বারা মৃত কবির সুধাময়ী লেখনী নি:সৃত কবিতা প্রচার এবং তৎসন্তানগণের আর্থিক সাহায্য এই উভয়ই হইতে পারে। ভরসা করি, যাঁহার নিকট যে দুই একটি কবিতা থাকে তিনি অবিলম্বে তাহা আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
>
> শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ন রায়
>
> জয়দেবপুর
>
> ঢাকা

[১৫৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মাঘ ১২৭৯; ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩

২৮ কার্ত্তিক, ১২৭৩; ১২ নভেম্বর, ১৮৭৬।[১৫৪]

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করা সংবাদপত্রগুলোতে নিয়মিতই দেখা যায়। *ঢাকা প্রকাশ এর* ১৮৭৬ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখ সংখ্যায় প্রতিবছর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের জন্য *বঙ্গ সাহিত্য সমালোচনী* সংস্থা কর্তৃক বিশেষ পারিতোষিক দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। মূল বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

> কুমার রাজেন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গ সাহিত্য সমালোচনী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গসাহিত্য সংসারে প্রতিবৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয়, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্তে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।
>
> ঢাকা
>
> জয়দেবপুর
> শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়
>
> কার্যাধ্যক্ষ।
>
> ৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬। [১৫৫]

আবার প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় করিতে না পারা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক হইবার আহবানও *ঢাকা প্রকাশ* এর ৬ এপ্রিল ১৮৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মূল বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> শ্রীযুক্ত হরসুন্দরী দেবীর বিতরিত মূল ও পদ্যানুবাদিত বাল্মীকি রামায়ন বাহির হইয়াছে। অনেকে গ্রাহক হইতে না পারিয়া দুঃখিত চিত্তে পত্র লিখিতেছেন এজন্য গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পুনঃ জানান যাইতেছে যে, প্রার্থীগণ মাঘ মাস মধ্যে এক টাকা নয় আনা সহিত প্রার্থী হইলে রামায়ন পাইতে পারিবেন।
>
> ১২৮৫ সন

[১৫৪]২৮ কার্ত্তিক, ১২৭৩; ১২ নভেম্বর, ১৮৭৬;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), ৪০২।

[১৫৫]৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), ৪০২।

২০শে পৌষ

শ্রীকালী কিশোর চক্রবর্ত্তী

দাতব্য রামায়ণের কার্য্যালয়,

নারায়ন সহর, ময়মনসিংহ।

২৪ চৈত্র, ১২৮৫; ৬ এপ্রিল ১৮৭৯।[১৫৬]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় তত্ত্বানুসন্ধী ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের জন্য *গীতানুশীলন* নামে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে গ্রন্থের বিজ্ঞাপন নিয়মিতই প্রচারিত হতে দেখা যায়। ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিবরণ নিম্নরূপ ছিল–

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি.এ প্রণীত

দর্শনশাস্ত্রের সার **গীতানুশীলন** বেদান্তের চরমপ্রস্থান

তত্ত্বানুসন্ধী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ "ঢাকা প্রকাশ" পত্রে **গীতানুশীলন** নামে যে প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা গিয়াছে। সম্প্রতি ডাবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার ২০ ফর্ম্মায় (মোট ৩২০ পৃষ্ঠায়) এই পুস্তকের **প্রথম খণ্ড** প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান– ঢাকা প্রকাশ অফিস, ঢাকা।[১৫৭]

বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা মূলত হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের সারবস্তু। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িকীকির মালিক বা সম্পাদক পর্যায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু ধর্মীয় হওয়ায় ধর্ম প্রচার ও প্রসারে সাময়িকীপত্র প্রধান মূখপত্র হিসেবে ব্যবহার করতো। এজন্য যে যার অবস্থান থেকে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে সম্পাদক শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তীও ব্যতিক্রম নয়। তিনিও তার ধর্মানুরাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি হিন্দুদের জন্য কর্মপরিধিমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন দীর্ঘ ২ বছর যাবৎ এবং পরবর্তীতে তা *গীতানুশীলন* নামে সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির তৎকালীন বাজার মূল্য হিসেবে ১ টাকার উল্লেখ আছে বিজ্ঞাপনের শেষ দিকে।

[১৫৬] ২৪ চৈত্র, ১২৮৫; ৬ এপ্রিল ১৮৭৯:মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), ।

[১৫৭]*ঢাকা প্রকাশ*, ১লা ডিসেম্বর ১৯৪০, পৃ.০৭।

৭. শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত

পূর্ব্ব বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার, প্রসারতা বৃদ্ধি প্রভৃতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন ঘোষণা বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হতো সাময়িক পত্রে। এগুলোর কোনটি ছাত্রবৃত্তির ঘোষণা আবার কোনটি ছিল স্ত্রী জাতির শিক্ষার সুযোগ তৈরির ঘোষণা বিষয়ক। *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৮৭২ সনের ৩০ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

> এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৩ ই মে বাবুর বাজার লালবাগ সারকেলের অন্তর্গত একটি পাঠশালা খোলা হইয়াছে। এই স্কুলে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পুস্তক সকল পড়ান হইবে। দুই আনা হারে সকল বালকে বেতন দিতে হইবেক। এবার যাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে আমি তাহাদিগের পাঁচ টাকার পুস্কার দিতেও প্রস্তুত আছি।
>
> -শ্রী আব্দুল রহেল।[১৫৮]

ছাত্রবৃত্তি প্রদান ছাড়াও স্ত্রী জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। *ঢাকা প্রকাশ* এর ১৮৭০ সালের একটি বিজ্ঞাপনে স্ত্রী জাতির শিক্ষায় পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায়-

> ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীার ছাত্রীদিগের মধ্যে যিনি সাহিত্যেরে পরীক্ষাতে প্রথম হইবেন, তাহাকে ৪ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।
>
> আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন (ডাক্তার) মহাশয় ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার ছাত্রীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রীকে ৬ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। ছাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আমাদিগকে আশ্বিন মাস মধ্যে অবগত করাইবেন।
>
> নির্ব্বাচিত পুস্তক: স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, নির্ম্মলার উপাখ্যান। ২৬ শে শ্রাবণ ১২৭৭ সন।-ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা।[১৫৯]

---

[১৫৮]*ঢাকা প্রকাশ*, ৩০জুন ১৮৭২;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ১৯৪।

[১৫৯]*ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ আগস্ট, ১৮৭০;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ১৯৫।

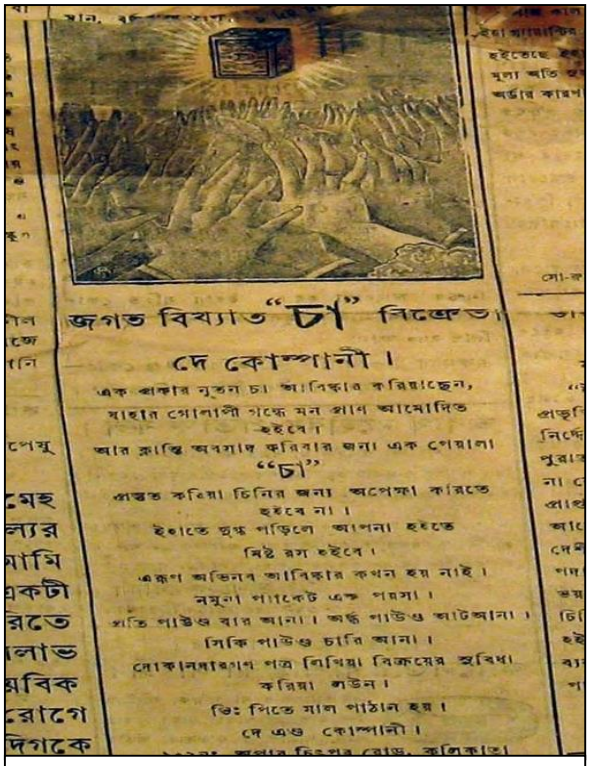
৮. বিবিধঃ

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর। আজকের একবিংশ শতকের বিশ্বে অনেক বিষয় মামুলি হিসেবে গণ্য হলেও উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা অভিনব হিসেবেই প্রতিভাত হতো বলে ধারণা করা যায়। এই উপবিভাগে সংযোজিত বিজ্ঞাপনগুলো সঙ্গত কারণে ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে ব্যাপক বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত পানীয় কোম্পানী 'দে কোম্পানী' কর্তৃক উৎপাদিত চা এর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় একটি চায়ের বাক্স চারদিকে আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে যার নিচে অগণিত হাত বাক্সটিকে ধরতে চেষ্টা করছে। অগণিত হাত বলতে অসংখ্য মানুষকে যে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সাধারণ দৃষ্টেই বুঝা যায়।

বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

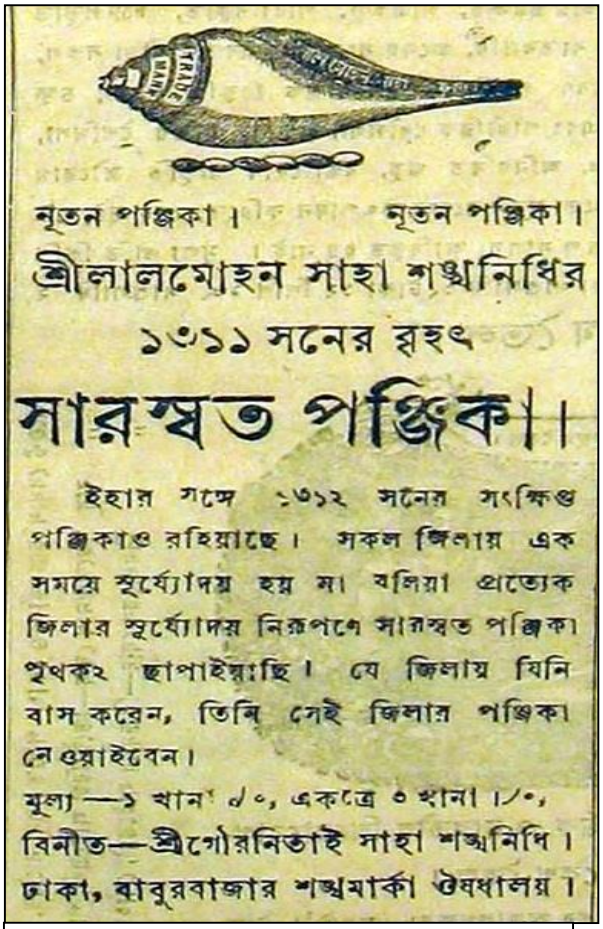
'জগত বিখ্যাত 'চা' বিক্রেতা দে কোম্পানী। এক প্রকার নূতন চা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার গোলাপী গন্ধে মন প্রাণ আমোদিত হইবে। আর ক্লান্তি অবসাদ করিবার জন্য এক পেয়ালা "চা" প্রস্তুত করিয়া চিনির জন্য অপেক্ষা করতে হইবে না। ইহাতে দুগ্ধ পড়িলে আপনা হইতে মিষ্ট রস হইবে। এরূপ অভিনব আবিষ্কার কখন হয় নাই। নমুনা প্যাকেট এক পয়সা। প্রতি পাউণ্ড বার আনা। অর্দ্ধ পাউণ্ড আট আনা। সিকি পাউণ্ড চারি আনা। দোকানদারগণ পত্র লিখিয়া বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া লউন। ভিপিতে মাল পাঠান হয়। দে এণ্ড কোম্পানী। ১০২ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।[১৬০]



চিত্র- ৮.১ : দে কোম্পানীর চা

[১৬০] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধি কর্তৃক উদ্ভাবিত 'সারস্বত পঞ্জিকা' নামক একটি পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর **১৩১১** বঙ্গাব্দের ২ জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে একটি শঙ্খ বা শামুকের ছবি দেখা যায় যার গায়ে বাংলায় 'লালমোহন সাহা' এবং ইংরেজিতে TRADE MARK লেখা আছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়- 'নূতন পঞ্জিকা। নূতন পঞ্জিকা। শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধির **১৩১১** সনের বৃহৎ **সারস্বত পঞ্জিকা**। ইহার সঙ্গে **১৩১২** সনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকাও রহিয়াছে। সকল জিলায় এক সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না বলিয়া প্রত্যেক জিলার সূর্য্যোদয় নিরূপণে সারস্বত পঞ্জিকা পৃথক ছাপাইয়াছি। যে জিলায় যিনি বাস করেন, তিনি সেই জিলার পঞ্জিকা নেওয়াইবেন। বিনীত- শ্রীগৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি। ঢাকা, বাবুবাজার শঙ্খনিধি ঔষধালয় ।[১৬১]


নূতন পঞ্জিকা। নূতন পঞ্জিকা।
শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধির
১৩১১ সনের বৃহৎ
সারস্বত পঞ্জিকা।
ইহার সঙ্গে ১৩১২ সনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকাও রহিয়াছে। সকল জিলায় এক সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না বলিয়া প্রত্যেক জিলার সূর্য্যোদয় নিরূপণে সারস্বত পঞ্জিকা পৃথক২ ছাপাইয়াছি। যে জিলায় যিনি বাস করেন, তিনি সেই জিলার পঞ্জিকা নেওয়াইবেন।
মূল্য —১ খান৷ ৵০, একত্রে ৩ খানা ।/০,
বিনীত—শ্রীগৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি।
ঢাকা, বাবুরবাজার শঙ্খমার্কা ঔষধালয়।

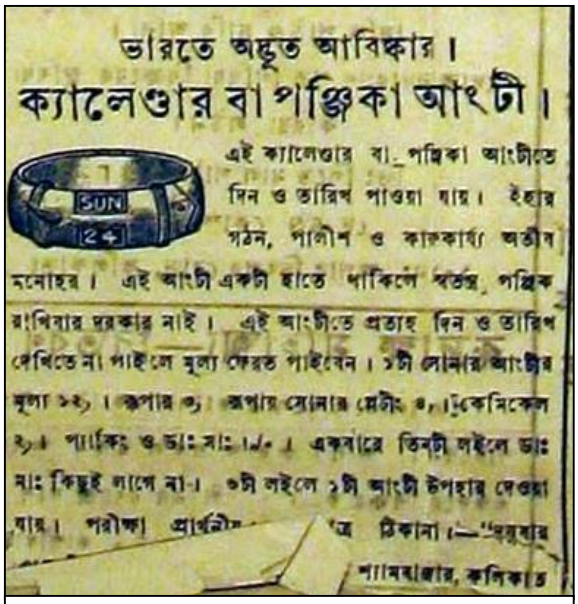
চিত্র- ৮.২: সারস্বত পঞ্জিকা

পঞ্জিকা আংটী নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর **১৩১১** বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি আংটীর চিত্র দেখা যায় যার উপরে ইংরেজিতে SUN ও 24

[১৬১] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ জৈষ্ঠ্য **১৩১১**, পৃ.০৮।

উৎকীর্ণ আছে। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

ভারতে অদ্ভূত আবিষ্কার। ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকা আংটী। এই ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকা আংটীতে দিন ও তারিখ পাওয়া যায়। ইহার গঠন, পালীশ ও কারুকার্য্য অতীব মনোহর। এই আংটী একটা হাতে থাকিলে স্বতন্ত্র পল্লিক রাখিবার দরকার নাই। এই আংটীতে প্রত্যহ দিন ও তারিখ দেখিতে না পাইলে মূল্য ফেরত পাইবেন। ১টা সোনার আংটীর মূল্য ১২ আনা।[১৬২]



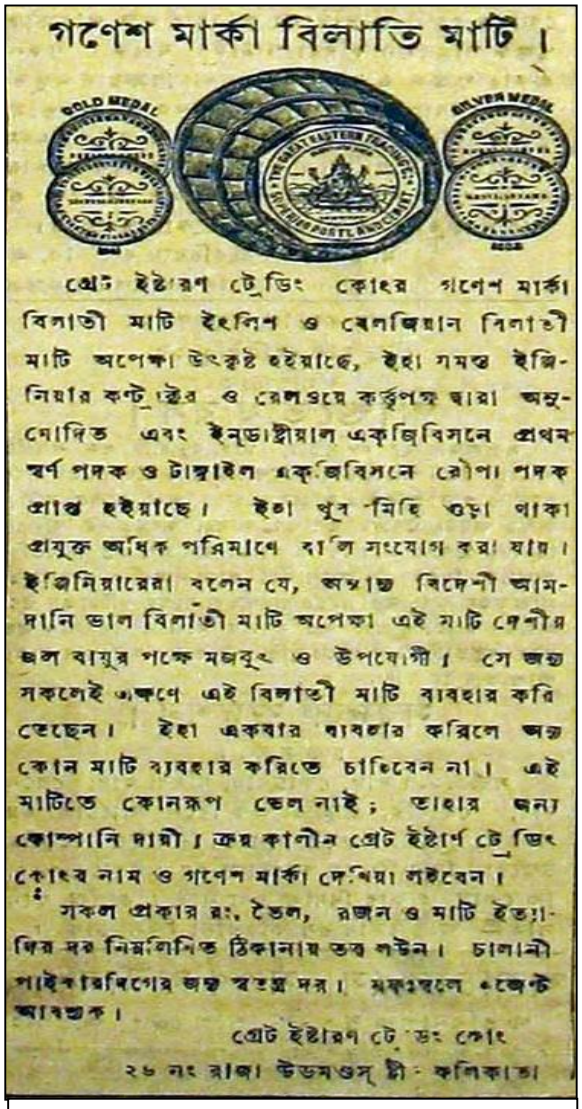
চিত্র- ৮.৩ : পঞ্জিকা আংটী

গ্রেট ইষ্টারণ ট্রেডিং কোং এর উদ্ভাবিত 'গনেশ মার্কা বিলাতি মাটি' নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২৩ জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়- গ্রেট ইষ্টারণ কোংর গনেশ মার্কা বিলাতী মাটি ইংলিশ ও বেলজিয়ান বিলাতী মাটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকটর ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত এবং ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে স্বর্ণপদক ও টাঙ্গাইল একজিবিসনে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা খুব মিহি গুড়া থাকা প্রযুক্ত অধিক পরিমাণে বালি সংযোগ করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারেরা বলেন যে, অন্যান্য বিদেশী আমদানি ভাল বিলাতী মাটি অপেক্ষা এই মাটি দেশীয় জলবায়ূর পক্ষে মজবুৎ ও উপযোগী। সেজন্য সকলেই এক্ষণে এই বিলাতী মাটি ব্যবহার করিতেছেন। ইহা একবার ব্যবহার করিলে অন্য কোন মাটি ব্যবহার করিতে চাহিবেন না। এই মাটিতে কোনরূপ তেল নাই; তাহার জন্য কোম্পানী দায়ী। ক্রয়কালীন গ্রেট ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোংর নাম ও গনেশ মার্কা দেখিয়া লইবেন।

সকল প্রকার রং, তৈল, রজন ও মাটি ইত্যাদির দর নিম্নলিখিত ঠিকানায় তত্ত্ব লউন। চালানী পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র দর। মফস্বলে এজেন্ট আবশ্যক।

[১৬২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ চৈত্র ১৩১১, পৃ.০৮।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং। ২৬ নং উডমণ্ডস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।[১৬৩]



চিত্র- ৮.৪ : গনেশ মার্কা বিলাতী মাটি

কাঠের স্ট্যাম্প নির্মাতা কোম্পানী এস এল দাস কোং এর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনে একটি ষ্ট্যাম্পের ছবি দেখা যাচ্ছে যার বিবরণে বলা হয়-

'এসএল দাস কোং সকল রকম ব্লাক কাষ্ঠের ও ইলেক্ট্রো করেন এবং দস্তার উপরে লেখা ও খোদাইয়ের কার্য্য সুন্দররূপে এবং উচিত মূল্যে ও শীঘ্র তৈয়ারী করিয়া থাকেন। ইহারা রবার ষ্ট্যাম্পের কার্য্যও করেন। পরীক্ষা প্রার্থণীয়। ঠিকানা। ৫ নং ব্রাহ্মসমাজ লেন বহুবাজার, কলিকাতা।[১৬৪]

[১৬৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জৈষ্ঠ্য ১৩১১, পৃ.০৮।
[১৬৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।



চিত্র- ৮.৫: কাঠের ষ্ট্যাম্প

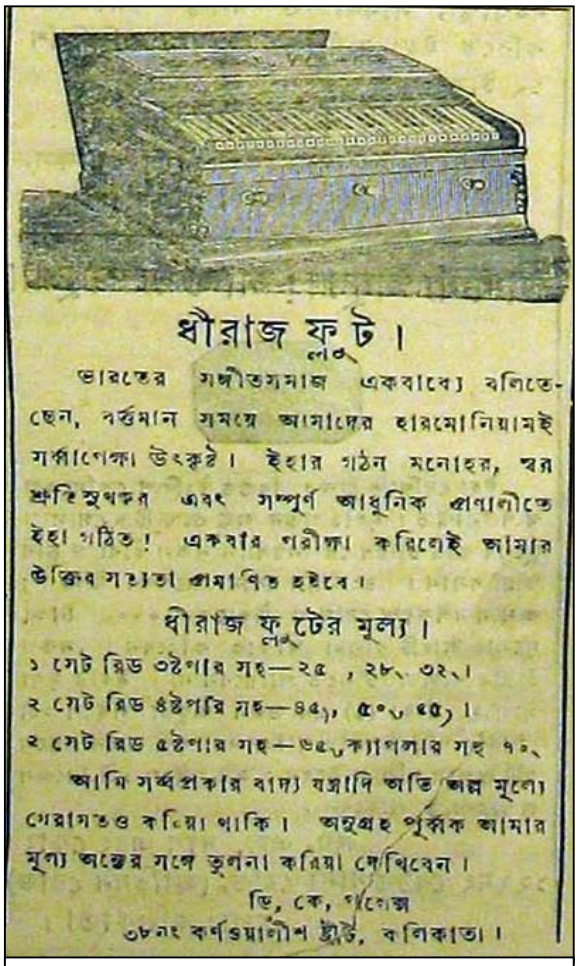
'ধীরাজ ফ্লুট' নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি হারমোনিয়ামের চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'ভারতের সঙ্গীত সমাজ একবাক্যে বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের হারমোনিয়ামই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার গঠন মনোহর, স্বর শ্রুতি সুখকর এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে ইহা গঠিত। একবার পরীক্ষা করিলেই আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

ধীরাজ ফ্লুটের মূল্য। ১ সেট ৩ষ্টপারসহ ২৫ টাকা, ২৮ টাকা, ৩২ টাকা। ২ সেট ৪ষ্টপারসহ ৪৫টাকা, ৫০ টাকা, ৫৫ টাকা। ২ সেট ৫ ষ্টপারসহ ৬৫ টাকা, ক্যাপলারসহ ৭০ টাকা।

আমি সর্ব্বপ্রকার বাদ্য যন্ত্রাদি অতি অল্প মূল্যে মেরামত্র করিয়া থাকি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার মূল্য অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

ডি. কে পালেক্স। ৩৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।[১৬৫]



চিত্র- ৮.৬ : ধীরাজ ফ্লুট।

'পিচ এণ্ড ওয়ার ব্রাণ্ড' নামক চায়ের একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২১ শ্রাবণ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দুটি দৃশ্যের চিত্রায়ন করা হয়েছে যেখানে একটি চিত্রে কিছুলোক যুদ্ধরত রয়েছে এবং অন্য চিত্রে কিছু লোক গোলটেবিলে বসে আলোচনা করছে। এটা যে শান্তির আলোচনা তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়- 'সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে বিলাতী রেজেষ্টারী করা PEACE and WAR BRAND TEA, The BOERS and The ENGLISH। পিস এণ্ড ওয়ার ব্রাণ্ড টি, দি বুয়ার্স এবং দি ইংলিস। সদগন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত তুলনা করিলে উক্ত চা সস্তার চূড়ান্ত, সভ্য জগতে বিশেষ আদরের সামগ্রী, বোধ হয় জগতে অদ্বিতীয়। বাক্স গুলিও বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, দেখিলেই গ্রাহকের মন আকৃষ্ট করে। বাক্স গুলিতে কি কি চা আছে যথা-

১। ফ্লাডয়ারী অরেঞ্জ পেকো। ২। অরেঞ্জ পেকো। ৩। পেকো নং ১। ৪। পেকো সৃসং । ৫। ডট।

[১৬৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

ভারতে একমাত্র প্রধান বিক্রেতা-

বিজয়কৃষ্ণ দে, ১নং বেঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।'[১৬৬]



চিত্র- ৮.৭: পিচ এণ্ড ওয়ার ব্রাণ্ড টি

'জাপানী দেয়াসলাই' নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১১ আশ্বিন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় দুইটি হাতী। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'কলিকাতা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে সর্ব্ব প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরীর সোল এজেন্ট- শ্রীমদনমোহন কেশবলাল দাস, ঢাকা। সাধারণকে সাবধান করিতেছি নালাদারু ব্রাদার্সের নাম দেখি ক্রয় করিবেন।

জাপানী দেয়াসলাই! সর্ব্বোৎকৃষ্ট! সর্ব্বোৎকৃষ্ট!!

নালাদারু ব্রাদার্সের যুদ্ধ হাতী মার্কা দেয়াসলাই জাপান দেশ হইতে আসিয়াছে।

[১৬৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ শ্রাবণ ১৩১২, পৃ.০৭।

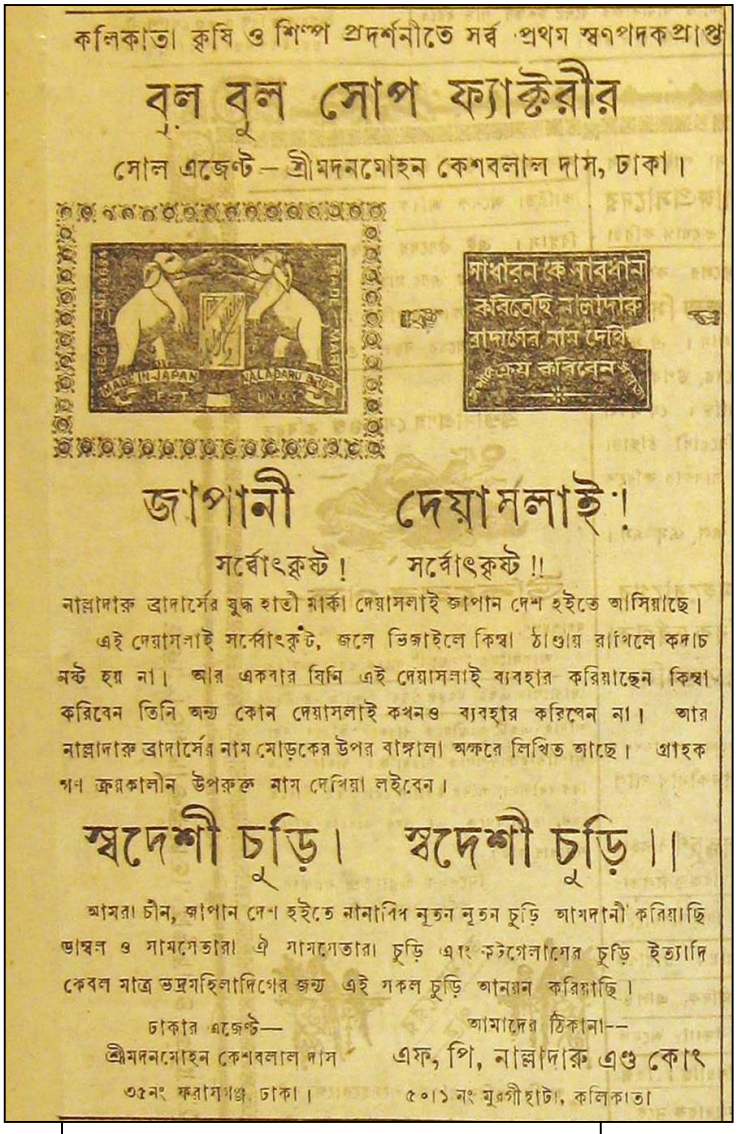
এই দেয়াসলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জলে ভিজাইলে কিম্বা ঠাণ্ডায় রাখিলে কদাচ নষ্ট হয় না। আর একবার যিনি এই দেয়াসলাই ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তিনি অন্য দেয়াসলাই কখনও ব্যবহার করিবেন না। আর নাল্লাদারু ব্রাদার্সের নাম মোড়কের উপর বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে। গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন উপরুক্ত নাম দেখিয়া লইবেন।

স্বদেশী চুড়ি। স্বদেশী চুড়ি।।

আমরা চীন, জাপান দেশ হইতে নানাবিধ নূতন নূতন চুড়ি আমদানী করিয়াছি ডাম্বল ও সামসেতারা চুড়ি ইত্যাদি কেবলমাত্র ভদ্রমহিলাদিগের জন্য এই সকল চুড়ি আনয়ন করিয়াছি।

ঢাকার এজেন্ট- শ্রীমদনমোহন কেশবলাল দাস, ৩৫ নং ফরাসগঞ্জ।

আমাদের ঠিকানা– এফ.পি নাল্লাদারু এণ্ড কোং, ৫০।১ নং মুরগীহাট, কলিকাতা।'[১৬৭]


কলিকাতা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে সর্ব্ব প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

বুল বুল সোপ ফ্যাক্টরীর

সোল এজেণ্ট—শ্রীমদনমোহন কেশবলাল দাস, ঢাকা।

সাধারণকে সাবধান করিতেছি নাল্লাদারু ব্রাদার্সের নাম দেখি ক্রয় করিবেন

জাপানী দেয়াসলাই!

সর্ব্বোৎকৃষ্ট! সর্ব্বোৎকৃষ্ট!!

নাল্লাদারু ব্রাদার্সের যুদ্ধ হাতী মার্কা দেয়াসলাই জাপান দেশ হইতে আসিয়াছে।

এই দেয়াসলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জলে ভিজাইলে কিম্বা ঠাণ্ডায় রাখিলে কদাচ নষ্ট হয় না। আর একবার যিনি এই দেয়াসলাই ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তিনি অন্য কোন দেয়াসলাই কখনও ব্যবহার করিবেন না। আর নাল্লাদারু ব্রাদার্সের নাম মোড়কের উপর বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে। গ্রাহক গণ ক্রয়কালীন উপরুক্ত নাম দেখিয়া লইবেন।

স্বদেশী চুড়ি। স্বদেশী চুড়ি।।

আমরা চীন, জাপান দেশ হইতে নানাবিধ নূতন নূতন চুড়ি আমদানী করিয়াছি ডাম্বল ও সামসেতারা ঐ সামসেতারা চুড়ি এবং রঙ্গেলাসের চুড়ি ইত্যাদি কেবল মাত্র ভদ্রমহিলাদিগের জন্য এই সকল চুড়ি আনয়ন করিয়াছি।

ঢাকার এজেণ্ট—
শ্রীমদনমোহন কেশবলাল দাস
৩৫নং ফরাসগঞ্জ, ঢাকা।

আমাদের ঠিকানা—
এফ, পি, নাল্লাদারু এণ্ড কোং
৫০।১ নং মুরগীহাটা, কলিকাতা

চিত্র- ৮.৮: জাপানী দেয়াসলাই

[১৬৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

এস রায় এণ্ড কোং ফুটবলের সরঞ্জামের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি ফুটবলের চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

‘পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার।

পত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়া যায় না, এ অনুযোগ নানা স্থানের গ্রাহকগণ দিতেছেন। পত্র পাই নাই নিশ্চিত জানিবেন। চিঠি চুরি হইতেছে। ধরাইয়া দিতে পারিলে ৫০ টাকা পুরস্কার দিব।

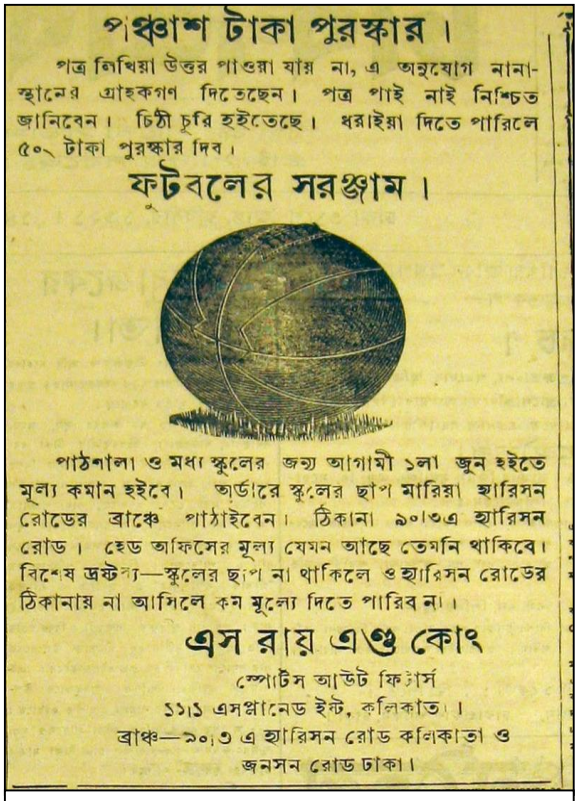
ফুটবলের সরঞ্জাম।

পাঠশালা ও মধ্যস্কুলের জন্য আগামী ১লা জুন হইতে মূল্য কমান হইবে। অর্ডারে স্কুলের ছাপ মারিয়া হ্যারিসন রোডের ব্রাঞ্চে পাঠাইবেন। ঠিকানা ৯০/৩ এ হ্যারিসন রোড। হেড অফিসের মূল্য যেমন আছে তেমনি থাকিবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য–স্কুলের ছাপ না থাকিলে ও হ্যারিসনের রোডে না আসিলে কম মূল্যে দিতে পারিব না।

এস রায় এণ্ড কোং

স্পোর্টস আউট ফিটার্স, ১১/১ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ-৯০/৩ এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা ও জনসন রোড ঢাকা।’[১৬৮]


পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার।

পত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়া যায় না, এ অনুযোগ নানা-স্থানের গ্রাহকগণ দিতেছেন। পত্র পাই নাই নিশ্চিত জানিবেন। চিঠী চুরি হইতেছে। ধরাইয়া দিতে পারিলে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিব।

ফুটবলের সরঞ্জাম।

পাঠশালা ও মধ্য স্কুলের জন্য আগামী ১লা জুন হইতে মূল্য কমান হইবে। অর্ডারে স্কুলের ছাপ মারিয়া হ্যারিসন রোডের ব্রাঞ্চে পাঠাইবেন। ঠিকানা ৯০।৩এ হ্যারিসন রোড। হেড আফিসের মূল্য যেমন আছে তেমনি থাকিবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্কুলের ছাপ না থাকিলে ও হ্যারিসন রোডের ঠিকানায় না আসিলে কম মূল্যে দিতে পারিব না।

এস রায় এণ্ড কোং

স্পোর্টস আউট ফিটার্স
১১।১ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—৯০।৩ এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা ও
জনসন রোড ঢাকা।

চিত্র- ৮.৯: ফুটবল সরঞ্জাম।

[১৬৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ.০২।

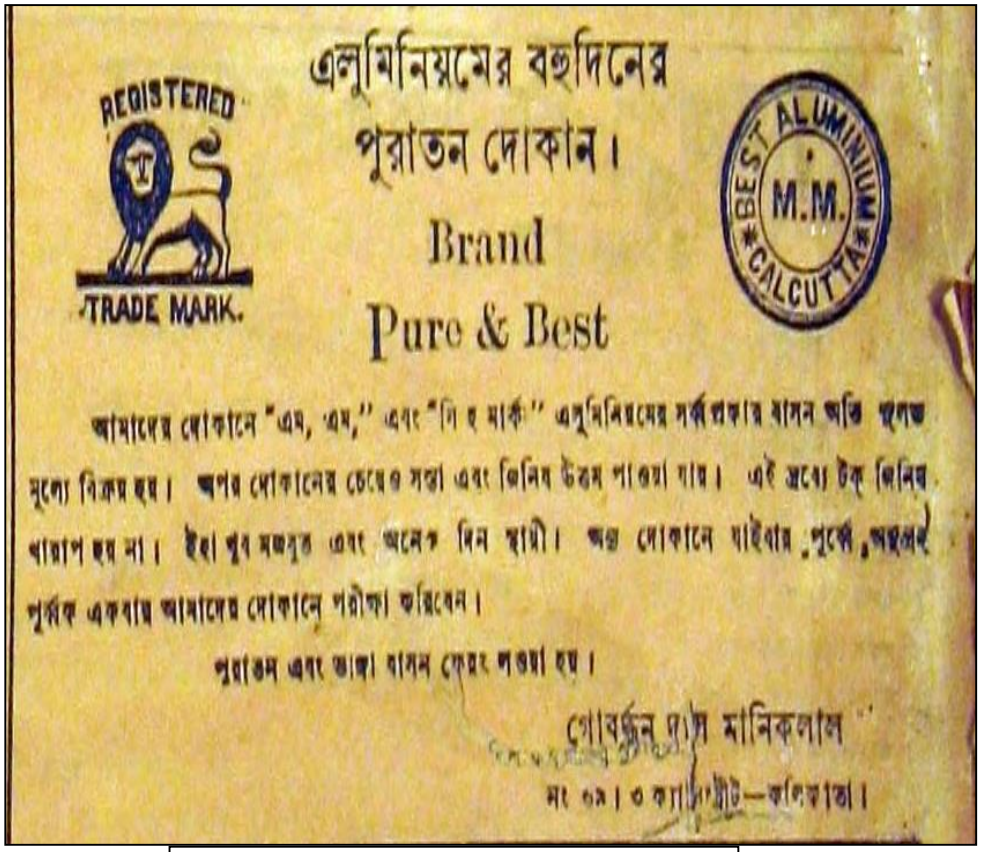
এলুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি সিংহের চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

‘ এলুমিনিয়মের বহুদিনের পুরাতন দোকান।

Brand Pure & Best

আমাদের দোকানে এমএম এবং সিংহ মার্কা এলুমিনিয়মের সর্ব্বপ্রকার বাসন অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। অপর দোকানের চেয়েও সস্তা এবং জিনিষ উত্তম পাওয়া যায়। এই দ্রব্যে টক জিনিষ খারাপ হয় না। ইহা খুব মজবুত এবং অনেক দিন স্থায়ী। অন্য দোকানে যাইবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করিবেন। পুরাতন এবং ভাঙ্গা বাসন ফেরৎ লওয়া হয়।

গোবর্দ্ধন দাস মানিকলাল, নং ৬৯। ৩ [অস্পষ্ট] ষ্ট্রীট–কলিকাতা।[১৬৯]



চিত্র-৮.১০ : এলুমিনিয়মের তৈজসপত্র

[১৬৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

জগদ্বিখ্যাত 'ডিটজ লাণ্ঠান' নামক একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৫ অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি হারিকেনের চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'জগদ্বিখ্যাত ডিটজ লাণ্ঠান ব্যবহার করুন।

অতি অল্প তৈল খরচে অতি উজ্জল আলো হয়।

এজেন্টস্- এলিয়ট এণ্ড কোং, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।[১৭০]



চিত্র- ৮.১১ : ডিটজ লাণ্ঠান

[১৭০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ অগ্রহায়ন ১৩২৩, পৃ.০৬।

'লোহার কড়াই' নামক আরেকটি তৈজসপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি লোহার কড়াই এর চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

' লোহার কড়াই।

৫৪ নং সেট ১ হইতে ৬ প্রতি সেট ২ টাকা ৮ আনা

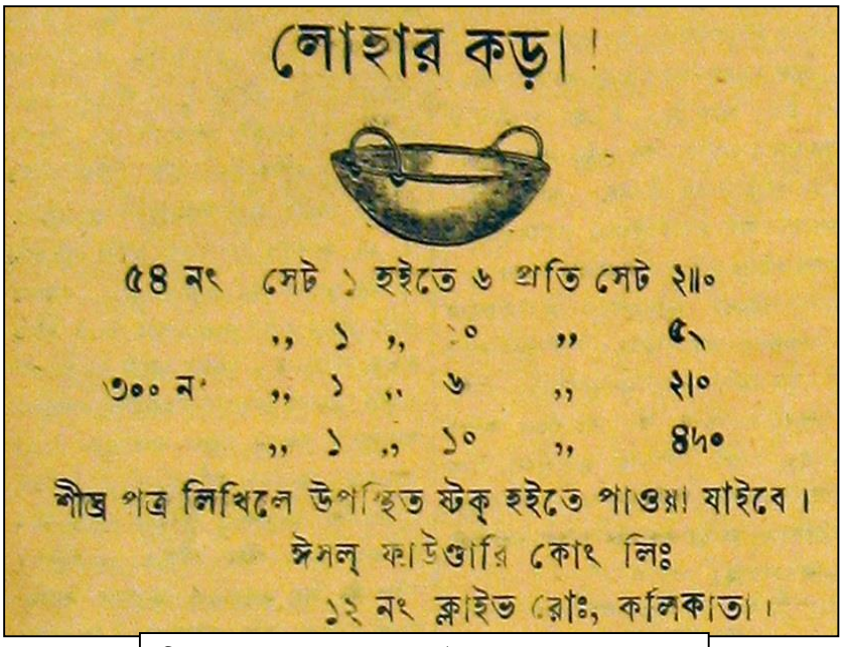
" ১ " ১০ " ৫ টাকা

৩০০ নং " ১ " ৬ " ২ টাকা ৪ আনা

" ১ " ১০ "৪ টাকা ১২ আনা

শীঘ্র পত্র লিখিলে উপস্থিত ষ্টক হইতে পাওয়া যাইবে।

ঈসল ফাউণ্ডারি কোং লিঃ, ১২ নং ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।[১৭১]



চিত্র-৮.১২: লোহার কড়াই

[১৭১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

দত্ত দাস এণ্ড কোং এর সাইকেল ও সেলাইকল নামক পণ্যের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৫ অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একজন লোক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন এমন একটি চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'আপনাদের সেই চিরপরিচিত সাইকেল ও সেলাইকল বিক্রেতা– দত্ত দাস এণ্ড কোং। ৫৯ নং বেনটিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আমার নানা রকমের বাইসাইকেল ও ট্রাইসাইকেল , সেলাইকল এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে আমদানী করি। মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। ক্যাটালগ দেখুন ও পরীক্ষা করুন।'[১৭২]



চিত্র- ৮.১৩ : দত্ত দাস এণ্ড কোং এর বাই সাইকেল

[১৭২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

এএস সি চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স কোম্পানীর জুতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ফিতাসহ একটি জুতার চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'আমরা বিলাতি শেপের অনুকরণে উৎকৃষ্ট ক্রোম চামড়ার খুব মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতেছি। পায়ের মাপ পাঠাইলে ভিঃপিঃতে মাল পাঠাই। সাধারণ মূল্য সু ৩ টাকা ৮ আনা; বুট ১০ টাকা হইতে ১৮ টাকা; টেনিস ৩টাকা ৪ আনা হইতে ৬ টাকা। সচিত্র মূল্য তালিকা সাদরে প্রেরিত হয়।

এস সি চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স, ১৮ নং নজীরাবাদ, লক্ষ্ণৌ।'[১৭৩]


আমরা বিলাতি শেপের অনুকরণে উৎকৃষ্ট ক্রোম চামড়ার খুব মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতেছি। পায়ের মাপ পাঠাইলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। সাধারণ মূল্য—সু ৩৲০ হইতে ৮৲০ ; বুট ১০৲ হইতে ১৮৲ ; টেনিস্ ৩৲০ হইতে ৬৲ টাকা। সচিত্র মূল্য তালিকা সাদরে প্রেরিত হয়।
এস্ সি চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স
১৮নং নজীরাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

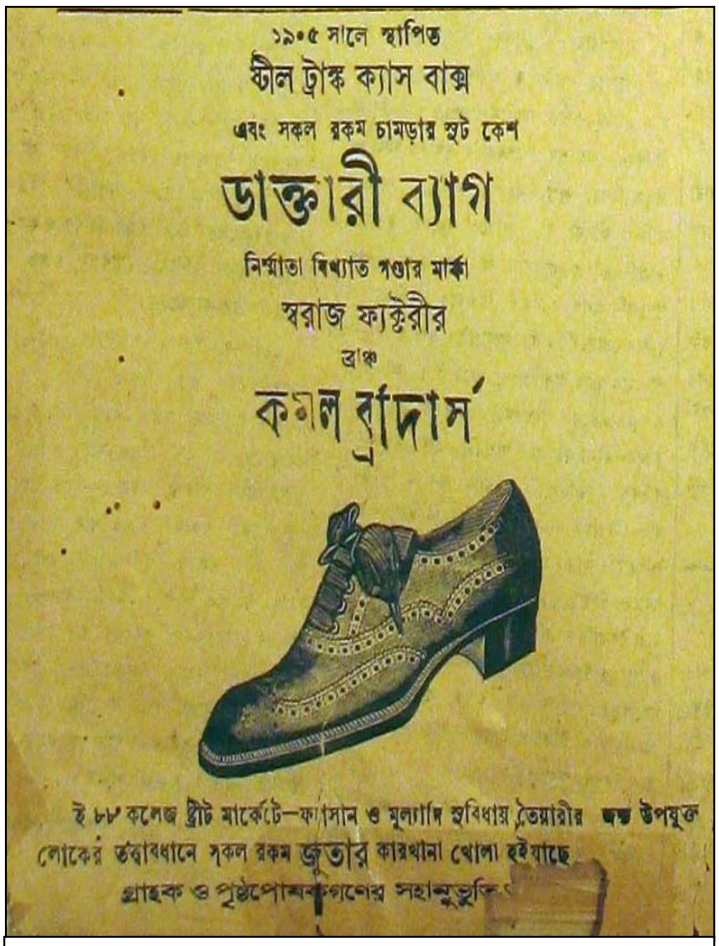
চিত্র- ৮.১৪: এস সি চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স কোম্পানীর জুতা জুতার চিত্র

[১৭৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

কমল ব্রাদার্সের জুতা ও ডাক্তারী ব্যাগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৯ ভাদ্র সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি জুতার চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'১৯০৫ সালে স্থাপিত ষ্টীল ট্রাঙ্ক ক্যাস বাক্স এবং সকল চামড়ার সুট কেশ ডাক্তারী ব্যাগ নির্ম্মাতা বিখ্যাত গণ্ডার মার্কা স্বরাজ ফ্যক্টরীর ব্রাঞ্চ কমল ব্রাদার্স।

ই ৮৮ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ফ্যাসান ও মূল্যাদি সুবিধায় তৈয়ারীর জন্য উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে সকল রকম জুতার কারখানা খোলা হইয়াছে।'[১৭৪]



চিত্র- ৮.১৫: কমল ব্রাদার্সের জুতা

[১৭৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ.০২।

গোয়ালিনী মার্কা দুধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১মাঘ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তিনটি শিশুর চিত্র দেখা যায় যাদের মধ্যখানে কনডেন্স্ড মিল্ক এর কৌটা রয়েছে। চিত্রে দেখা যায় শিশুগুলো মনের আনন্দে খেলায় মত্ত। শিশুগুলোর আনন্দ চিত্ততা যে এই মিল্কের জন্যই সম্ভব হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞাপনের বিবরণে লেখা অতি অল্প নাই বললেই চলে। এক লাইনে বলা হয়েছে= গাঢ় দুগ্ধ কাহাকে কহে? [১৭৫]



চিত্র- ৮.১৬: কনডেন্স্ড মিল্ক

গোয়ালিনী মার্কা দুধের গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ১৬ পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের *ঢাকাপ্রকাশ* সংখ্যায়। তা হলো– 'যখন দুগ্ধ হইতে দধি তৈয়ার করা হয়, তখন দুগ্ধের সমস্ত খাদ্যাংশ ও সারাংশ দুগ্ধের জলীয় ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া একত্রীভূত হইয়া ঘণ হয়। গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধকে দধি ঘণীভূত করার ন্যায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহার পদার্থহীন জলীয় অংশ বহির্গত হইয়া সমস্ত খাদ্যাংশ ও পুষ্টিকর অংশ একত্রীভূত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে অনবরত অগ্নিসন্তাপে রক্ষা করা হয়। কিন্তু গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ দধির ন্যায় অম্ল নহে পরন্ত উহা বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের ন্যায় মিষ্ট ও সরস এবং উহার সহিত চিনি মিশ্রিত আছে বলিয়া বদ্ধ টিনের মধ্যে রাখিলেও উহা কয়েক মাস যাবৎ টাটকা ও সুস্বাদু থাকে। এমন কি টিন খোলার পরও কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঠিক একই রকম টাটকা ও সুমিষ্ট থাকিবে।

গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ ক্রয় করিলে আপনি জানিবেন যে, আপনি কেবল মাত্র দুগ্ধের পুষ্টিকর খাদ্যাংশেরই মূল্য দিতেছেন। দুগ্ধে যে জল আছে তাহার মূল্য বা অধিক লাভার্থে গোয়ালা কর্ত্তৃক মিশ্রিত জলের মূল্য দিতেছেন না। শিশুর খাদ্যে, চায়ে, কাশিতে, রন্ধন কার্য্যে বা মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ার করণার্থে যদি আপনি গোয়ালিনী মার্কা

[১৭৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১ মাঘ ১৩৩৪, পৃ.০৮।

গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করেন, তাহা হইলেআপনি উহাতে আপনার আবশ্যক বা ইচ্ছামত জল মিশ্রিত করিতে পারেন অথবা আপনি উহা ভাত, রুটি বা পরোটার সহিত ব্যবহার করিলে জানিবেন যে, স্থানীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো-দুগ্ধ অপেক্ষা তিনগুণ অধিক বলশালী ও পুষ্টিকর সুস্বাদু দুগ্ধের সহিত আপনি ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন।

তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট সহ আপনার নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে আপনি একটি নমুনা টিন পাইবেন ও জানিতে পারিবেন যে গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ আপনার সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে কত প্রয়োজনীয় ওআপনার শিশুরা উহা কত পছন্দ করে।

আজই নমুনার জন্য পত্র লিখুন।

গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ, পোষ্ট বক্স নং– ৩৯৬, কলিকাতা।

গোয়ালিনী মার্কা প্রত্যেক দুগ্ধের টিনেই যে কেবল মাত্র খাঁটি গো-দুগ্ধ ও চিনি আছে, তাহা উহার প্রস্তুত কারকেরা গ্যারান্টি দিতে পারে এবং যদি কেহ উহা মিথা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ৫০০০ টাকা দেওয়া হইবে।

গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ হস্ত স্পৃষ্ট নহে।[১৭৬]



চিত্র- ৮.১৭: গোয়ালিনী মার্কা দুধ

[১৭৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৩৪, পৃ.০৮।

গোয়ালিনী মার্কা দুধের আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৬ পৌষ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবান একটি শিশু শুয়ে আছে এমন চিত্র দেখা যায় যার পাশেই রয়েছে কনডেন্সড মিল্ক এর একটি টিনের কৌটা। বিজ্ঞাপনের বিবরণে শুধু দধি তৈয়ার করিবার সময় কি হয়?'[১৭৭] কথাটি লিখিত রয়েছে।-

একই পণ্যের আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৩ পৌষ সংখ্যায়। যেখানে একটি শিশু কনডেন্সড মিল্কের দিকে তাকিয়ে আছে।



চিত্র- ৮.১৮: গোয়ালিনী মার্কা দুধ

মহেন্দ্র লাল দত্ত এণ্ড সন্স কোম্পানী ছাতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২২ মাঘ সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে অনেককগুলো ছাতার চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'প্রসিদ্ধ দেশী ছাতার কারখানা।

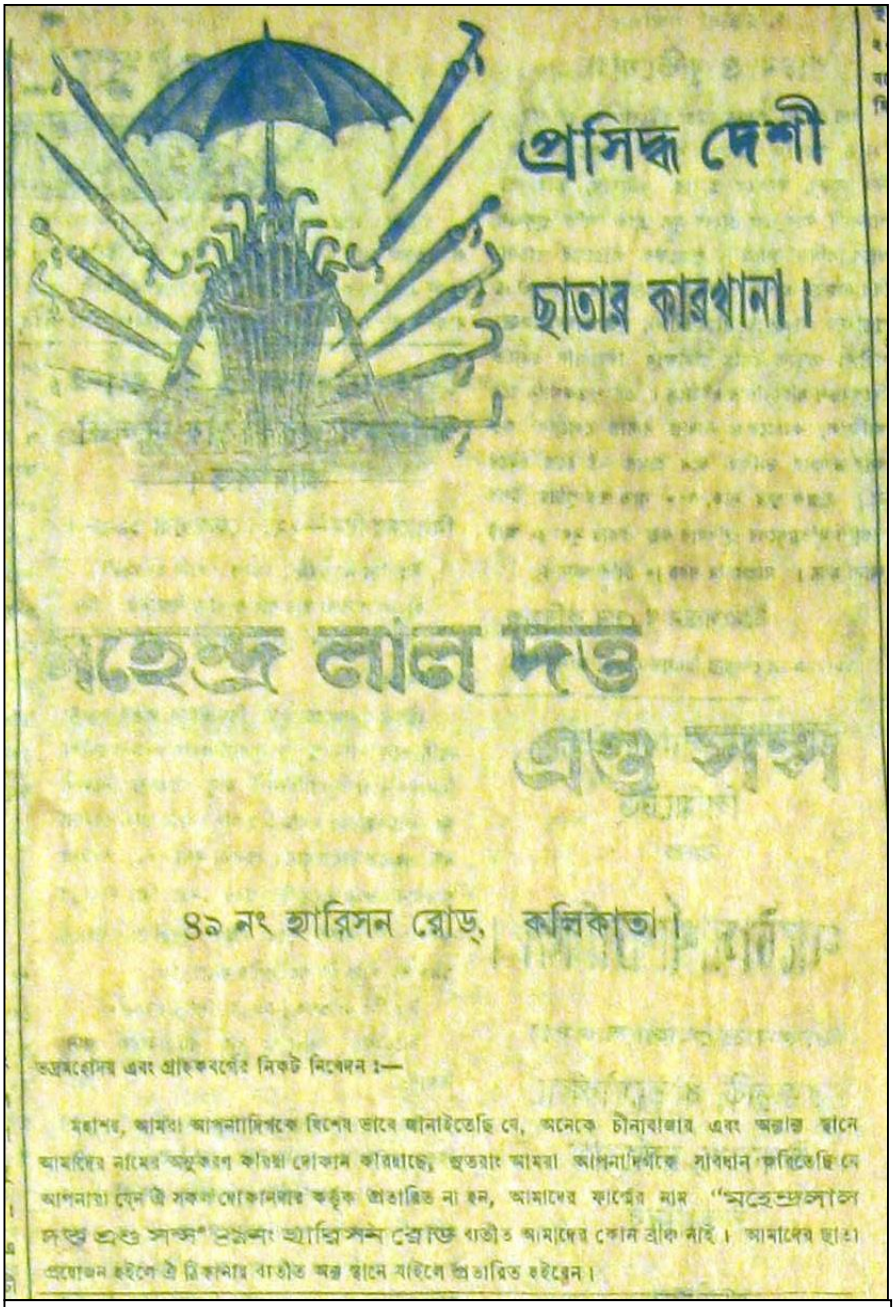
মহেন্দ্র লাল দত্ত এণ্ড সন্স

ভদ্রমহোদয় এবং গ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন:–

মহাশয় আমরা আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে জানাইতেছি যে, অনেকে চীনাবাজার এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের নামের অনুকরণ করিয়া দোকান করিয়াছে, সুতরাং আপনাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, আপনারা যেন ঐ সকল

[১৭৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৩৪, পৃ.০৮।

দোকানদার কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন, আমাদের ফার্ম্মের নাম 'মহেন্দ্র লাল দত্ত এণ্ড সন্স, ৪৯ নং হ্যারিসন রোড ব্যতীত আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। আমাদের ছাতা প্রয়োজন হইলে ঐ ঠিকানায় ব্যতীত অন্য স্থানে যাইলে প্রতারিত হইবেন।[১৭৮]



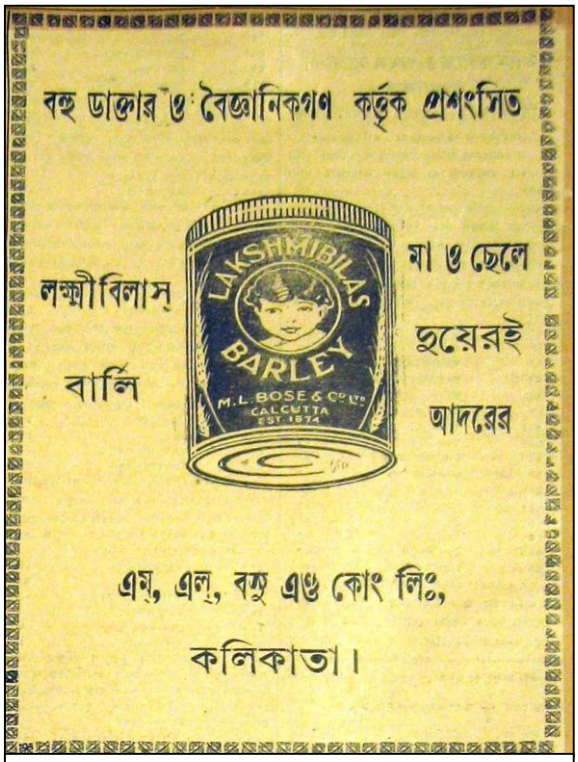
চিত্র- ৮.১৯: মহেন্দ্রলাল দত্ত এণ্ড সন্স এর ছাতা

[১৭৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ মাঘ ১৩৩৪, পৃ.০৮।

এমএল বসু এণ্ড কোং লিঃ এর 'বার্লি' নামক আরেকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৪ কার্তিক সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি বার্লির টিনের কৌটার চিত্র দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের বিবরণে অল্প কথায় বলা হয়েছে-

'বহু ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক কর্তৃক প্রশংসিত লক্ষ্মীবিলাস বার্লি। মা ও ছেলে দুয়েরই আদরের।

এম.এল বসু এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা।[১৭৯]



চিত্র- ৮.২০: লক্ষ্মীবিলাস বার্লি

হাতী বিক্রয়ের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১ লা এপ্রিল সংখ্যায়। এটি একটি চিত্রবিহীন বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'হাতী বিক্রী।

অতি সুলভ মূল্যে হাতী বিক্রী।

আমি অতি সলক্ষণাক্রান্ত একটি হাতী বিক্রী করিব। ক্রেতাগণ অতি সত্বর আমার নিকট তত্ত্ব লইবেন। কেহ দুই মাসের মধ্যে এই হাতীটি ক্রয় করিলে, অতি সুলভ মূল্যে খরিদ করিতে পারিবেন।

[১৭৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ মাঘ ১৩৪২, পৃ.০৭।

হাতীটি বয়সে খুব অল্প (এমন কি ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক নহে) উচ্চতায় কিঞ্চিদধিন ৮১/২ ফিট, জাতিতে মোখনা, কাজ কর্ম্মে সুশিক্ষিত, পরিশ্রমে অটল, চালচলনে অতি উত্তম ও শান্ত স্বভাব; এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ শরীর।

ফলত: হাতীটির তালু, দোম, নাখুন ইত্যাদি কোন বিষয়েই কোন দোষ নাই।

এমন সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত হাতী সচরাচর মিলে না। সুতরাং ভরসা করি ক্রেতাগণ এমন সুবিধা কখনও ছাড়িবেন না।

১২৯৪ ফাল্গুন

শ্রীফজলোররহমান।

ঘোড়াশাল গ্রাম,

পোঃ কালীগঞ্জ (ঢাকা)'।[১৮০]

এস. রায় এণ্ড কোং এর 'ক্রিকেট ব্যাট' পণ্যের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকাপ্রকাশ* এর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৩ অগ্রহায়ন সংখ্যায়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি চিত্রবিহীন। বিজ্ঞাপনের বিবরণে বলা হয়-

'ক্রিকেট।

বর্ষা শেষ হইতে চলিল, এখন হইতেই আপনাদের ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমরা আপনাদের জন্য সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামই আনাইয়া রাখিয়াছি। এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ মাল আমদানী করিয়াছি। একবার পরীক্ষা প্রার্থণীয়।

নকএ্যাকাইন্ট ব্যাট পুরা সাইজ নগদ মূল্য ১২ আনা।

এত সস্তায় এমন ব্যাট আর কোথাও পাইবেন না। হারকিউলিস ব্যাট পরা সাইজ নগদ মূল্য ৫ টাকা।

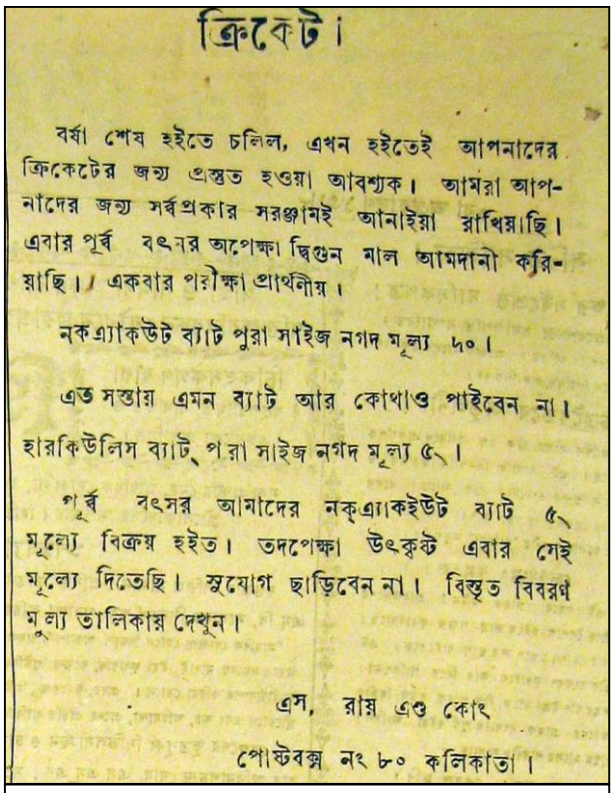
পূর্ব্ব বৎসর আমাদের নকএ্যাকইউট ব্যাট ৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবার সেই মূল্যে দিতেছি। সুযোগ ছাড়িবেন না। বিস্তৃত বিবরণ মূল্য তালিকায় দেখুন।

এস. রায় এণ্ড কোং

পোষ্টবক্স নং ৮০, কলিকাতা'।[১৮১]

[১৮০] *ঢাকা প্রকাশ*, ১এপ্রিল ১৮৮৮।

[১৮১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ অগ্রহায়ন ১৩১৮, পৃ.০৮।



ক্রিকেট।

বর্ষা শেষ হইতে চলিল, এখন হইতেই আপনাদের ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমরা আপনাদের জন্য সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামই আনাইয়া রাখিয়াছি। এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুন মাল আমদানী করিয়াছি। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নকএ্যাকউট ব্যাট পুরা সাইজ নগদ মূল্য ৮০।

এত সস্তায় এমন ব্যাট আর কোথাও পাইবেন না।

হারকিউলিস ব্যাট্ পুরা সাইজ নগদ মূল্য ৫৲।

পূর্ব্ব বৎসর আমাদের নক্এ্যাকইউট ব্যাট ৫৲ মূল্যে বিক্রয় হইত। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবার সেই মূল্যে দিতেছি। সুযোগ ছাড়িবেন না। বিস্তৃত বিবরণ মূল্য তালিকায় দেখুন।

এস, রায় এণ্ড কোং

পোষ্টবক্স নং ৮০ কলিকাতা।

চিত্র- ৮.২১: এস. রায় এণ্ড কোং'র ক্রিকেট ব্যাট

এক্ষেত্রে সরকারি আদেশও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ হওয়ার উদাহরণ বিরল হলেও কম নয়। যেমন– *ঢাকা প্রকাশ* এর যাত্রার শুরুরদিকের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়-

বিজ্ঞাপন।

অবিকল।

গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম, ৯ জুলাই ১৮৬৩ ইংরাজী।

যেহেতুক সহর ঢাকার বহুতর বাসেন্দাগণ উক্ত সহরের গলি ও সড়ক ও নরদামা ও পুষ্করিণী প্রস্তুত জীর্ণ সংস্কার ও পরিস্কার, ও আলোময় ও কদর্য্যবস্তু বারণ ও অন্য প্রকার সহরের উন্নতি সাধন মানসে ১৮৫০ সনের ২৬ আইন জারি হওয়ার বাসনায় বাঙ্গলা প্রদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে আবেদন করিয়াছেন, অতএব উক্ত সহরের সর্ব্ব সাধারণদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাহারা কি তন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত আইন জারিতে বিপক্ষ কি সপক্ষ হয়েন,

তাঁহারা উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে অদ্যকার তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে স্বীয় আপত্তি উপস্থিত করেন। ইতি।

একটিং

ম্যাজিষ্ট্রেট।

৮ শ্রাবণ, ১২৭০; ২৩ জুলাই, ১৮৬৩।[১৮২]

মজার বিষয় হচ্ছে যে, ১৯০১ সালে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার মালিকানা তথা স্বত্ত্বাধিকারী এবং মূল কার্যালয় পরিবর্তন হলে তা এই পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করেছিল। ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

ঢাকা প্রকাশের গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ এবং অপর সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান ১৩০৮ সনের আষাঢ় মাস হইতে ঢাকা প্রকাশের পূর্ব্ব মালিক শ্রীযুক্ত গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী মহাশয় ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার স্বত্ত্ব আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এখন হইতে ঢাকা প্রকাশ আমাদের কর্তৃত্তাধীনে চলিবে। আমাদের সুবিধার জন্য ঢাকা প্রকাশ অফিস ও তৎসংশ্লিষ্ট বাঙ্গলা যন্ত্র নামক ছাপাখানা শাঁখারীবাজার হইতে উঠাইয়া আনিয়া ঢাকা বাঙ্গলাবাজার ২৯২ নং ভবনে সংস্থাপিত করা হইল। এখন হইতে চিঠিপত্র মূল্যাদির মানিঅর্ডার প্রভৃতির সমস্তই শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী ২৯২ নং বাঙ্গলাবাজার ঢাকা প্রকাশ অফিস এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীরাধারমন ঘোষ ও

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী

৯ আষাঢ়, ১৩০৮; ২৩ জুন, ১৯০১।[১৮৩]

---

[১৮২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ শ্রাবণ, ১২৭০; ২৩ জুলাই ১৮৬৩; আরো দেখুন- মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), ৪৫৪।

[১৮৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ আষাঢ়, ১৩০৮; ২৩ জুন, ১৯০১।

১৮৭৭ সালের *ঢাকা প্রকাশ* এর ফেব্রুয়ারী মাসের একটি সংখ্যার বিজ্ঞাপনে 'দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী কোঃ লিমিটেড' এর মালিকানা শেয়ার বিক্রয় করার ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়-

> ঢাকা পাটুয়াটুলিতে আইনমতে রেজিস্টরিকৃত দেশীয় কাপড় বিক্রয়ের দোকান খোলা হইয়াছে। কোম্পানির প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০ টাকা। অংশ গ্রহনেচ্ছুগণ আমার নিকট পত্র লিখিলে এবং অংশ মূল্যের চতুর্থাংশ টাকা প্রদান করিলে অংশের সার্টিফিকেট পাইতে পারেন। সন ১২৮৩। ২৮শে পৌষ। [শ্রী গোপীমোহন বসাক, সম্পাদক, দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী কোঃ লিমিটেড][১৮৪]

১৯৪১ সালের *ঢাকা প্রকাশ* এর ডিসেম্বর মাসের একটি সংখ্যার বিজ্ঞাপনে 'শিক্ষক চাই' বিজ্ঞাপনটি মূদ্রিত হয়। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> শিক্ষক চাই
>
> শুভাঢ্যা গভর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত মধ্য-ইংরেজী স্কুলের জন্য একজন ভি.এম পাশ মুসলমান পণ্ডিত আবশ্যক। গুণানুসারে মাসিক বেতন ১৫ হইতে ১৭ টাকা। আবেদন প্রশংসাপত্রসহ আগামী ২রা জানুয়ারীর মধ্যে পো. শুভাঢ্যা জিলা ঢাকা এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হবে।[১৮৫]

১৯৪২ সালের *ঢাকা প্রকাশ* এর আগস্ট মাসের একটি সংখ্যার বিজ্ঞাপনে ভালো মানের দেশীয় গজারী কাঠ বিক্রয় সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়।বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়-

> গজারী কাঠ বিক্রয়।
>
> এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুরের স্বত্ব দখলীয় গড়ের নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সারবান গজারী কাঠ (১০ হাত হইতে ৪০ হাত লম্বা ও ১ হাত হইতে ৬ হাত বেড়ের) জেলা মংমনসিংহের ভালুকা থানার সংলগ্ন ঘাটে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। কাওরাইদ রেল স্টেশনের পুলের নিচ দিয়া

[১৮৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ কার্ত্তিক, ১২৭৬; ১৪ নভেম্বর ১৮৬৯; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), ২৪২।

[১৮৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ পৌষ ১৩৪৮; ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১, পৃ. ২।

প্রবাহিত নদী পথে নৌকা ভালুকা ঘাটে বার মাস যাতায়াত করিতে পারে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত কাঠ খরিদ করিতে পারেন। বিস্তৃত বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

-শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মানেজার, মহারাজা ময়মনসিংহ এষ্টেট,
ময়মনসিংহ।[১৮৬]

নবাব আছানউল্লা খাঁ বাহাদুর কর্তৃক শ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে আয়োজনকৃত আমোদ প্রমোদ উৎসব অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান ঘোষণাটি বিজ্ঞাপন আকারে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় ১৮৮১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়-

নবাব আছানউল্লাহ খাঁ বাহাদুর তাঁহার ইংরেজ এবং দেশীয় বন্ধুবর্গ ও ঢাকাস্থ জনসাধারণকে এই অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে, শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, তাঁহার সাবাগ (বর্তমান শাহবাগ) নামক বাগিচায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবেক, তজ্জন্য ঐদিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা মধ্যে উক্ত বাগিচার সকলের আগমন বাঞ্ছনীয়।[১৮৭]

একটি ব্যতিক্রধর্মী বিজ্ঞাপন ১৯৪০ সালের ঢাকা প্রকাশ সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যায় (যেমন– ৭ এপ্রিল, ৭ জুলাই, ১১ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট) প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনটির মূলভাষ্য নিম্নরূপ–

১০০ টাকা পুরস্কার

জি. ঘোষের তৈলের অত্যধিক কাটতি দেখিয়া দুষ্টগণ নানা ভাবে জাল ও নকল এবং ধোকাজনক অনুকরণ করিয়া দোকানদারগণের যোগাযোগে নিরীহ ক্রেতাগণকে ঠকাইতেছে। যিনি ধরিয়া প্রমাণ করাইয়া দিবেন তাঁহাকে ১০০ একশত টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

জি. ঘোষ

প্রোপ্রাইটার, ঢাকা।

২০ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।[১৮৮]

---

[১৮৬]*ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৯ সন; ৯ আগস্ট ১৯৪২, পৃ. ০২।

[১৮৭]*ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১;মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*,৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), ৩৬৭।

[১৮৮]*ঢাকা প্রকাশ*, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৮, ৭ এপ্রিল,৭ জুলাই, ১১ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট, ১৯৪০, পৃ. ০১।

বিজ্ঞাপনটি স্বভাবতই অন্যান্য বিজ্ঞাপন থেকে আলাদা। কেননা এটি সাধারণ প্রথাগত কোন বিজ্ঞাপন নয়। এটি জাল বা নকলকারীদের জন্য একটি সতর্কতা বার্তা হিসেবে প্রচারিত হয়।

উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ব্রাহ্মমতে যেহেতু পৌত্তলিকতা বা মূর্তি নির্মাণ করা বিরোধিতা করে সেজন্য বিজ্ঞাপনে চিত্র ব্যবহৃত হয় নাই। তবে *ঢাকা প্রকাশ* এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও যূগ চাহিদা মেটাতে পণ্যের বিজ্ঞাপন বেশি বেশি প্রচারিত হতে থাকে। একই সাথে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রথমে তারা চমকপ্রদ শিরোনাম ব্যবহার করতে থাকে এবং আরো পরে চিত্র সংযোজন শুরু করে। উল্লেখ্য যে, পণ্য কিংবা বিশেষ ঘোষণার ব্যাপক প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বহুল প্রচারিত ও পঠিত *ঢাকা প্রকাশ* ও *The Bengal Times* নামক পত্রিকাদ্বয়কে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিত। এটির বড় কারণ এই দুইটি পত্রিকাই দীর্ঘকাল সুনামের সহিত প্রকাশনা ধরে রেখেছিল।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, সংবাদপত্র সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেক্ষেত্রে এতে প্রচারিত বা প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চিত্র সমাজের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিবিম্ব হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে বিজ্ঞাপনগুলো ছিল বিবরণ প্রধান। এতে চিত্র অংকনের চেয়ে বাংলা বা ইংরেজি ফন্ট এর বড়, ছোট ও বোল্ড আকৃতি ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হতো। যা পরবর্তীতে চিত্র ব্যবহারের দ্বারা আরো সহজ হয় সংশ্লিষ্ট পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের। চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনগুলো ব্যাপকভাবে পাঠকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, চিত্র অংকনের সাথে জড়িত কে বা কারা? এই প্রশ্নের উত্তর অদ্যাবধি রহস্যাবৃত। বর্তমানে যেকোন চিত্র হোক তা কোন মানুষ বা পশুর প্রতিকৃতি কিংবা যেকোন ফিগার অংকন করলেই শিল্পীগণ তার নিচে নিজের নাম কিংবা বিশেষ প্রতীকি স্বাক্ষর করে থাকেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দুশোবছর আগে মনে হয় এই রীতির প্রচলন ছিল না। শিল্পীর সরাসরি নামতো দূরে থাক কোন বিজ্ঞাপন চিত্রেই কোন ধরণের এক বা একাধিক বিশেষ প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ বা ব্যাখ্যা দাড় করানো যেতেই পারে।

যেহেতু ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুটি সাময়িকপত্রই বেশি দিন পাঠকের মনের খোড়াক যুগিয়েছে এবং পাঠক মহুলে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। সেগুলো হলো *ঢাকাপ্রকাশ* ও *দি বেঙ্গল টাইম্‌স*। এই পত্রিকা দুটিতে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে সেগুলো কিংবা তার চিত্র মনে হয় একটি বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা অঙ্কিত হতো। হতে পারে এরা মূদ্রণ যন্ত্রের অন্য কাজে নিয়োজিত থাকতো এবং তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে চিত্রগুলো এঁকেছেন। তবে কিছু কিছু দৃশ্যের অবতারণা দেখলে মনে হবে চিত্রটিতে সুনিপূণ হাতের ছোঁয়া অবশ্যই আছে।

তৃতীয় অধ্যায়:

বিজ্ঞাপন চিত্রের আলোকে তৎকালীন ঢাকা'র আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পণ্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কাজ করেনি। বরং সেসময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সম্যক ধারণাও প্রদান করে থাকে। উনিশ শতকের পূর্ব বঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধরণ বুঝতে সাময়িকপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। উনিশ শতকের শেষার্ধের সাময়িকপত্রগুলোতে ব্যাপকভাবে ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রচার ও প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তৎকালের ঢাকায় যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান ছিল তা সহজেই অনুমেয়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদও তার সাক্ষ্য দেয়। ২ মে ১৮৬৯ সনের প্রকাশিত 'ঢাকার স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক প্রস্তাব' শিরোনামের সংবাদে উল্লেখ করা হয়- 'দিন দিন ঢাকা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ১০/১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীরর অবস্থা যেরূপ ছিল এক্ষণ আর সেরূপ নাই। আজি কালি ওলাউঠা, জ্বর, প্লীহা, বসন্ত, অর্শ্ব ও আমাশয়াদির পীড়া ইহার প্রায় নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছে। কি কি কারণে ঢাকা এই সকল রোগের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে এবং কি কি উপায়ে এস্থানের এইরূপ রোগজনকতা বিদূরিত হইয়া স্বাস্থ্যবিধায়কতা সম্পাদিত হইতে পারে, সাধারণে থাকুক, বড় বড় চিকিৎসকেরাও তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এতদর্থ কেহ কেহ এমন সকল প্রস্তাব করিতেছে, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভাবিত। ভূতপূর্ব একটিং সিবিল সার্জন আর্চার সাহেব একদা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ঢাকাকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে লইয়া যাওয়া উচিত।[১৮৯] এই একই খবরে দায়িত্বরত সিভিল সার্জন ডাক্তার কটক্লিফ সেসময়কার ঢাকার অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যথা- প্রথমতঃ দালানসকল ভাঙ্গিয়া পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণের কয়েকটি সুপ্রসশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করা হউক,তাহা হইলে নগর মধ্যে অনুক্ষণ বিশুদ্ধ বায়ূ সঞ্চালিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ নগরের আবর্জনা ও ময়লা সকল নগরের বহির্ভাগে কোন দূরবর্তীস্থানে নিক্ষেপ করার উপায় করা হউক। তৃতীয়তঃ শীতলক্ষ্যা হইতে ঢাকায় বিশুদ্ধ জল আনয়ন করিবার সুবিধা করা হউক।[১৯০] পরবর্তীতে ১৮৭০ সনে ২৪ এপ্রিল তারিখে *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় 'ঢাকার স্বাস্থ্য বিধান ও ১০ টাকা গৃহ টাক্স' শিরোনামের খবরে বলা হয়- 'ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত লায়েল সাহেব, ঢাকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ রিপোর্ট করেন। রিপোর্টে

---

[১৮৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ মে ১৮৬৯; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ.১৯৪।

[১৯০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ মে ১৮৬৯; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ.১৯৪।

বলা হয়- 'সকল স্বাস্থ্য বিধানে যে অর্থ ব্যায়ের প্রয়োজন হইবে তাহার উপায় বিধানেও ঔদাসীন্য হয় নাই। অর্থ সংগ্রহের এই কয়েকটি উপায় কারা হইয়াছে। দোলাই খালের কুতের উপস্বত্ব কমিটিতে আসিবে, বুড়ীগঙ্গার গুদাড়ার ভাড়া দ্বিগুণ (২||০ স্থলে ৫) হইবে, বাড়ীর টাক্স শতকরা ৭|| টাকার স্থলে ১০ টাকা হইবে, পায়খানার স্বতন্ত্র ট্যাক্স ধরা যাইবে, এবং সর্ব্বপ্রকার অকুলান পূরণার্থ টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে দেয়া হইবে।[১৯১] এইরকম নানাপ্রকার প্রস্তাব এবং উপায় খোঁজার চেষ্টা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকে ঢাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সিভিল সার্জনেরাই চেষ্টা করছেন যেন ঢাকার স্বাস্থ্যবিধানের উন্নয়ন হয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার রোগবালাই কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে জনসাধারণ পর্যায়ে হিন্দুধর্মীয় রীতি অনুযায়ী নামসংকীর্ত্তন আয়োজনের খবরও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এরকম 'ঢাকার কলেরা ও সংকীর্ত্তন' শিরোনামের একটি খবরে বলা হয়- " মাসাধিককাল গত হইতে চলিল, এখনো ঢাকা হইতে ওলাউঠার তিরোধান হইল না। প্রত্যুত আজি কালি উত্তরদ্বিগ্বর্ত্তী নবাবপুর প্রভৃতি স্থানে উহার প্রকোপ সমধিক পরিমাণেই লক্ষিত হইতেছে; কিছুতেই শান্তি হইতেছে না। স্থানীয় লোকেরা এই ভয়ে নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে। এক একটি দিন যায়, আর তাহার আয়ুষ্কালের এক একটি সুপ্রভাত মনে করে। নবাবপুরবাসীরা গোড়া হিন্দু ও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের বিশ্বাস, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও দেবার্চ্চনা করিলে পীড়ার শান্তি হইবে। বস্তুতঃ নামসঙ্কীর্ত্তন উহাদের ওলাভীতি কিয়ৎ পরিমাণে দমিত হইতেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে বহুসংখ্যক লোক দলে দলে মশাল হস্তে করিয়া নিজ নিজ বাটীর নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত রাজপথে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিল। শুনা যায়, দুই তিন দিন হইল, এরূপ দলে ২ সঙ্কীর্ত্তনকারী বাহির হইয়াছে- উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নামগান করিতেছে, এমন সময়ে ঢাকার কতিপয় সাহেব আরোহীর একখানি গাড়ী সে সকল লোককে সতর্ক না করিয়াই তাহাদের মধ্যদিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। নামসঙ্কীর্ত্তনকারীগণ দূর হইতে সভয়ে চীৎকার করিল, তথাপি কোচম্যান তৎপ্রতি কর্ণপাত না করা করাতে তাহারা আত্মরক্ষার্থ ক্ষণ কালের জন্য গাড়ীর গতিরোধ করিতে বাধ্য হইল। আরোহীদের মধ্যে বিচার বিভাগের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন; তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। ভীরুবাঙ্গালীরা ইতস্ততঃ অপসৃত হইল। ইহার পরদিবস হইতেই পুলিস উপস্থিত সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগকে বাধা দিয়া তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকিবেন।

নামসঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেওয়াতে লোকের ভয় ও চিন্তা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছে, এতদিনে আমাদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ হইল। অনেকের প্রত্যাশা ছিল, রাজপুরুষগণ এই উৎকট ব্যাধিশান্তি বিষয়ে

[১৯১] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ এপ্রিল ১৮৭০/ ১২ বৈশাখ, ১২৭৭; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ.১৯৮।

প্রজাদিগের সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিতেই উদ্যত হইতে পারে, তদানুষ্ঠানে বাধকতাই করিতেছেন। কোনও খৃষ্টানসম্প্রদায় রোগাশঙ্কা বা অন্যকারণে দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি কেহ তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিত, তাহা হইলে যে ব্যবস্থা প্রয়োজিত ও যে উপায় অবলম্বিত হইত, এই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে কি সেই ব্যবস্থার বিনিয়োগ ও তদুপায় অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই? আমরা নবাবপুরবাসী গন্য, মান্য, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের পক্ষ হইতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমুচিত প্রতিবাদ করুন। অবশ্যই এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রশমন হইবে।'[১৯২]

উনিশ শতকের শেষার্ধের সাময়িকপত্রে রোগব্যাধি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে ম্যালেরিয়া রোগের ঔষুধের বিজ্ঞাপন বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে 'পঞ্চতিক্ত কষায়' ও 'মেপাক্রিন'র বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এক্ষেত্রে ঢাকার পরিবেশ, রোগবালাই কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক সময়কার ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলরের বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনা মতে, 'এ অংশের মাটিতে উদ্ভিদরাজির বর্ধনক্রিয়া, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা প্রভৃতির এরূপ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের পক্ষে খুবই অনুকূল। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ম্যালেরিয়ার এ বিষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে এখানে সৃষ্টি হয় এবং রোগের সমস্ত রকম জীবানুর মধ্যে এটি এমন একটি, সবচেয়ে ব্যাপক হারে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ছড়ায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমগ্র দেশেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কিন্তু কোন কোন স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ম্যালেরিয়া বিস্তারের পক্ষে বেশি সহায়ক।[১৯৩]

এদেশের জলবায়ু কিভাবে ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটায় তা জেমস টেলর বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে- যে সমস্ত নদনদী সব ক'টি অঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে সেগুলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গা নদীর শাখা-প্রশাখা। মে মাসে এসব নদনদীতে সর্বনিম্ন উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যে, ঐসময়ের পূর্বে কয়েক সপ্তাহব্যাপী, আংশিক পরিমাণে জলপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি সময় না আসা পর্যন্ত পানির উচ্চতায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যতিরেকে দেশের এরূপ প্লাবিত অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতঃপর বন্যার পানি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং নদ-নদীর উচ্চতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কেন্দ্রাঞ্চল থেকে পানি নিষ্কাষিত হয়ে যেতে থাকে। ধান ক্ষেতের পানি সাধারণত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে জলাভূমির পানিতে দেখা দেয় কালো রঙ। এটা বিশেষ করে জেলার উত্তরভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

[১৯২] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮২/ ১৬ আশ্বিন, ১২৮৯; উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ.৫০৯।

[১৯৩] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২৪৭।

শহরের কাছাকাছি অবস্থিত খালনালা ইত্যাদির নির্গত পানি রঙের দিক থেকে দেখতে চায়ের তরল ক্বাথের বা তার অনুরূপ। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে বিলঝিলে উদ্ভিদ ধারক পদার্থসমূহের উপর লৌহজাতীয় দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া। যার ফলে পাকস্থলিতে অসুখ আকারে পীড়া দেখা দিতে শুরু করে এবং শহরের স্থানীয় অধিবাসীরা এর একান্তভাবে বুড়িগঙ্গার পানির সংমিশ্রণকেই দায়ী করে থাকে। অতঃপর বিভিন্ন জায়গার পানি বের হতে শুরু করে এবং স্রোত যত ক্ষীণ হয়ে আসে, পানির রঙ ততই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতে থাকে। অবশেষে ধানগাছ ও অন্য জলজ উদ্ভিদ, আগাছা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে গিয়ে সংযুক্ত জড়ো স্তুপে পরিণত হয় এবং শেষোক্ত বস্তু থেকে উৎকট দুর্গন্ধ নির্গত হয়, যা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের জন্ম দেয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের শেষ অবধি ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপক আকারে বিরাজ করতে থাকে। এসময় পচা গলা নানা বস্তু, বা দুর্গন্ধযুক্ত কাদা পানি ও মরা উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা ইত্যাদি- এ রোগের উৎপত্তির পক্ষে অতিরিক্ত অভিসম্পাতরূপে দেখা যায়।অতঃপর, আর্দ্রতার সঙ্গে মাটির সম্পৃক্তির ফলে এবং তা পচনশীল ও ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থের ঘনস্তর দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ায়, এসময়ে একটি নিস্তব্ধ আবহাওয়া বা গুমোট পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা জলাভূমি, বিলঝিল ইত্যাদির গলিত পদার্থ থেকে নির্গত দূষিত বাষ্পাদ ছড়ানোর কাজে ব্যাপক পরিমাণে সাহায্য করে। সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময়, মাঝামাঝি ধরণের ঝড় বা ঝড়ো আবহাওয়ার কিছু সময় পূর্ব থেকে, বাতাস হাল্কা ও পরিবর্তনশীল হয় এবং বছরের অন্য যে কোন সময় অপেক্ষা অধিক শান্ত থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দিনের বেলা আকাশ সাধারণত মেঘমুক্ত থাকে, উত্তাপ প্রচণ্ড হয় এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাটিস্থ পানির বাষ্পীভবন শুরু হয়। অন্যদিকে, ঘনীভূত বাষ্প থেকে সৃষ্ট প্রচুর শিশিরকণা রাতের বেলায় ঝড়তে থাকে; ফলে রাত্রিকাল কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হয়। এসব কিছুর ফলে, অন্যান্য সময় অপেক্ষা তখন এমন একটি মুহূর্তের সৃষ্টি হয় যখন ম্যালেরিয়া তার প্রচণ্ডতম শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে ক্রিয়া করতে থাকে।[১৯৪]

উনিশ শতকে রোগ বালাই সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, 'এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, উদরাময়, কোরণ্ড, গোদ এবং চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। ঢাকা শহরে গোদ ও কোরণ্ড রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। কূপোদক পানি নাকি এই সমুদয় রোগ উৎপত্তির প্রধাণ কারণ। ১৮১৭ খ্রি. অব্দে যশোহর অঞ্চল হইতে এই জেলায় কলেরা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। জলের কল স্থাপনের পূর্বে ঢাকা শহরে কলেরার প্রকোপ খুব বেশি ছিল। ১৮৩৭ খ্রি. অব্দে এই জেলার উত্তরাংশে গোমড়ক আরম্ভ হয়। তাহাতে বহু সংখ্যক গো কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে উহা পুনরায় আরম্ভ হয়। পূর্বে বসন্ত রোগের প্রকোপ্র যথেষ্ট উপলব্ধি হইত।[১৯৫]'

[১৯৪] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২৫২।
[১৯৫] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৫।

উল্লেখ্য, ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ হিসেবে জেমস টেলর সাহেব অস্বাস্থ্যকর ধানক্ষেত, বাড়ির সন্নিকটস্থ পাট ও শন পচানো পুকুর কিংবা আবদ্ধ পানি ব্যবহার ও পান করা রোগব্যাধির বড় উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে ম্যালেরিয়া ছাড়াও ঢাকায় সবিরাম জ্বর, গোদ ও গলগণ্ড, প্লীহা, রক্ত আমাশয় ও উদারাময়, বাতরোগ,গুটিবসন্ত ও অন্যান্য চর্মরোগ, চোখ ওঠা, নাকরা, গর্মিরোগ বা সিফিলিস, বদহজমী রোগ, অন্ত্রকীট, জলাতঙ্ক, মৃগীরোগ, অসাড়তা ও সন্ন্যাসরোগ বা অঙ্গবিকৃতি, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ ডাক্তার জেমস টেলর সাহেব ঢাকায় সিভিল সার্জন থাকা অবস্থায় চিহ্নিত করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের ঢাকা শহরের উপর্যুক্ত নোংড়া, আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং যত্রযত্র কলেরা, ম্যালেরিয়া, মহামারিসহ নানাবিধ রোগ শোকের বিপরীতে তৎকালীন ঢাকা কতটুকু স্বাস্থ্যসেবা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল তা আলোচনা বোধ করি মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। *ঢাকার প্রথম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- কোম্পানী আমলে সাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে শাসকদের কোন দায়দায়িত্ব ছিল না। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। ঐ সময় স্বাস্থগত দিক থেকে ঢাকার অবস্থা ছিল শোচনীয়। সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব না থাকায়, সাধারণের চাঁদায় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব যতটা পালন সম্ভব তা করা হতো। ঢাকা শহরে চিকিৎসার জন্য যে কটি সংস্থা ছিল তা হলো-

১. একটি ছোট হাসপাতাল যেখানে সংকুলান হতো মাত্র চল্লিশ জন রোগী। ১৮০৩ সালে কলকাতার দেশীয় হাসপাতালের শাখারূপে তা স্থাপন করা হয়েছিল। হাসপাতালটি কিন্তু পরিচালিত হতো সাধারণের দেয়া চাঁদার একটি ফাণ্ডের সুদ থেকে। তহবিলে জমা ছিল মাত্র বাইশ হাজার টাকা।
২. চকবাজারের কাছে 'লুনাটিক অ্যাসাইলাম' বা পাগলা গারদ এবং জেল হাসপাতালে।
৩. সামরিক হাসপাতাল। সামরিক হাসপাতালে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বিতীয়টি ছিল বিশেষ হাসপাতাল।[১৯৬]

ঢাকার প্রথম গ্রন্থ প্রণেতার দেওয়া উপর্যুক্ত তথ্যগুলো ১৮৪০ সালে প্রকাশিত তৎকালীন সিভিল সার্জন জেমস টেলরের বর্ণনার অনুলিপি বলেই প্রমাণিত হয়। তবে *ঢাকার প্রথম* গ্রন্থ প্রণেতার দাবি হাসপাতালটি শুধু সাধারণের চাঁদায় পরিচালিত হতো কথাটি ঠিক নয়। কারণ জেমস টেলর বর্ণনা করছেন যে, হাসপাতালটি সরকার থেকে মাসিক ১৫০ টাকা অর্থ সাহায্য ও কিছু পরিমাণ ঔষধপত্র সরবরাহ এবং শহরের ইউরোপীয় ও দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে চাঁদা বাবদ তোলা ২২,০০০ টাকার সুদ থেকে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।[১৯৭]

[১৯৬] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭), পৃ. ১৮৪।
[১৯৭] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২৭১।

উনিশ শতকের ঢাকায় কিধরণের বা কত প্রকারের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সে সময়কার সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রে। চিকিৎসা বিষয়ক চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপন নং ১.১ এ হরিণ মার্কা চালী রস, ১.২ নং বিজ্ঞাপনের 'কামদেব মার্কা বৃষ্যযোগ', ১.৩ নং বিজ্ঞাপনের 'গনেশ মার্কা যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধচূর্ণ', ১.৭ নং বিজ্ঞাপনের 'অ্যাজমামিস্ট ও স্পার্মাটোরিয়া স্পেসিফিক', ১.৮ নং বিজ্ঞাপনের 'অশোকারিষ্ট', ১.৯ নং চিত্রের 'অমৃতবিন্দু সালসা', ১.১১ নং বিজ্ঞাপনের 'মেওরেস', ১.১৫ নং বিজ্ঞাপনের 'বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়', ১.১৬ নং বিজ্ঞাপনের 'পালস ম্যালেরিয়া মিকশ্চার', ১.১৭ নং বিজ্ঞাপনের ডাক্তার এস.কে. বর্ম্মণের 'এণ্ড কিওর', ১.২৫ নং বিজ্ঞাপনের কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের 'অমৃতবল্লী কষায়', ১.২৮ নং বিজ্ঞাপনের 'পঞ্চতিক্ত বটিকা', ১.৩০ নং বিজ্ঞাপনের কবিরাজ কালীপদ দে'র 'আশ্চর্য্যমলম', ১.৩৭ নং বিজ্ঞাপনের সাধনা ঔষধালয় প্রভৃতি চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সাধারণভাবেই মনে হয় উনিশ শতকের ঢাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা সেসময়কার ঢাকায় কবিরাজী ঔষধের বিকল্প পাওয়াও দুষ্কর ছিল। তবে আয়ুব্বের্দীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা এদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

আয়ুব্বের্দীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার শুরু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। আদিম মানুষ রোগবালাই ও অন্যান্য দুর্যোগকে স্রষ্টার অভিশাপ, শরীরে ভূতপ্রেতের অশুভ আছর বা দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাবের ফল মনে করত। পরবর্তী কালের মানুষ চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদির রোগের নিরাময়ে ব্যবহার করে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞান নামে পরিচিত। আত্রেয় (প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে), চরক, সুশ্রুত ও ভগবত ছিলেন আয়ুর্বেদের বিশ্রুত বিশেষজ্ঞ। প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষকরূপে পরিগণিত আত্রেয় বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানকালেও আয়ুর্বেদের অন্যতম নাম চরক ছিলেন বৌদ্ধরাজা কণিষ্কের রাজচিকিৎসক (২০০ খ্রি.)। চরকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম *চরক-সংহিতা*। বারাণসীর বাসিন্দা সুশ্রুত ভারতীয় শল্যচিকিৎসার আকরগ্রন্থ *সুশ্রুত-সংহিতা* লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ ভগ্ন বা স্থানচ্যুত অস্থিসন্ধির চিকিৎসা, শরীরের অর্বুদ (টিউম্যার), হার্নিয়া ও চোখের ছানি অপসারণে দক্ষ ছিলেন। ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্রমে অবনতি ঘটতে থাকে। পাঠান ও মুঘল রাজাদের আনুকূল্যে বিকশিত ইউনানি তিবিব চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের স্থান দখল করতে থাকে। এভাবে আঠারো শতকে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকাল পর্যন্ত ইউনানি তিবিব চিকিৎসার প্রসার অব্যাহত থাকে। দিল্লি, আগ্রা, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ এসব নগরকে কেন্দ্র করে ইউনানি চিকিৎসা বিকশিত হয়েছিল। ১৮১০ ও ১৮৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভারতে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং

এখনও এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে'।[১৯৮] অর্থাৎ আয়র্বেদীয় চিকিৎসা অনেক পূর্বকাল থেকেই এতদ্বাঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অবশ্য ঢাকায় আয়ুর্বেদের ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে এবং যার নাম ছিল 'শক্তি ঔষধালয়'। আরেকটি ঔষুধ কারখানা যা এখনো জনপ্রিয় তার নাম সাধনা ঔষধালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে।[১৯৯]

অন্যদিকে ১.২২ নং বিজ্ঞাপনের 'ডি উইটের কিডনী এবং ব্লাডার পিল', ১.৩৯ নং বিজ্ঞাপনের ম্যালেরিয়ার ঔষধ 'মেপাক্রিন' প্রভৃতি প্রমাণ দেয় উনিশ শতকের ঢাকায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক সূত্রও সেদিকেই সাক্ষ্য দেয়। জানা যায়, 'বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে। প্রাথমিক অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। এদেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা দক্ষ ইংরেজ চিকিৎসক নিয়োগের এবং স্বাস্থ্যখাতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮৫৯ সালে বহু বেসামরিক লোক ও সেনা সদস্যের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়েল তদন্ত কমিশন ভারতে পাঠানো হয়। কমিশন প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে একটি করে জনস্বাস্থ্য কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। ১৮৬৪ সালে বোম্বে, মাদ্রাজ ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটির জন্য প্রতিটি ৫ সদস্যের ৩টি স্যানিটারি কমিশন গঠিত হয়। সিভিল সার্জন[২০০]রা পদাধিকারবলে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। ১৮৬৯ সালে মেডিকেল অফিসার পদের নাম বদলে স্যানিটারি কমিশনার রাখা হয়। সরকার ওই বছরই কেন্দ্রে ও অন্যান্য রাজ্যে কয়েকজন স্যানিটারি নিযুক্ত করে। ১৮৭৩ সালে আইনের মাধ্যমে জন্মমৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৮০ সালে গুটিবসন্তের টিকা নেওয়ার জন্য আইন এবং ১৮৮১ সালে প্রথমবারের মতো ভারতীয় শিল্পকারখানা আইন চালু হয়। ১৮৯৬ সালে হাজার হাজার লোক প্লেগ রোগে মারা যায় এবং সরকার একটি পেগ কমিশন গঠন করে। ১৮৯৭ সালে সংক্রামক ব্যাধি আইন ঘোষিত হয় এবং ১৯০৪ সালে পেগ কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশন জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলি পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার স্যানিটারি কমিশনার জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পায় এবং সংস্থার অফিস সার্জন জেনারেলের

---

[১৯৮] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৫২।

[১৯৯] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৫২।

[২০০] সিভিল সার্জন পদটি ঢাকার জন্য নূতন নয়। কারণ ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, সিপাহী বিপ্লবের ষোল বছর আগে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলের শেষ পর্যায়ে ডাঃ জেমস টেলর সাহেব ঢাকায় আসেন। তিনি ছিলেন ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন। এখানে তিনি দীর্ঘ আটবছর কাল অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনও বিভিন্ন সরকারী অফিসের দলিল দস্তাবেজ থেকে, কখনও সর্বশ্রেণির লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নানাভাবে, এদেশের নানা তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কাজ তিনি কোম্পানী সরকারের আদেশ ক্রমেই সম্পন্ন করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে অবস্থানরত মেডিকেল বোর্ডের সচিব জেমস হ্যাসিনসনের নিকট ঢাকার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (*A Sketch of the Topography and Statistics of Dhaka*) পেশ করেন। যা ১৮৪০ সালে মিলিটারী অরফান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। স্যানিটারি কমিশনার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ শুরু করে।[২০১] এভাবে ঢাকায় প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ফর্মূলার সাথে জার্মান হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি এতদ্বাঞ্চলে যাত্রা শুরু করে উনিশ শতকের সূচনা থেকেই এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। তবে জনপ্রিয়তার জন্য সব চিকিৎসা পদ্ধতিকেই প্রচার ও প্রসারে দিকে মনোযোগী হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে পণ্যের সহজ প্রচারের জন্য বহুল প্রচারিত সাময়িকপত্র মাধ্যম বেছে নিয়েছে বলেই মনে হয়। ফলে নানাবিধ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমস্যায় জর্জরিত ঢাকার অধিবাসীদের জন্য বিজ্ঞাপনে কিছু সমস্যার সমাধান কিংবা কোন ঔষুধ সেবন করিলে রোগমুক্তি ঘটবে সে সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্র ব্যবহৃত হবে তা স্বাভাবিক হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

বিজ্ঞাপনে উৎকীর্ণ চিত্রগুলোর চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি নূতন কোন ধরণের পোষাক এই অঞ্চলে আগমন করছে বা করতে যাচ্ছে তার ধারণাও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অনাথবন্ধু চিকিৎসালয়ের বৃষ্যযোগ বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.২) দেখা যায় কামদেবতা হাতে তীর ধনুক হাতে নিয়ে শিকারীর দিকে তাক করে আছেন। যার দেহ ঢিলেঢালা ও সেলাইবিহীন ধূতি জাতীয় পোশাকে আবৃত। এরকম ঢিলেঢালা এক বা দুইখণ্ডের পোশাক এর ব্যবহার বেশি দেখা যায় স্পার্মাটোরিয়া স্পেসিফিক বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.৬), কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড এর অশোকারিষ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.৮), শ্রীকিশোরীলাল জৈনীকৃত এর তাম্বুল বিহার পণ্যেও বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৩), ডি উইটের কিডনী এবং ব্লাডার পিল এর বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.২০, ১.২১, ১.২৩, ১.৩০, ৪.৩, ৪.৭) প্রভৃতি চিত্রে।

উপর্যুক্ত পোষাক পরিচ্ছদগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্ম কাজের বলেই ধারণা করা যায়। এক্ষেত্রে ঢাকায় যে একদা বয়নশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঢাকা বহুকাল পর্যন্ত মসলিন কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ছিল জগৎজোড়া সুনাম। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, প্লিনী মিসর ও আরবদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলার মসলিনের কথা উল্লেখ করেন এবং *Circumnavigation of the Erythrean Sea* নামক গ্রন্থের লেখক এসব বস্ত্রের সূক্ষ্মতা, অত্যুৎকৃষ্টতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দেন। উক্ত গ্রন্থ আরিয়ান নামীয় জনৈক মিসরীয় গ্রীক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল এবং এতে কয়েক প্রকার ভারতীয় মসলিন বস্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে, যা এতদ্দেশীয় বাণিজ্যিক নামে পরিচিত ছিল। উৎকৃষ্ট বাংলা মসলিনের নামকরণ করতে ব্যবহৃত শব্দ 'কার্পাসাস' নিঃসন্দেহে সংস্কৃত 'কার্পাস' কিংবা হিন্দি 'কাপস' তুলা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, তৎকালে সুতী, শন কিংবা 'এসভেস্টাজের' তৈরি সকল প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র বুঝাতে প্লিনীর সময়ে "কাপাসিয়াম" বা 'কার্পাসিয়ান' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। শব্দটি অবশ্য এরিয়ান ও মিসরীয় বণিকরা যেভাবে ব্যবহার করতেন, তার উৎপত্তি হয়েছিল খুব

[২০১] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৫২।

সম্ভবত 'কাপাসিয়া' নামক স্থান থেকে, যে স্থান থেকে এ সকল মসলিন বস্ত্রাদি রপ্তানি করা হতো।[২০২] এসম্পর্কে আরো জানা যায়, নবম শতকে দুজন মুসলমান পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণেও ভারতীয় সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রেও উল্লেখ আছে। এদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু পরিবেশের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে একথা পরিষ্কার মনে হয় যে, তারা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রেও কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। দেশের রাজার অধীনে বহুসংখ্যক হস্তী ও প্রচুর ধন-সম্পদেও কথা উল্লেখ কওে পর্যটকদ্বয় বলেন, এ দেশে তারা এরূপ অসাধারণ নৈপূণ্যের সঙ্গে সুতী বস্ত্রাদি তৈরি করে যে অন্য কোথাও এধরণের বস্ত্র পরিলক্ষিত হয় না। এসকল পোশাক-পরিচ্ছদ বেশীর ভাগই গোলাকার এবং এরূপ সূক্ষ্মভাবে বুনানো যে, তা মাঝারি ধরণের একটি আংটির ভিতর দিয়ে টেনে বের করা যায়।[২০৩] স্বর্ণ-রৌপ্য, আগরকাষ্ঠ ও ভোঁদড়ের চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তারা ঘোড়ার জিন ও বাড়িঘরের আসবাবপত্র তৈরি করে এবং এ সমস্ত দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কমমূল্যেও মুদ্রা হিসেবে এদেশে কড়ির প্রচলন আছে।

ঢাকাই মসলিন বুনোনির স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য্য ও সুক্ষ্মতায় পৃথিবীর যে কোন অংশে তাঁতের তৈরি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্রেও চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ১৮৩৬ সালে ড. উরে লিখেছেন- ঢাকায় মসলিন বস্ত্র এবং সুতো এখনও তৈরি হচ্ছে, যার নিকট ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে এবং এই দক্ষতা এমনই যে, একজন সুবিজ্ঞ বিচারকও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এটা তাঁর ধারণার বাইরে- কিভাবে বিলাতের তৈরি সূক্ষ্মতম বস্ত্র অপেক্ষাও বহুগুণে সূক্ষ্মতর মসলিন সুতা মাকুতে তৈরি করা যায় এবং পরে তা' বুনানে সম্ভব হয়।[২০৪] এই মসলিন তৈরির জন্য প্রধান কাঁচামাল হলো দেশীয় তুলা হতে প্রস্তুত বিশেষ এক প্রকার সূতা। তবে ব্রিটিশ আমলের অন্যান্য মোটা কাপড় তৈরির জন্য ঢাকায় মীর্জাপুর ও আরাকান থেকে তুলা আমদানি করা হতো বলে জেমস টেলর মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতে- মীর্জাপুর থেকে আমদানি করা তুলা থেকে নিম্নমানের বাপ্তা, হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালী বস্ত্রেও সুতা কাটা হয়ে থাকে। মীর্জাপুরের তুলার পরেই আরাকানী তুলার স্থান। এ তুলা সামান্য পরিমাণে আমদানি করা হয়, কিন্তু কার্যত উৎকৃষ্ট মসলিন উৎপাদনের জন্য তা কখনও ব্যবহৃত হয় না। গারো ও পার্বত্য ত্রিপুরার ভোগা তুলা শুধু সবচেয়ে মোটা ধরণের কাপড়-চোপড় তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জেলায় ইংল্যাণ্ডের পাকানো সুতা আসার সময় থেকে অবশ্য এসকল বিভিন্ন প্রকার তুলা আমদানি ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানের পরিমাণ সম্ভবত ১৭৮৭ সালে আমদানিকৃত তুলার পরিমাণের এক-ষষ্ঠাংশও হবে না।[২০৫]

---

[২০২] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১১২-১১৩।
[২০৩] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১১৩।
[২০৪] Andrew Ure, *The Cotton Manufacture ofGreat Britain;* উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১১৪।
[২০৫] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১১৫।

বস্ত্র তৈরি যারা করতো তাদেরকে তাঁতী বলা হয়। উনিশ শতকের ঢাকার বিভিন্ন স্থান যেমন ডেমরা, সোনারগাঁ প্রভৃতিতে তাঁতীদের বসবাস ছিল বলে জেমস টেলর তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা এরূপ- অধিকাংশ তাঁতীই হিন্দু। এরা ঢাকা, ডেমরা, তীতবদ্ধি, জঙ্গলবাড়ী ও সোনারগাঁয়ে প্লেন বা সাদা মসলিন তৈরি করে। সোনারগাঁয়ে মুসলমান তাঁতীদেও সংখ্যা অধিক। এরা জামদানী মসলিন বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরণের কাপড় চোপড় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তৈরি করে থাকে। এদেরকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাক্রমে যোগী ও জোলা নামে অভিহিত করা হয়। বস্ত্র বয়নকালে কখনও দু ইবা তিন গজের অধিক বুনট অনাবৃত থাকে না। শানান মসলিনের জন্য ব্যবহৃত মাড়ে সামান্য পরিমাণ প্রদীপের কালি মিশানো হয়ে থাকে; ফলে তাঁতীর ব্যাখ্যানুযায়ী শাড়ীর নাম 'আধো-কালো' বা 'ক্ষীণ আলোর সন্ধ্যা' ইত্যাদি রাখা হয়েছে।[২০৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত ও আলোচিত 'তাম্বুল বিহার' শিরোনামের বিজ্ঞাপন চিত্র (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ১.১৩) দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সময়ে ঢাকায় পান ও সুপারির চাষাবাদ হতো এবং তাম্বুলী সম্প্রদায় নামে এক পেশাজীবী শ্রেণির বসবাস ছিল। জেমস টেলরের বর্ণনায় এরূপ মন্তব্যেও সত্যতা পাওয়া যায়। এই জেলায় সুপারির চাষাবাদ সম্পর্কে জেমস টেলরের বর্ণনা মতে- 'তিন প্রকারের পান (Piper Betel) এখানে (ঢাকায়) জন্মে। এতগুলোর মধ্যে এক প্রকার জেলার সর্বত্র সাধারণভাবে উৎপন্ন হয়। এলাচি ও কর্পুরি নামে অপর দুপ্রকার (এগুলোর উৎকৃষ্ট সুগন্ধির জন্যই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে) পান কেবল সোনারগঞ্জেই চাষ করা হয়।[২০৭] অন্যদিকে, সুপারি জেলার দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এ ফসল জমির মালিকদেও জন্যে যথেষ্ট অর্থের জোগান দেয়। ত্রিপুরা জেলায় মেঘনার পূর্বতীরেও এর যথেষ্ট আবাদ হয়ে থাকে। শেষোক্ত এলাকায় প্রতি বিঘা জমিতে ৭০০ গাছ রোপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জেলায় (ঢাকা) গাছ রোপন করা হয় বাড়ির অথবা বাগানের চতুর্দিকে ঘিরে। আট বছর বয়স হতেই গাছ ফল দিতে শুরু করে এবং একটানা ষোল বছর পর্যন্ত ভাল ফলন দিতে থাকে। তারপর ফলন হ্রাস পায়। বয়সানুসারে গাছের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে গড়ে একটি গাছের মূল্য হবে হবে প্রায় আট আনা। নভেম্বও মাসের লোক দ্বারা গাছ থেকে সুপারি পাড়া হয়। মাটিতে না নেমেই এক গাছ থেকে আরেক গাছে গিয়ে সুপারির ছড়া ছিঁড়ে নেওয়া হয়ে থাকে। এই সব সুপারি পরে রোদে কয়েকবার শুকাতে হয় অতঃপর মাটিতে বসানো একখণ্ড বাঁশের উপওে রেখে সুপারির খোসা ছাড়ানো হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে চাকুর ন্যায় তীক্ষ্ণ বাঁশের প্রান্তভাগের উপর দিয়ে সুপারি টেনে নিতে হয়। এ কাজ দক্ষ লোকে সাধারণত দুহাতে অথবা একই সময়ে এরূপ দুটো বংশ যন্ত্রেও সাহায্যে কাজ করতে পারে এবং একদিনে সে প্রায় ৩৬০০ টি সুপারির খোসা

[২০৬] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১২২।
[২০৭] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৯২

ছাড়াতে পারে। রংপুর, আসাম ও আরাকানে ঢাকার সুপারি রপ্তানি করা হয়। এসকল স্থানে খোসাসহ সুপারি পাঠানো হয়ে থাকে।[২০৮]

উল্লেখ্য যে, পান-সুপারি চাষাবাদ বিশেষ করে বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদেরকে জেমস টেলর 'তাম্বুলী সম্প্রদায়' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তবে এধরনের ব্যবসায়ীগণ যে শুধু পান-সুপারি বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন তা নয় বরং বরেন্দ্র সাউদের ন্যায়, তেপাল্লির ব্যবসা অনুসরণ করে এবং শহরে তৈল, খাদ্রশস্য, লবণ ইত্যাদি বহু জিনিসের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতো বলে টেলর সাহেবের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর চরিত্রে গায়ের পোশাক বিশেষ করে নারী চরিত্রায়নে পোশাকে বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট ফুলের নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরকম নকশাযুক্ত ফুলের পোশাক দেখা যায় শ্রীকালিপদ দে কবিরাজ কর্তৃক উদ্ভাবিত আশ্চর্য্য মলম নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.৩০)। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আশ্চর্য্য মলম' চক্ষুরোগের চিকিৎসা জগতে যূগান্তর আনিয়াছে। যদি ব্যবহার না করিয়া থাকেন তবে অদ্যই ব্যবহার করিয়া ইহার আশ্চর্য্য ফল লাভ করুন[২০৯]। চিত্রে দেখা যায় নানারকম গহনাবৃত এবং ফুলেল নকশাঙ্কিত শাড়ি পরিহিত এ নারী ডান হাত দিয়ে উপরের দিকে একটি চক্ষুকে নির্দেশ করছেন অন্যদিকে বাম হাত দিয়ে অষ্টকোণাকার ছোট টেবিলের উপর রাখা একটি ঔষধের কৌটার দিকে নির্দেশ করছেন। কাপড়ের উপর ফুলসহ নানা রকম নকশা করার কাজ দেখে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় বয়ন শিল্পের সাথে সূচীশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যা জেমস টেলর বর্ণনাতেও পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনায় জানা যায়, মুসলমানদের মধ্যে এই সূচী শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিশেষ করে মসলিন তৈরিতে হিন্দু তন্তুবায়গণ তাঁতে যে নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন, মুসলমানগণও সূঁচ-সুতো দিয়ে পুরোপুরি একই রকম নৈপূণ্যেও পরিচয় দিয়ে থাকেন। এছাড়া ছিঁড়ে যাওয়া বা যেকোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ মসলিন কাপড় মেরামত করা, ছাপমারা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্রে বস্ত্রেও শিরোনাম তোলা ইত্যাদি কার্যে রিফুকারগণ নিয়োজিত থাকতো বলে জানা যায়। সেসময় রিফুকারগণ এতই দক্ষ ছিল যে তারা একটি সম্পূর্ণ একটি মসলিন কাপড়ের জমিন থেকে দীর্ঘ একটি সুতা বের করে সেখানে নতুন করে একই মানের একটি সুতা নিখুঁতভাবে চালিয়ে দিতে পারতেন। তবে এই কাজের সাথে জড়িত শিল্পীরা আফিমখোর হতেন বলে জেমস টেলর মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, মসলিন বস্ত্রাদিতে ফুল তোলার কাজ যারা করতেন তাদেরকে বলা হতো 'চিকনদাজী' এবং মসলিন, পশমী শাল ও রুমাল ইত্যাদি বস্ত্রেও সোনা-রূপা ও রেশমী সুতার কাজকে বলা হতো 'জরদজী'।

---

[২০৮] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৯৪।
[২০৯] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ.০৭।

তৎকালীন ঢাকায় মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাপড়চোপড় ধৌত করার কাজে এক পেশাজীবিগোষ্ঠী নিয়োজিত থাকতো বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। জেমস টেলর বর্ণনা করেছেন, মসলিন বস্ত্রাদি ধৌতকরণ কার্য জেলার উত্তরাংশেই সীমাবদ্ধ; সেখানকার ব্রহ্মপুত্রের শাখাগুলোর স্বচ্ছ নির্মল পানি একাজের বিশেষ উপযোগী। আবুল ফজল সোনারগাঁও পরগণার একটি বিখ্যাত জলাশয়ের উল্লেখ করেন; এর পানিতে ধৌত মসলিন অদ্ভূত রকম সাদা হয়ে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান কালেও এ অংশের কাঁকর মিশ্রিত ও কর্দমাক্ত মাটিতে খনন করা সকল কূপের পানিতেই এ একই রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়। এখানে অবলম্বিত বস্ত্র-ধৌতকরণ পদ্ধতি হলো সাবান ও পানির একটি পাত্রে বস্ত্রাদি উত্তমরূপে চুবিয়ে নিয়ে সেগুলো নিংড়ে নেওয়া, অতঃপর তা মসৃণ ঘাসের উপর মেলে দেওয়া। রৌদ্রে ফেলে শুকানোর পর জলাশয় থেকে আনা উত্তম পানিতে পূর্ণ একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। তারপর শুরু হয় কাপড় সিদ্ধ করার কাজ। একাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এরপর একরাত ফুটানো পানির পাত্রেই কাপড়গুলো ফেলে রাখা হয় এবং পরের দিন এগুলো ধোপার পাটে বা তক্তার উপর আছড়ে নিয়ে রোদে শুকাতে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে সিদ্ধ করা ও ধৌত করার এই পদ্ধতি চার পাঁচ বার চলতে থাকে এবং শেষ বারের সময় এতে লেবুর রস-মিশ্রিত পানি দেওয়া হয়ে থাকে। উক্ত দ্রব্য এখানকার মসলিন বস্ত্র ধৌত করার কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তা একই উদ্দেশ্যে ব্রোচে ব্যবহৃত হতো বলে তাভার্নিয়ার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উক্ত লেবু গাছের বিরাট বিরাট বাগান থাকায় বাংলার সুতী বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য সেখানে পাঠানো হতো। আবে রায়নাল উল্লেখ করেন যে, ভারতের সুতী বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো যেখানে প্রস্তুত হয় সেস্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র কোথাও তা উত্তম রূপে ধৌত করা যায় না। মসলিন কাপড় শুভ্র কওে নেওয়ার পর এসব বস্ত্র সাধারণভাবে ধৌত করা, আছড়ানো ও ভাঁজ করার প্রাক্কালে সুতা এলোমেলো হয়ে গেলে, তা ঠিক করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথমেই নাগফনির পাঁজরার হাড়ে তৈরি সূক্ষ্ম ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ে নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা এবং নার্দিয়া নামক এক শ্রেণির মুসলমান একাজ করে থাকে। মসৃণ ও বড় ধরণের শঙ্খ দ্বারা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রাদি ঘষে দেয়া হয়, এবং মোটা ধরণের বস্ত্রাদি ঘষার জন্য কাঠের ছোট হাতুড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একাজটি ভিন্ন এশ্রেণির কারিগররা সম্পাদন করে। বস্ত্রাদি ভাঁজ করার ও গাঁট বাঁধার কাজগুলো নর্দিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।[২১০] ফলে প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞাপন চিত্রের পোশাক পরিচ্ছদ সেসময়কার ঢাকার এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সাক্ষ্য প্রমাণ করে।

ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলোতে পুরুষ চরিত্রগুলোর চিত্রায়নে স্বল্প পোশাক বিশেষ করে ল্যাঙট ধরণের পোশাক ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের চিত্রায়নে তাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে এক খণ্ড পোশাক ব্যবহার করেছে

[২১০] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলে দেখা যায়। এধরণের চিত্র দেখা যায় ডাক্তার এস কে বর্ম্মণ কর্তৃক উদ্ভাবিত 'এণ্ড কিওর' নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৭)। 'সোনার বাংলা ছারখারে গেল!'[২১১] শিরোনামের এই বিজ্ঞাপনে দুজন ব্যক্তির চিত্র রয়েছে। বামপাশের জন কঙ্কালসার যার বুকের খাঁচা অবদি দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ডানপাশের ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এত বড় পরিবর্তন যে একমাত্র 'এণ্ড কিওর' এর অবদান তা বলাই বাহুল্য। তবে দুজনের মধ্যে একমাত্র মিল তারা দুজনেই শুধুমাত্র একখণ্ড কাপড় পরিহিত যা শুধুমাত্র লজ্জাস্থান ঢাকার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো যে এদেশীয় পোশাক পরিচ্ছদের অংশবিশেষ তা বলাই বাহুল্য।

'অমৃতবল্লী কষায়' শিরোনামের বিজ্ঞাপন নং ১.৩২ এর চিত্রে বলশালী বা শক্তিশালী ও পেশিবহুল একজন পুরুষ মানুষের চিত্র রয়েছে। যার গায়ে একটি স্যান্ড্রো গেঞ্জি পরিহিত দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টে মনে হয় এরকম পোশাক সেসময়কার ঢাকার বেশ ভালোই প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, ' স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শহরের নানা স্থানে এবং কোনও কোনও পল্লীতেও মোজার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই ঢাকা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম.এ বি.এল মহোদয় আমেরিকা হইতে সেমি অটোমেটিক মেশিন আনাইবার চেষ্টা করেন। পরে তাঁহারই যত্নে ঢাকাতে Branson এর কয়েকটি মোজার কল আনীত হয়। ঢাকায় মোজার কল প্রতিষ্ঠাও প্রচলন সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুই প্রথম উদ্যোক্তা বর্তমান সময়ে গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী এবং দাসব্রাদর্স কর্তৃক পরিচালিত কারখানা দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় সূত্র রঞ্জিত করা হয়। এই উভয় কারখানাতেই উৎকৃষ্ট মোজা ও গেঞ্জি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মি.জি.এন.গুপ্ত তদীয় রিপোর্টে এই কারখানাদ্বয়ের কার্যপ্রণালীর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।[২১২] অর্থাৎ প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন ঢাকায় গেঞ্জির ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি ধীরে ধীরে গেঞ্জির কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[২১৩]

উল্লেখ্য যে, চিত্রগুলোর পোশাক পরিচ্ছদ দেখে উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গ বিশেষ করে ঢাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না। ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলোতে বিদেশী বা পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক চোখে পড়ে। যেমন- সেভরিন নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.৫), পালস্ ম্যালেরিয়া মিকশ্চার নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৬), ডাক্তার এস কে বর্ম্মণের কিওর ফর অ্যাজমা নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৮), ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৯), কিউটিক্যুরা সাবানের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ৪.২৭), দত্ত দাস এণ্ড কোং এর বাইসাইকেলের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ৮.১৩) প্রভৃতি। এই চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনগুলোতে কোর্ট, প্যান্ট ও টাই পরিধান করতে দেখা যায়। একবিংশ শতাব্দীতে এই ধরণের পোশাক একেবারেই সাধারণ ব্যাপার হলেও উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় সেরকম ছিল না।

---

[২১১] ঢাকাপ্রকাশ, ৬ অগ্রহায়ন ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৬।

[২১২] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৪।

[২১৩] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এই নতুন ধরণের পশ্চিমা ধরণের পোশাক যে একদিন হরহামেশা ব্যবহার হবে তা কজনই বা জানতো? এক্ষেত্রে দত্ত দাস এণ্ড কোং এর বাইসাইকেলের বিজ্ঞাপন চিত্রটি (চিত্র নং ৮.১৩)[২১৪] বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য কেননা এই রকম কোর্ট, প্যান্ট পরিহিত পরিপাটি ব্যক্তি যে বাইসাইকেল চালাবেন তা বোধ করি বর্তমানেরও কেউ ভাবেন না বা নিতান্তই বাধ্য হয়ে এরকম করতে পারেন বলেই অনুমিত হয়।

ঢাকাপ্রকাশ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কিউটিক্যুরা সাবানের বিজ্ঞাপন চিত্রদ্বয় (চিত্র নং ৪.২৮ ও ৪.৩২) বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। চিত্রদ্বয়ের ন্যায় পশ্চিমা পোশাক পরিধান বর্তমান আধুনিক নারীবাদীদের কাছে সাধারণ ব্যাপার হিসেবেই পরিগণিত। তবে সাবান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 'কিউটিক্যুরা', 'লাক্স', 'সানলাইট' প্রভৃতি সাবানের বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহার হয়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন ঢাকায় সাবান আমদানি হতো অথবা এখানে তৈরি হতো। উনিশ শতকে ঢাকায় সাবান শিল্পের প্রচলন ছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়। ঢাকা শহরে সাবানের একটি কারখানা আছে, তাহা 'বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী' নামে পরিচিত। সাবুন এই আরবী শব্দ হইতেই সাবান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঢাকার বাঙ্গালা সাবান এক সময়ে সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঢাকাই তৎকালে ভারতে অন্যান্য প্রদেশের সাবানের অভাব মোচন করিত। সুদূর বসোরা এবং জিদ্দার বন্দরেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ঢাকায় সাবান বিক্রীত হইত। বাঙ্গালা সাবান নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত হইত।

শামুকের চূর্ণ	১০ মণ
সাজিমাটি	১৬ মণ
লবণ	১৫ মণ
তিল তৈল	১২ মণ
ছাগচর্বি	৫ মণ ১ সের
	৫৩ মণ ১৫ সের[২১৫]

ফলে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সাবান উৎপাদনে ঢাকার একটি অবস্থান উনিশ শতকের পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[২১৪] ঢাকাপ্রকাশ, ৫ বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ০২।

[২১৫] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন চিত্রের বিদ্যমান উদাহরণে প্রথম চিত্রটি একটি শঙ্খের। এছাড়াও নারী চরিত্রের হাতে অলংকার হিসেবে পরিহিত বিভিন্ন ধরণে শাঁখার ব্যবহার দেখা যায় যা প্রমাণ করে যে, উনিশ শতকের ঢাকায় শঙ্খ শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। এক্ষেত্রে জেমস টেলরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বর্ণণা করেছেন- শহরে প্রায় ৫০০ জন শঙ্খ কারিগর আছে। এরা এই শিল্পকর্মেও তিনটি স্বতন্ত্র শাখায় যেমন, দাগরাজিকরণ, করাতে কেটে এগুলো মণ্ডলাকৃতিকরণ, এবং ঘষে মেজে মসৃণ চিকর করা, বক্র করা এবং বিভিন্ন টুকরা জোড়া লাগানো ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত। কলকাতা থেকে আমদানিকৃত চাঙ্ক শঙ্খের বার্ষিক গড়পড়তা পরিমাণ ৩,০০,০০০। শহরে বাৎসরিক বিরাট বিরাট সাময়িক মেলাসমূহ বিপুল পরিমাণ কুঁদান ও রঙিণ শঙ্খের অলংকারাদি বিক্রয় হয়ে থাকে।[২১৬] পূর্ববঙ্গের ঢাকার শঙ্খ শিল্পের প্রসার সম্পর্কে জানা যায় যতীন্দ্রমোহন রায়ের *ঢাকার ইতিহাস* গ্রন্থে। গ্রন্থটির বর্ণনায় রয়েছে- শহর ঢাকা ও মানিকগঞ্জাস্থিত শঙ্খকারগণ উৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শিল্প অতি প্রাচীনকাল থেকেই হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঢাকায় শাঁখারী বাজাওে এই শিল্পীগণ সাধারণত বাস করিয়া থাকে। এখানে ১০০ ঘর শাঁখারী বাস করে। এতদ্ব্যতীত ফরিদাবাদ্রে ৫/৬ ঘর শাঁখারী আছে। বর্তমান সময়ে ঢাকা শহরে প্রায় ৫০০ শত জন লোক এই শিল্পদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাদের ব্যবসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণত শাঁখার জোড়া ৬ আনা হইতে ২ টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। শঙ্খশিল্পীগণ সাধারণত ১০০ শত টাকা মূলধন লইয়াই স্বীয় ব্যবসায় আরম্ভ করে। শঙ্খের সমুদয় কার্যই হস্তদ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। করাত দ্বারা শঙ্খছেদন করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য, ইহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা অধিকতররূপে করিতে হয়। শঙ্খ কর্তিত হইলে পর উহা একখণ্ড প্রস্তুরোপরি বিশেষ ধৈর্যসহকারে ঘর্ষণ করাও কম আয়াসসাধ্য নহে।[২১৭]

ঢাকার শঙ্খ শিল্পে কত ধরণের দ্রব্যাদি তৈরি করা হতো তা যতীন্দ্রমোহন রায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শাঁখা, অঙ্গুরী, বালা, চুড়ি, ঘড়ির চেন, বোতাম ও কানের বোতল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য শঙ্খ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শঙ্খকারগণ এই সমুদয় দ্রব্যেও উপরে নানা প্রকার কারুকার্য খচিত করে। বিবিধ কারুকার্য সমন্বিত লতাবালা, শঙ্খবালা, উপরবেণী, উপরশঙ্খ, লতাসাপ, দোসাপা, মকরমূখো, চেনবালা, বক্লস, চুড়ি প্রভৃতি শিল্প নৈপূণ্যেও খ্যাতি বঙ্গ প্রসিদ্ধ। এই সমুদয় শঙ্খ লঙ্কাদ্বীপ, মাদ্রাজ উপকূল ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে ঢাকাতে আমদানী হয়। সাধারণত লঙ্কাদ্বীপ হইতে তিতকৌড়ি শঙ্খ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে জাহাজী, ধলা ও পটী শঙ্খ এবং মাদ্রাজ উপকূল হইতে গড়বাকী শঙ্খ কলিকাতা হইয়া ঢাকাতে আমদানী হইয়া থাকে। সুরুতি, দুয়ানাপটি ও আলাবিলা শঙ্খই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর সমুদ্র উপকূল হইতে প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ ঢাকাতে আমদানি হয় এবং ঢাকা হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার নানাবিধ শাঁখার দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঢাকার প্রেমচাঁদ, সুর, দ্বারিকানাথ

---

[২১৬] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১২৫।
[২১৭] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

নাগ প্রভৃতি কারিগরের তৈয়ারি শাঁখার দ্রব্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ।[২১৮] ফলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রসমূহের বিভিন্ন মোটিফ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনগুলো অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় বহন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপনটি (চিত্র নং ১.১৫)[২১৯] ব্যতিক্রমধর্মী ও বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। বিজ্ঞাপনে একটি চারটি জানালা ও দ্বিতল বিশিষ্ট টিনশেড ঘরের ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। এই রকম ঘরবাড়ি সাধারণত এদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বিরল। ধারণা করা যেতে পারে যে, আগ্রহী রোগীগণ যাতে ঘরটি দেখেই চিকিৎসালয়টি সহজেই চিনতে পারে এবং প্রতারিত না হয় সেজন্যই এই ঘরের ছবির অবতারণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেডের পঞ্চতিক্ত বটিকা নামক ঔষধের বিজ্ঞাপনের চিত্র (চিত্র নং ১.২৮) গুরুত্ববহ। 'জ্বরের জন্য ভাবনা কেন পঞ্চতিক্ত বটিকা আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিবে'[২২০] শিরোনামের এই বিজ্ঞাপনে গ্রাম্য বাঁশ ও ছন দ্বারা প্রস্তুতকৃত বাড়ির অভ্যন্তরে একজন জরাজীর্ণ ব্যক্তি বসে আছে। এধরণের ঘর সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পঞ্চতিক্ত কষায় নামক ঔষধের একটি বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.২৯) একটি কাঠের দরজায় হাত দিয়ে একজন রূগ্ন ব্যাক্তিকে দেখা যায়। এধরণের কাঠের দরজা এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকার স্থাপত্যরীতি সম্পর্কে জেমস টেলরের বর্ণনা প্রনিধানযোগ্য। তাঁর বর্ণনামতে- ঢাকার বিশেষ করে চক বা বাজার এলাকার সড়কমূখো বাড়িঘরগুলো সাধারণত খুব অপ্রশস্ত এবং এক থেকে চারতলা পর্যন্ত উচূ। শহরের কয়েকটি এলাকায় কিছু সংখ্যক বিশেষ শ্রেণির লোক বাস করে। এসব স্থান হলো তাঁতিবাজার ও শাখারী বাজার। এ সমস্ত জায়গায় গৃহনির্মাণের জন্য জমি উচ্চহারে বিক্রি হয়ে থাকে; সেখানে বহ চারতলা দালানের সম্মূখভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মতো জায়গা রয়েছে। অপর দিকে পার্শ্ববর্তী দেয়ালসমূহ দরজা বা জানালাবিহীন নিশ্চিদ্র এবং পশ্চাদদিকে বিশ গজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের কেবল শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার উপরে মধ্যবর্তী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গণের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ইউরোপীয় অধিবাসীগণের বাড়িগুলো বেশ বড় বড় এবং উত্তমরূপে তৈরি এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসার সময়ে এসব দালানকোঠা শহরটিকে একটি চমৎকার শোভা দান করে। এগুলোর অধিকাংশই বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং এসব দালানের ছাদে উদ্যান রয়েছে। বর্ষা সমাগমে এগুলোর দেয়ালগুলো নদী-বিধৌত হয়ে থাকে। শহরের

[২১৮] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮১।
[২১৯] ঢাকাপ্রকাশ, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১, পৃ. ০৮।
[২২০] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১২ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আর্মেনীয় ও গ্রীক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় ইষ্টক-নির্মিত বাড়িঘর আছে, কিন্তু এসবের অধিকাংশই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।[২২১]

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের ঢাকার বাড়িঘর অর্থাৎ আবাসিক এলাকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া *'ঢাকার প্রথম'* গ্রন্থটিতে। এটির বর্ণনা মতে- 'ঢাকার ভদ্রলোকদের প্রথম যে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছিল, তা হলো উয়ারী বা ওয়ারী। ঢাকার কালেক্টর ওয়্যারের নামানুসারে পরিচিত হয়ে উঠেছে এলাকাটি। ১৮৮৪ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার কালেক্টও এবং তিনিই পত্তন করেছিলেন উয়ারীর। এখনো উয়ারীতে তার নামে একটি আছে একটি সড়ক। উয়ারী ছিল সাতশ একরের সরকারি খাস জমি। ১৮৩৯ সালে এ জমির প্রথম কৃষি বন্দোবস্তের পর পুরো এলাকাটি পত্তন দেয়া হয়েছিল জঙ্গলবাড়ী হিসেবে। বাড়ীসহ প্রতিবিঘা ফলের বাগানের খাজনা ধার্য করা হয়েছিল ছয় টাকা। মসলিন ধোয়ার জন্য ধোপাদেরও বরাদ্দ করা হয়েছিল কিছু জমি। এ ধরণের জমির খাজনা ছিল বিঘাপ্রতি চার আনা। বন্দোবস্তকৃত পুরো খাজনা দাঁড়িয়েছিল প্রায় একানব্বই টাকার মতো। কিন্তু, ঢাকা তখন ক্ষয়ের পথে, ফলে এ খাজনাও মনে করা হচ্ছিল খুব বেশি। তাই ১৮৪১ সালে, পুরো এলাকাটির খাজনা ধার্য করা হয়েছিল উনপঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ দু ধরণের জমির খাজনাই হ্রাস পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের দিকে দেখা গেল, উয়ারীর ৬ ভাগের ৫ ভাগ জমি পরিণত হয়েছে জঙ্গলে।[২২২]

উল্লেখ্য যে, ১৮৭৬ সালে পৌরসভা ঠিক করেছিল পুরো এলাকাটি সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে উন্নত করবে। এজমির জন্য সরকারকে পৌরসভা ১,৪৭৫ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। সরকারের মতে, এ দাম ছিল নামমাত্র, তাই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৮৮৫ সারে সরকার নিজেই ঠিক করেছিল আবাসিক এলাকা হিসেবে উয়ারীকে উন্নত করবে এবং এর জন্য ভার দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর ফ্রেডারিক ওয়্যারকে। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট কওে পুরো এলাকাটিকে আবাসিক প্লটে ভাগ করেছিলেন। প্রতি বিঘার খাজনা নির্ধারণ করা হয়েছিল ছয় টাকা। শর্ত ছিল, তিন বছরের মধ্যে বাড়ী তুলতে হবে এবং সেই সাথে কালেক্টরের কাছ থেকে বাড়ির প্লান পাস করিয়ে নিতে হবে। এরপরই উয়ারী পরিণত হয় সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা হিসেবে।

উয়ারী আবাসিক এলাকার ঘরবাড়িগুলোর রীতি সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন বর্ণনা করেছেন- উয়ারী আবাসিক এলাকা পরিণত হয়ে গেলো। এর ঘরবাড়ী ঢাকা শহরের পুরনো এলাকার ঘরবাড়ী থেকে ভিন্ন। এ এলাকার বাড়ীগুলো দেখলে বোঝা যায় পরিবর্তন হয়েছে মধ্যশ্রেণির রুচির। গ্রামের সঙ্গে তার বন্ধন হয়েছে খানিকটা শিথিল। কিন্তু গ্রামের স্মৃতিবা নষ্টালজিয়ার রেখা মিলিয়ে যায়নি তখনও। গ্রামের যেমন দখিন দুয়ারি ঘর, উঠোন, রান্নাঘর, সব

[২২১] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১২৫।
[২২২] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আলাদা হয়েও একটা ইউনিট বা এককের মতো, এ এলাকার বাড়ীগুলোও তেমনি।[২২৩] বিখ্যাত অর্থনীতিবিদি ভবতোষ দত্ত। ১৯২২ সালের এসব এলাকা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে চিত্রটি আরো স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন- "ওয়ারি ঠিক শহর তলি নয়। কিন্তু শহরের মধ্যে হয়েও একটি ভিন্ন রকমের উপান্তিক না হলেও প্রান্তিক। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, রাস্তায় লোক বেশি নেই। যারা আছে তারাও পোশাক পরিচ্ছদে মার্জিত। বাড়ীগুলি সুন্দর একতলাই বেশি, কয়েকটি মাত্র দোতলা, তার প্রত্যেক বাড়ীতে অনেকটা খোলা জমি। এখানে রমনার অভারতীয় উদ্যান নগরীর স্বাচ্ছন্দ্য, পুরানো পল্টনের নবীনতা নেই, টিকাটুলির গ্রাম-ছোয়া ভাব নেই, নবাবপুরের ঘিঞ্জি বসতিও নেই। সবই একটু সংযত, সবই বাহুল্যবিহীন।"[২২৪]

উল্লেখ্য এখানে যারা থাকতেন তাঁরা মধ্যবিত্ত। দুএকজন জমিদার ছাড়া খুব বড়লোক প্রায় কেহই নন। চরম দারিদ্রও এখানে দেখা যেত না। প্রধানতঃ থাকতেন কয়েকজন আদি বাসিন্দা যারা পনের কুড়ি বছর আগে প্রায় বিনামূল্যে এখানে জমি কিনেছিলেন। এঁরা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি-ডেপুটি, মুনসেফ, জেলা জজ। এঁরা সকালে বাজারে যেতেন এবং গৃহভৃত্যের হাতে থলে, ঝুড়ি ভরতি বাজার করে আসতেন, আর বিকেলে পল্টনের মাঠে বেড়াতে যেতেন। এসব বর্ণনা ভবতোষ দত্তের বরাতে মুনতাসীর মামুন তাঁর *ঢাকার প্রথম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনগুলো এতদ্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় বহন করে থাকে। ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রের মধ্যে এস বি এণ্ড সন কোম্পানির উদ্ভাবিত 'মনেরেখ' ঔষুধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৩)। চিত্রটিতে বীণায় সুর তৈরি করছেন জনৈক নারী।[২২৫] এছাড়াও আধুনিক মেশিনারিজ উপবিভাগে বর্ণিত গ্রামোফোন, নিকোলফোন (চিত্র নং ৩.১, ৩.২, ৩.৪ এবং ৩.৬) প্রভৃতি যন্ত্রগুলো উনিশ শতকের ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিচায়ক। ঢাকায় প্রথম গ্রামোফোন আসে ১৮৯৯ সালে বলে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন দাবি করেছেন।[২২৬] কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন- সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায় ঐ বছর জুন মাসে এক সাহেব 'ফনোগ্রাফ' প্রদর্শনের জন্যে এনেছিলেন এবং তা দেখে অনেকে বিস্মিত হয়েছিল। উল্লেখ্য এর আগে ফনোগ্রাফ সম্পর্কিত কোন সংবাদ আমার চোখে পড়েনি। উল্লিখিত সংবাদটি এ রকম- এখানে কোন সাহেব ফনোগ্রাফ যন্ত্র প্রদর্শনের জন্য আনিয়াছেন। আমরা গত বুধবার বৈকালিক ভ্রমণ (অস্পষ্ট) ডাক বাঙালর প্রায় একশত হাত হইতে বাইজীর গানের শব্দ পাইলাম। চারিদিকে সাহেবের বাড়ী; সেখানে বাইজীর গান একটু বিস্ময়জনক বোধ হওয়ায় ডাক বাঙালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম ডাকবাঙালার বারান্দার ছাদে গুটিক এক সাহেব

[২২৩] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৭৯।
[২২৪] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৭৯।
[২২৫] *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৭।
[২২৬] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ও তাহাদেও সামনে একটি দৃষ্টপূর্ব যন্ত্র। তাহা হইতেই এ বাইজীর গান বাহির হইতেছে বুঝিয়া উহা ফনোগ্রাফ মনে করিলাম।[২২৭]

গ্রামোফোন ঢাকায় ব্যবহার যেদিনই হোক না কেন শহরটির সঙ্গীত ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষার কোন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। সাধারণত ওস্তাদেও কাছে নাড়া বেধে উৎসাহীরা সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। একটি সূত্র অনুসাওে ঢাকায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ সালে। কিন্তু আরেকটি সূত্রানুসারে দেখা যায় সঙ্গীত বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ সালেও ছিল। ফলে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন মত দেন- অনুমান করছি উনিশ শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীথ শিক্ষা দেয়ার প্রথম প্রতিষ্ঠান।[২২৮] বিদ্যালয়টির নাম ছিল 'ঢাকা সঙ্গীত বিদ্যালয়'। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন- রাজা কালী নারায়ণ রায় বাহাদুর, নবাব খাজে আহসানুল্লাহ এবং বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরী। বিদ্যালয়টি সুনামের সাথে চললেও কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৬ সঙ্গীতজ্ঞ চন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে তা পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রনাথে পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় তাঁর জন্ম ফরিদপুরে (১৭৭০ সালে)। তাঁর পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়েরও খ্যাতি ছিল সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে। চন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম ফরিদপুরে (১৭৭০ শতক)। ১৮৬৯ সালের দিকে তিনি ঢাকায় আসেন ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তৎকালীন ব্রাহ্ম নেতা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম গান করেন। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে অভয়কুমার দাস ও ব্রজসুন্দর মিত্র হসনু মিয়ার কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আট মাস হসনু মিয়ার কাছে গান শেখার পর ওস্তাদ হরি কর্ম্মকারের কাছে বছর খানেক ধ্রুপদ অভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম সঙ্গীতে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। রায় মহাশয়ের কণ্ঠ অতি উন্নত মিষ্ট ছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে এতদ্দেশে তিনি এক প্রকার অদ্বিতীয় ছিলেন। উয়ারীতে বসবাস করতেন এবং ১৯১০ সালের দিকে চন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

জানা যায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয় জগন্নাথ কলেজের একটি ঘরে। এক্ষেত্রে *ঢাকা গেজেট* পত্রিকার বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। *ঢাকা গেজেট* মতে-"ঢাকাবাসী সঙ্গীত বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের বন্ধু সঙ্গীতানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রযত্নে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ গৃহে, একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ঢাকা নগরীর একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গীত বিদ্যাভ্যাসাক্ষর্থীগণের শিক্ষাকার্যের সৌকাযার্থে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভরসা করি সঙ্গীত প্রিয় মহোদয়গণ চন্দ্রনাথ বাবুর এই সদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য যথোচিত সাহায্য ও উৎসাহ ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। বিদ্যালয়ে চারটি বিভাগ ছিল। হারমোনিয়াম, সঙ্গীত, তবলা ও সেতার। বেতনের হার ছিল এরকম- একটি

[২২৭] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৪৮।
[২২৮] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে শিক্ষা নিলে মাসিক ১ টাকা, ২টিতে দেড় টাকা, ৩টিতে আড়াই ও ৪টিতে ৩ টাকা দিতে হইবে। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ক্লাস চলতো। সোম, বুধ ও শুক্র হারমোনিয়াম ও সেতার, প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সঙ্গীত ও তবলা শিক্ষা দেওয়া হতো। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনও স্কুলের ছাত্রকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কিন্তু কলেজের চাত্র গৃহীত হইবে। সঙ্গীত কুলশীল কোনও ব্যক্তিকে গ্রহণ করা যাইবে না। বিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার্থীদেও উৎসাহানুসারে ফুট, করিওনেট, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের শিক্ষাই আরম্ভ হইবে।[২২৯] অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ঢাকায় সঙ্গীত শিক্ষার আনুষ্ঠানিক যাত্রাও হয়ে যায়। যার ফলে হারমোনিয়াম, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি সঙ্গীতযন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এজন্য সাময়িতপত্রগুলোর বিজ্ঞাপনের চিত্রে বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রের চিত্র স্বাভাবিক এবং ঢাকার বিনোদন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক নির্দেশক বলেই প্রতিভাত হয়।

সঙ্গীত বিষয়ে আরো জানা যায় যে, 'সঙ্গীত কলায়, বিবিধ যন্ত্রের বাদনে, ঢাকা এক সময়ে বঙ্গদেশের আদর্শ স্থানীয় ছিল। কলকণ্ঠে গায়কের সুমধুর কাকলী; সেতার, এস্রাজ, তানপুরার মুর্চ্ছনা; পাখোয়াজের রোল, কাওলাতের গম্ভীর নিনাদ, তবলার বোল ও টপ্পার মিহি সুর, গম্ভীর নিশীথে প্রায়, প্রতি মহল্লাতেই শ্রুত হইত। সঙ্গীতচর্চায় ঢাকা এখন পশ্চাদপদ নহে। বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদিও বহুকাল হইতেই ঢাকায় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সেতার ও এস্রাজ প্রভৃতি নির্মাণ জন্য চুণীলাল ও সুকলাল মিস্ত্রী সুদক্ষ ছিল। বর্তমানে সময়ে মুন্নালাল মিস্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে'[২৩০]

উনিশ শতকের ঢাকাই সংস্কৃতির আরেকটি পরিচয়জ্ঞাপক মাধ্যম হলো খেলাধুলা। বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে জানা যায় উনিশ শতকের ঢাকায় ফুটবল একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ছিল। এক্ষেত্রে এস রায় এণ্ড কোং এর 'ফুটবল সরঞ্জাম'[২৩১] শিরোনামের বিজ্ঞাপন চিত্র (চিত্র নং ৮.৯)। এছাড়াও ক্রিকেট খেলাও যে এদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা হয়তো সাময়িকপত্রের প্রকাশনা সংস্থা কিংবা ক্রিকেট সরঞ্জাম বিক্রেতারাও অনুধাবন করতে পারেনি। এছাড়াও গাছের ডালে চড়ে শিশুরা খেলছে এমন বিজ্ঞাপন চিত্রও (চিত্র নং ১.২৪) প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই রকম দেশীয় খেলার পাশাপাশি বিদেশী টেনিস জাতীয় খেলার চিত্র দেখা যায় (চিত্র নং ১.২৫) অমৃতবল্লী কষায় নামক ঔষধের বিজ্ঞাপনে। যার শিরোনাম করা হয়েছে 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'[২৩২]।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত উনিশ শতকের সাময়িকপত্রগুলোর বিজ্ঞাপনে এতদ্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থারও বিশেষ পরিচয় বহন করে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া যে বাংলাদেশেও লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকার সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনে। বিশেষ করে নিকোলফোন ও নিকোল রেকর্ড

[২২৯] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৭৬।
[২৩০] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৫।
[২৩১] *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ.০২।
[২৩২] *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০২।

Dhaka University Institutional Repository

(বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১), গ্রামোফোন (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.২), ঘড়ি (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৩), বাইসাইকেল (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৪), ট্রাঙ্ক (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৫), লোহার কড়ি (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৭), মুদ্রণযন্ত্র (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৮), হাইড্রলিক প্রেসিং প্লান্ট (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৯), বাইনোকুলার (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১০), ডুপ্লিকেটর (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১২), এল্যুমিনিয়াম ও লোহার তৈজসপত্র (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৮.১০ ও ৮.১২) প্রভৃতি যন্ত্রপাতির আমদানি ও ব্যবহার তৎকালীন ঢাকার শিল্পবিপ্লবের ধারায় হয়েছে বলেই প্রতিয়মান হয়।

সাধারণত যেকোন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম নিয়ামক উপাদান হলো স্বর্ণ বা রৌপ্য। এই স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে নানা ধরণের গহনা বানানো যায় । ফলে এদেশের নারীদের স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত নানা গহনা পড়তে দেখা যায় এবং এর ইতিহাস সুপ্রাচীন। স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পকর্মে কারা যুক্ত থাকতেন এবং কিধরণের অলংকার তৈরি করতো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ডাঃ জেমস টেলরের *Topography of Dhaka* গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনা মতে- এই শিল্পকর্মে নিয়োজিত ঢাকার কর্মকারগণ ফিলিগ্রী বা তাদেও কাজে বেশ পারদর্শী। তারা বলয়, গলার হার, ইয়াররিং বা কানের দুল এবং আতরদান, গোলাপপাশ নিখুঁতভাবে তৈরি করে থাকে। এসব জিনিসপত্র দেশের বিভিন্ন অংশে রপ্তানি হয়। শহরে এ কাজে তিন শতাধিক কারিগর নিয়োজিত আছে। এছাড়া রয়েছে এক শ্রেণির কিছু সংখ্যক লোকজন (সংখ্যায় ৬০ জনেরও বেশি) যারা এ সকল কারখানা থেকে ধুলা বা ঝাঁট দেয়া জঞ্জাল, পোড়া, কয়লার গুড়ো ইত্যাদি পূরক পদার্থ লাভের জন্য ক্রয় করে নেয়, এবং তা ধৌত করে তা সংগ্রহ করে।

উনিশ শতকের ঢাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ রায়ের বর্ণনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন- 'ঢাকার কর্মকারগণের শিল্পচাতুর্য বঙ্গপ্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকারের উপর ইহারা এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য ফলাইতে পারে যে তদৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঢাকাই কর্মকারগণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহারা অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নানাবিধ অলংকার প্রস্তুত করিতে পারে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের কর্মকারগণ এই বিষয়ে ঢাকার কর্মকারগণের সমকক্ষ নহেন। ইরানের বাদশাহ স্বর্গীয় নবাব স্যার আসানউল্লা বাহাদুর কে. সি. আই. ই. মহোদয়ের নিকটে ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন হুসনী দালানের একখানা আলোকচিত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। শুধু সামান্য একখানা আলোকচিত্র সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করা নবাব বাহাদুরের মনে ভালো লাগিল না। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিকর আনন্দহরির হস্তে ইমামবাড়ার একখানা স্বর্ণ ও রৌপ্যতার নির্মিত প্রতিকৃতি নির্মাণ করিবার ভার অর্পণ করেন। আনন্দহরিও স্বীয় গুণপণা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া অতি সুচারুরূপে কার্যটি সম্পন্ন করেন। আমরা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নবাব বাহাদুরের আসান মঞ্জিল প্রাসাদেও উক্ত প্রকার একখানা প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করিয়া আনন্দহরি বিস্তর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। যাহারা ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার সকলেই বোধ হয় এক বাক্যে স্বীকার করিবনে যে মিছিলের অগ্রগামী কুঞ্জরযুথের মস্তকোপরি পরিশোভিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুকুটগুলো এবং নানা কারুকার্য খচিত রৌপ্য ও হিরন্ময় ছোট চৌকিসমূহ শিল্পচাতুর্য্যে ও কলানৈপূণ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত বিষয়ে গোপী কর্মকার বর্তমান সময়ে ঢাকার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার রৌপ্য নির্মিত আতরদান, গোলাববাস প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট।[২৩৩]

[২৩৩] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র প্রকাশনা, ২০০৭), পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১১ নং বিজ্ঞাপন চিত্রের ল্যাণ্ঠান, ৮.১২ নং বিজ্ঞাপনের লোহার কড়া প্রভৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলে লোহার ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমন শিল্প কারখানাও স্থাপিত হতে শুরু করেছে। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, 'অতি প্রাচীনকালে ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোহাইদ ও কীর্তনিয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানা ছিল বলিয়া অনুমিত; ঐ সমস্ত স্থান খনন করিলে এক্ষণেও নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐস্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল লক্ষ্মীবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রেলাল শর্মা মহোদয় ঢাকা নগরীতে একটি লৌহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিকর শ্রীযুক্ত কানাইলাল কর্মকারের তত্ত্বাবধানে ইহা প্রথমে পরিচালিত হয়। লৌহের নানাবিধ ঢালাই কাজ এই কারখানায় সংঘটিত হইয়া থাকে।'[২৩৪]

লোহার বাসনকোসন ছাড়াও পিতল, তামা ও কাঁসার নানাবিধ তৈজসপাত্র নির্মিত হইতো ঢাকায়। ঢাকা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, শহরের ঠাটারি বাজার মহরাল, ধামরাই গ্রামে পিতল, তাম্র ও কাংস্য নির্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহজঙ্গ ও নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত কোনও কোনও স্থানেও এই সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ধামরাই এর কাঁসার বাসন উৎকৃষ্ট। ভরণের কাজই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়। পূর্বে লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্তী দুয়ালী গ্রামে ভরণের কাজ হইত। ঢাকার স্বনামখ্যাত স্কুল ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় মহাত্মা দীননাথ সেন মহোদয় পিতল নির্মিত এক অভিনব প্রণালীর দীপাধার নির্মাণ করিয়াছিলেন।[২৩৫]

এছাড়াও ৮.১৪ নং বিজ্ঞাপনে এস.সি. চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স কোম্পানীর জুতার চিত্র, ৮.১৫ নং বিজ্ঞাপনে কমল ব্রাদার্সের জুতার চিত্র দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, উনিশ শতকের ঢাকায় জুতা ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমনি জুতা তৈরির কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, 'মালীটোলা, লক্ষ্মীবাজার ও কুমারটুলীর চর্মকারগণ উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকায় বিস্তৃত চর্মের ব্যবসা আছে। প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকার চর্ম এখান হইতে কলিকাতা হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে।'[২৩৬] এভাবে উনিশ শতকের ঢাকায় সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনে সেসময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থাই প্রস্ফূটিত হয়েছে।

উনিশ শতকে ঢাকার সাময়িকপত্রগুলোর বিজ্ঞাপন চিত্রে বিভিন্ন ধরণের পশু বা প্রাণীর চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো তৎকালীন ঢাকার অধিবাসীগণ যেসমস্ত পশু ও প্রাণীর সাথে পরিচিত কিংবা কোন কোন পশু বা প্রাণী ঢাকায় রয়েছে তার পরিচয় বহন করে থাকে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত 'সর্ব্বদদ্রু হুতাশন' শিরোনামের বিজ্ঞাপন চিত্র নং ১ এ একটি শামুকের চিত্র, 'হরিণ মার্কা চালী রস' শিরোনামের ১.১ নং চিত্রে হরিণ, 'বিএন দত্তের

[২৩৪] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৩।
[২৩৫] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৩।
[২৩৬] যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭), পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অমৃতবিন্দ সালসা' শিরোনামের ১.৮ নং চিত্রে সিংহ, 'ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিলস্' শিরোনামের ১.২২ নং চিত্রে বাঘ, ' মানবের স্বাস্থ্য ও শক্তির একমাত্র উপাদান অমৃতবল্লী কষায়' শিরোনামের ১.২৬ নং চিত্রে একটি অজগর সাপ, 'পালিয়ে বাঁচা দায়-পঞ্চতিক্ত কষায় ম্যালেরিয়া দূর করে' শিরোনামের ১.৩৪ নং চিত্রে একটি বড় আকৃতির মশা, Golf Ras' শিরোনামের ইংরেজি বিজ্ঞাপনের ৪.৩২ নং চিত্রে ছাগল বা ভেড়া জাতীয় পশু প্রভৃতি পশু বা প্রাণীর ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পশু বা প্রাণীর চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলো এই জনপদের এক একটি ইতিহাস হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে।

বর্তমানে ঢাকার উত্তর দিকে হরিণ, বাঘ কিংবা বড় অজগর সাপের দেখা পাওয়া দুষ্কর কিংবা অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় হলেও ঐতিহাসিক ভাবে জানা যায় ঢাকার উত্তরাংশের জঙ্গলে এসমস্ত প্রাণীর অবাধ চলাফেরা ছিল। ডাঃ জেমস টেলরের প্রণীত *Topography of Dhaka* গ্রন্থটিতে তার আভাসই পাওয়া যায়। জেমস টেলরের বর্ণনানুযায়ী- 'এই (ঢাকা) জেলার দুই অংশের প্রাকৃতিক গঠনে যেমন বিরাট পার্থক্য বর্তমানে তেমনি জীবজন্তুও বৈচিত্র্যও সুস্পষ্ট। উত্তরাংশে সাধারণত শিকারী প্রাণী এবং বিভিন্ন চতুষ্পদ প্রাণী বাস করে। দক্ষিণাংশে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম। [২৩৭] উত্তরাংশের জঙ্গল বাঘ এবং চিতাবাঘ অধ্যুষিত। বন্যা আর অনাবৃষ্টির সময় এরা গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এদেও ধ্বংস করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পুরষ্কার ঘোষণা করা হতো। ১৮০৪ সালে সরকারী পুরষ্কারের জন্য মোট ২৭০টি বাঘের চামড়া শহরে আনা হয়েছিল। কিন্তু পুরষ্কারের জন্য ধার্য অঙ্ক থেকে পাঁচ টাকা কমানোর ফলে এই সংখ্যা নেমে গিয়ে বছরে গড়ে ৩৫ টিতে দাঁড়িয়েছিল। আর বিগত তের বছরে সামগ্রীকভাবে অনধিক একশত বারো জন পুরষ্কার গ্রহণ করেছে।[২৩৮] উত্তরাংশের জঙ্গলে হরিণের চারটি প্রজাতি সচরাচর দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে- গোস হরিণ (Gous Deer), সারভাস হিপ্পেলাপাস (Cervus Hippelaphus), সাম্বু (Sumbu), সারভাস এরিটোটিলিজ (Cervus aristotilis) অথবা ব্লাক রশা অব বেঙ্গলি (Black Russa of Bengali) ডোরাযুক্ত হরিণ, সারভাস একজিস((Cervus axis) এবং হুগলা বা সারভাস মুন্টজ্যাক (Cervus Muntjack)। শেষোক্ত প্রজাতিটি বাংলায় খুব কম দেখা যায়, এর কণ্ঠস্বও অনেকটা কুকুরের মতো। তাই স্থানীয় শিকারীরদের কাছে ডাক হরিণ (Barking Deer) নামেই সমধিক পরিচিত। [২৩৯] জেমস টেলর হরিণের প্রজাতি ও তাদের শরীর এবং শিকারের পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন চমৎকারভাবে।

১.২৬ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে সাপের ছবি থাকায় ধারণা করা যায় যে ঢাকায় এক সময় অনেক ধরণের সাপের উপস্থিতি ছিল। ডাঃ জেমস টেলর অনেক সরীসৃপ প্রাণী বিশেষ করে এই জেলায় কয় ধরণের সাপ পাওয়া যায় এবং তাদের

[২৩৭] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১২।
[২৩৮] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১৩।
[২৩৯] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন প্রণালী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে- "অনেক পাইথন টাইগ্রিস শহরের আনাচে কানাচে জঙ্গলে বাস করে। এই সাপ লম্বায় প্রায় বিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। টিফলোপস লুমব্রিকেলিজ (Typhlops Lumbricalis) সাধারণত পাললিক মাটিতে পাওয়া যায়। এদেরকে কেঁচো বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এই সাপ লম্বায় কখনো কখনো এক ফুটের মতো আর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মতো মোটা হয়, দেহের আঁশগুলো একটি অপরটিকে সামান্য ঢেকে রাখে। এদের চোখ অতি ক্ষুদ্র আর লেজ মাথার মতোই মোটা হওয়ায় অনেক সময় দুই মাথার সাপ নামেও পরিচিত। পাইথন টাইগ্রিস আর টিফলোপস লুমব্রিকেলিজ সাপে বিষ থাকে না। সচরাচর দৃষ্ট অন্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে- কলুবার ঢুমনা (Coluber Dhumna), কলুবার গ্যালাথিয়া (Coluber Galathea), কলুবার মোয়েজস্ট্রিস (C. Moestris), মেরেমের ড্রাইনাস (Dryinus of Merrem) রাসেলের কুলুবার নাসেটাস (C. Nasatus of Russel) । শেষোক্ত সাপটি সরু আর লম্বা, নাকের প্রান্তে ছোট সূঁচালো উপাঙ্গ আছে। মেরেমের ডেনড্রোফিজ, মেরেমের কোফিয়াস ভাইসিরিডিস, রাসেলের বুডুপার (Boodoapeur of Russel) এই সাপগুলো বিষাক্ত। এদের বাস কচুক্ষেত। কচু গাছের সাথে এদের গাত্র বর্ণের আশ্চর্য মিল রয়েছে। মেরেমের নেট্রিকস স্টোলেটাস বা লিনের কলুবার ফেসিয়েটাসকে পিঠের দুটি সাদা লাইন আর আড়াআড়ি কালো দাগ দেখে সনাক্ত করা যায়। হাইড্রোফিজ অবসকিউরাস আর হা. নাইগ্রোসিংটাস এই প্রজাতি দুটি দানাগ্নি নামে পরিচিত। মৌসুমের শুরতে মেঘনায় এদের দেখা পাওয়া যায়, আর প্রায়ই জেলেদেও জালে এরা ধরা পড়ে। হাইড্রেফিস হলো সত্যিকার জল সাপ। এদেও লেজ চেপ্টা, দেখতে অনেকটা বাইন মাছের মতো। এই সাপের আঁশগুলো ছোট, কালো অথবা ধূসর বর্ণের। এই সাপের ফুসফুস লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে এটা অতি পাতলা পর্দার মতো। অন্যান্য সাপের ন্যায় ফুসফুস শিথিল অবস্থায় পেটের কুঠরীর মধ্যে ঝুলে থাকে না বরং পর্দার যোজন দিয়ে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। বায়ু থলের ন্যায় ফুসফুস সাঁতারে সাহায্য করতে পারে। হাইড্রোফিস লবণাক্ত পানি ছাড়া বাঁচে না বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সত্য নয়। কারণ উভয় প্রজাতিকে মিঠা পানিতে দুমাসেরও বেশি জীবিত অবস্থায় খোলস পাল্টাতে দেখেছি। হাইড্রোফিস বিষাক্ত সাপ। রঙিণ নাগ বা কোবরা ডায়সেফালো খুব কম দেখা যায়। বর্ষার শুরুতে অথবা বন্যার সময় সাপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় তারা আশ্রয়স্থল ত্যাগ কওে উচু স্থানে কৃষকদের বাড়ির আশপাশে চলে আসে এবং বহু সংখ্যক সাপ কৃষকদের হাতে মারা পড়ে। সরকারী হিসাব মতে ১৮৩০-১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সর্প দংশনে ৫৬ জন লোক মারা যায়।[২৪০] অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের সূত্রানুযায়ী আমরা ঢাকায় একসময় অনেক ধরণের সাপে বিচরণ ছিল তা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।

[২৪০] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

মোদ্দকথা, বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো তৎকালীন ঢাকার স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করে, রূপচর্চা ও প্রসাধনী সামগ্রী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, আধুনিক মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো উনিশ শতকের ঢাকায় ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিকাশধারার পরিচয় বহন করে এবং গ্রন্থ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর চরিত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, প্রসাধনী, পশুপাখি ও বিভিন্ন প্রাণী, কীটপতঙ্গ, নারীদের অলংকার সামগ্রী, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও যেমন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন, লোহার কড়াই, ল্যাণ্ঠান, চামড়ার জুতা, ছাতা, সাইকেল, সংগীতের যন্ত্রপাতি যেমন- গ্রামোফোন, নিকোলফোন, হারমোনিয়াম, বিলাতি মাটি, পঞ্জিকা প্রভৃতি তৎকালীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একেকটি মূল্যবান উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংবাদ সাময়িকপত্র একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের নিত্য দিনের ঘটনা প্রবাহের পক্ষপাতহীন নিরব স্বাক্ষী। সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার এদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন নয়। প্রথম দিকে চিত্রবিহীন বিজ্ঞাপন থাকলেও কালক্রমে তা বিজ্ঞাপন চিত্রে রূপায়িত হয় এবং পাঠক ও সুধী সমাজে তা বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এভাবে পর্যায় ক্রমে বিষয়বস্তুর ধরণ ও বৈচিত্রানুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞাপন চিত্রের বিষয়বস্তুগুলো সেসময়কার ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের রোগ বালাই, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, প্রসাধণী, জমি বিক্রয় কিংবা ধর্মীয় কোন ঘোষণার বিবরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের সহজাত কিছু আবেদন বা চাহিদার বহি:প্রকাশ ঘটে বিজ্ঞাপন চিত্রের মাধ্যমে। হয়তোবা একজন কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যাক্তি এভাবে খুঁজে পায় তার বাঁচার উপায়। ধীরে ধীরে সংবাদপত্র শহরাঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের মনের খোড়াক বা প্রয়োজন মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন চিত্র শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পণ্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কাজ করেনি। বরং একইসাথে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সম্যক ধারণাও প্রদান করে থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধের সাময়িকপত্রগুলোতে ব্যাপকভাবে ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রচার ও প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তৎকালের ঢাকায় যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান ছিল তা সহজেই অনুমেয়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিশেষ করে ২ মে ১৮৬৯ সনের প্রকাশিত 'ঢাকার স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক প্রস্তাব' শিরোনামের সংবাদ তার সাক্ষ্য দেয় যার বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ১৮৭০ সনে ২৪ এপ্রিল তারিখে *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় 'ঢাকার স্বাস্থ্য বিধান ও ১০ টাকা গৃহ টাক্স' শিরোনামের খবরে বলা হয়- 'ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত লায়েল সাহেব, ঢাকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ রিপোর্ট করেন। বলা হয়- 'সকল স্বাস্থ্য বিধানে যে অর্থ ব্যায়ের প্রয়োজন হইবে তাহার উপায় বিধানেও ঔদাসীন্য হয় নাই। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ট্যাক্স বাড়ানোর বিষয়টি ঐ খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এইরকম নানাপ্রকার প্রস্তাব এবং উপায় খোঁজার চেষ্টা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকে ঢাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সিভিল সার্জনেরাই চেষ্টা করছেন যেন ঢাকার স্বাস্থ্যবিধানের উন্নয়ন হয়। ঢাকার রোগবালাই কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে জনসাধারণ পর্যায়ে হিন্দুধর্মীয় রীতি অনুযায়ী নামসংকীর্ত্তন আয়োজনের খবরও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়াসহ নানাবিধ রোগের বিস্তার ঘটাতে ঢাকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কতটুকু দায়ী তা সিভিল সার্জন জেম্‌স টেলরের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। উল্লেখ্য, ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ হিসেবে জেমস টেলর সাহেব অস্বাস্থ্যকর ধানক্ষেত, বাড়ির সন্নিকটস্থ পাট ও শন পচানো পুকুর কিংবা আবদ্ধ পানি ব্যবহার ও পান করা রোগব্যাধির বড় উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের ঢাকায় কিধরণের বা কত প্রকারের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সে সময়কার সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রে। চিকিৎসা বিষয়ক চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপন নং ১.১ এ হরিণ মার্কা চালী রস, ১.২ নং বিজ্ঞাপনের 'কামদেব মার্কা বৃষ্যযোগ', ১.৩ নং বিজ্ঞাপনের 'গনেশ মার্কা যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধচূর্ণ', ১.৭ নং বিজ্ঞাপনের 'অ্যাজমামিস্ট ও স্পার্মাটোরিয়া স্পেসিফিক', ১.৮ নং বিজ্ঞাপনের 'অশোকারিষ্ট', ১.৯ নং চিত্রের 'অমৃতবিন্দু সালসা', ১.১১ নং বিজ্ঞাপনের 'মেওরেস', ১.১৫ নং বিজ্ঞাপনের 'বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়', ১.১৬ নং বিজ্ঞাপনের 'পালস ম্যালেরিয়া মিকশ্চার', ১.১৭ নং বিজ্ঞাপনের ডাক্তার এস.কে. বর্ম্মণের 'এগু কিওর', ১.২৫ নং বিজ্ঞাপনের কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের 'অমৃতবল্লী কষায়', ১.২৮ নং বিজ্ঞাপনের 'পঞ্চতিক্ত বটিকা', ১.৩০ নং বিজ্ঞাপনের কবিরাজ কালীপদ দে'র 'আশ্চর্য্যমলম', ১.৩৭ নং বিজ্ঞাপনের সাধনা ঔষধালয় প্রভৃতি চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সাধারণভাবেই মনে হয় উনিশ শতকের ঢাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা সেসময়কার ঢাকায় কবিরাজী ঔষধের বিকল্প পাওয়াও দুষ্কর ছিল। তবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা এদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ঢাকায় আয়ুর্বেদের ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে এবং যার নাম ছিল 'শক্তি ঔষধালয়'। আরেকটি ঔষুধ কারখানা যা এখনো জনপ্রিয় তার নাম সাধনা ঔষধালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে অন্যদিকে ১.২২ নং বিজ্ঞাপনের 'ডি উইটের কিডনী এবং ব্লাডার পিল', ১.৩৯ নং বিজ্ঞাপনের ম্যালেরিয়ার ঔষধ 'মেপাক্রিন' প্রভৃতি প্রমাণ দেয় উনিশ শতকের ঢাকায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক সূত্রও সেদিকেই সাক্ষ্য দেয়। জানা যায়, 'বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে। প্রাথমিক অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। এদেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা দক্ষ ইংরেজ চিকিৎসক নিয়োগের এবং স্বাস্থ্যখাতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে ঢাকায় প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ফর্মূলার সাথে জার্মান হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি এতদ্বাঞ্চলে যাত্রা শুরু করে উনিশ শতকের সূচনা থেকেই এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। তবে জনপ্রিয়তার জন্য সব চিকিৎসা পদ্ধতিকেই প্রচার ও প্রসারে দিকে মনোযোগী হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে পণ্যের সহজ প্রচারের জন্য বহুল প্রচারিত সাময়িকপত্র মাধ্যম বেছে নিয়েছে বলেই মনে হয়। ফলে নানাবিধ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমস্যায় জর্জরিত ঢাকার অধিবাসীদের জন্য বিজ্ঞাপনে কিছু সমস্যার সমাধান কিংবা কোন ঔষুধ সেবন করিলে রোগমুক্তি ঘটবে সে সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্র ব্যবহৃত হবে তা স্বাভাবিক হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

উনিশ শতকের পূর্ব বঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধরণ বুঝতে সাময়িকপত্র ও তার বিজ্ঞাপনচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায়ক উৎস। বিজ্ঞাপনে উৎকীর্ণ চিত্রগুলোর চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি নূতন কোন ধরণের পোষাক এই অঞ্চলে আগমন করছে বা করতে যাচ্ছে তার ধারণাও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অনাথবন্ধু চিকিৎসালয়ের বৃষ্যযোগ বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যায় কামদেবতা হাতে

Dhaka University Institutional Repository

তীর ধনুক হাতে নিয়ে শিকারীর দিকে তাক করে আছেন। যার দেহ ঢিলেঢালা ও সেলাইবিহীন ধূতি জাতীয় পোশাকে আবৃত। এরকম ঢিলেঢালা এক বা দুইখণ্ডের পোশাক এর ব্যবহার বেশি দেখা বিভিন্ন ঔষধের বিজ্ঞাপনে। মূলত এই ঢিলেঢালা পোশাক আবহমানকাল থেকেই এদেশের সম্ভ্রান্ত কৃষক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলোতে পুরুষ চরিত্রগুলোর চিত্রায়নে স্বল্প কাপড় বিশিষ্ট পোশাক বিশেষ করে ল্যাঙট ধরণের পোশাক ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের ছোট পোষাক সাধারণত নিম্নবিত্ত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত গরীব লোকেদের পোশাক হিসেবে বিবেচিত। তবে দেশীয় কিছু খেলায় (যেমনঃ হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা, লাঠিখেলা প্রভৃতি) এই ধরণের পোশাক এখনো গ্রামে গঞ্জে পরিলক্ষিত হয়। নারীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও পরিধেয় অলংকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় 'মনেরেখ' শিরোনামের ১.১২ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'তাম্বুল বিহার' শিরোনামের ১.১৩ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল' শিরোনামের ১.১৯, ১.১৯ ও ১.২২ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'অমৃতবল্লী কষায়' শিরোনামের ১.২৪ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'আশ্চর্য্য মলম' শিরোনামের ১.২৯ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে। এই চিত্রগুলোতে এদেশীয় শাড়ি পরিহিত নারীর চিত্রায়ন হয়েছে এবং যারা সাধারণত সম্ভ্রান্ত বলেই অনুমিত হয়। অন্যদিকে 'তরুণীর জীবন হয় সুখ ময়' শিরোনামের ১.৮ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'ইলেক্ট্রিক ম্যাগ্নেটো গ্যালভানিক ব্যাটারি' শিরোনামের ১.১১ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'কেশরঞ্জন তৈল' শিরোনামের ৪.৪ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'লাক্স টয়লেট সোপ' শিরোনামের ৪.১৭ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'সানলাইট সোপ' শিরোনামের ৪.২২ নং বিজ্ঞাপন চিত্রে, 'কিউটিক্যুরা সাবান' শিরোনামের ৪.৩২ নং বিজ্ঞাপন চিত্রসমূহে আধুনিক পোশাক পরিহিত নারীর চিত্রায়ন করা হয়েছে। যা সামাজিকভাবে সম্ভ্রান্ত নারীদেরই পরিচয় বহন করে।

ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলোতে বিদেশী বা পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক চোখে পড়ে। যেমন- সেভরিন নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.৫), পালস্ ম্যালেরিয়া মিকশ্চার নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৬), ডাক্তার এস কে বর্ম্মণের কিওর ফর অ্যাজমা নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৮), ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিল ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৯), কিউটিক্যুরা সাবানের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ৪.২৭), দত্ত দাস এণ্ড কোং এর বাইসাইকেলের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ৮.১৩) প্রভৃতি। এই চিত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনগুলোতে কোর্ট, প্যান্ট ও টাই পরিধান করতে দেখা যায়। একবিংশ শতাব্দীতে এই ধরণের পোশাক একেবারেই সাধারণ ব্যাপার হলেও উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় সেরকম ছিল না বলেই অনুমিত হয়। উপর্যুক্ত পোষাক পরিচ্ছদগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্ম কাজের বলেই ধারণা করা যায়। এক্ষেত্রে ঢাকায় যে একদা বয়নশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও পোশাক শিল্প ও তাঁর কাঁচামাল শিল্প, ধৌতকরণ প্রভৃতি পেশাজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের চিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনগুলো সামাজিকভাবে মানুষের বাসস্থানের বিশেষ পরিচয় বহন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিক্রমপুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপনটি (চিত্র নং ১.১৫) এবং কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেডের তৈরিকৃত পঞ্চতিক্ত বটিকা নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র (চিত্র নং ১.২৮) ব্যতিক্রমধর্মী ও বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এধরণের ঘর সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে লক্ষ্য করা যায়। এধরণের কাঠের দরজা এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত উনিশ শতকের সাময়িকপত্রগুলোর বিজ্ঞাপনে এতদ্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থারও বিশেষ পরিচয় বহন করে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া যে বাংলাদেশেও লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকার সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনে। বিশেষ করে নিকোলফোন ও নিকোল রেকর্ড (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১), গ্রামোফোন (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.২), ঘড়ি (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৩), বাইসাইকেল (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৪), ট্রাঙ্ক (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৫), লোহার কড়ি (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৭), মুদ্রণযন্ত্র (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৮), হাইড্রলিক প্রেসিং প্লান্ট (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.৯), বাইনোকুলার (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১০), ডুপ্লিকেটর (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৩.১২), এল্যুমিনিয়াম ও লোহার তৈজসপত্র (বিজ্ঞাপন চিত্র নং ৮.১০ ও ৮.১২) প্রভৃতি যন্ত্রপাতির আমদানি ও ব্যবহার তৎকালীন ঢাকার শিল্পবিপ্লবের ধারায় হয়েছে বলেই প্রতিয়মান হয়।

সাধারণত যেকোন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম নিয়ামক উপাদান হলো স্বর্ণ বা রৌপ্য। এই স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে নানা ধরণের গহনা বানানো যায় । ফলে এদেশের নারীদের স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত নানা গহনা পড়তে দেখা যায় এবং এর ইতিহাস সুপ্রাচীন। স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পকর্মে কারা যুক্ত থাকতেন এবং কিধরণের অলংকার তৈরি করতো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ডাঃ জেমস টেলরের *A Sketch of Topography and Statistics of Dhaka* গ্রন্থে। ৮.১১ নং বিজ্ঞাপন চিত্রের ল্যাণ্ঠান, ৮.১২ নং বিজ্ঞাপনের লোহার কড়া প্রভৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলে লোহার ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমন শিল্প কারখানাও স্থাপিত হতে শুরু করেছে। লোহার বাসনকোসন ছাড়াও পিতল, তামা ও কাঁসার নানাবিধ তৈজসপাত্র নির্মিত হইতো ঢাকায়। ঢাকা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, শহরের ঠাটারি বাজার মহরাল, ধামরাই গ্রামে পিতল, তাম্র ও কাংস্য নির্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহজঙ্গ ও নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত কোনও কোনও স্থানেও এই সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ধামরাই এর কাঁসার বাসন উৎকৃষ্ট। ভরণের কাজই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়।

এছাড়াও ৮.১৪ নং বিজ্ঞাপনে এস.সি. চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স কোম্পানীর জুতার চিত্র, ৮.১৫ নং বিজ্ঞাপনে কমল ব্রাদার্সের জুতার চিত্র দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, উনিশ শতকের ঢাকায় জুতা ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমনি জুতা তৈরির কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, 'মালীটোলা, লক্ষ্মীবাজার ও কুমারটুলীর চর্মকারগণ উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকায় বিস্তৃত চর্মের ব্যবসা আছে। প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকার চর্ম এখান হইতে কলিকাতা হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে বলে মাধ্যমিক উৎসের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক নানা শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতীক হিসেবে উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো স্থানীয় ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ উৎস ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনগুলো এতদ্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় বহন করে থাকে। ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রের মধ্যে এস বি এণ্ড সন কোম্পানির উদ্ভাবিত 'মনেরেখ' ঔষুধের বিজ্ঞাপন চিত্রে (চিত্র নং ১.১৩)। এছাড়াও আধুনিক মেশিনারিজ উপবিভাগে বর্ণিত গ্রামোফোন, নিকোলফোন (চিত্র নং ৩.১, ৩.২, ৩.৪ এবং ৩.৬) প্রভৃতি যন্ত্রগুলো উনিশ শতকের ঢাকার জনগণ যে দিন দিন এগুলোর সাথে পরিচিত হচ্ছে তার পরিচায়ক। উনিশ শতকের ঢাকাই সংস্কৃতির আরেকটি পরিচয়জ্ঞাপক মাধ্যম হলো খেলাধুলা। দেশীয় খেলার পাশাপাশি বিদেশী ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস খেলার চিত্র (চিত্র নং ১.২৫) দেখে অনুমিত হয় যে কয়জনই বুঝতে পেরেছিল যে এই খেলা একদিন জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকবে?

উনিশ শতকে ঢাকার সাময়িকপত্রগুলোর বিজ্ঞাপন চিত্রে বিভিন্ন ধরণের পশু বা প্রাণীর চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো তৎকালীন ঢাকার অধিবাসীগণ যেসমস্ত পশু ও প্রাণীর সাথে পরিচিত কিংবা কোন কোন পশু বা প্রাণী ঢাকায় রয়েছে তার পরিচয় বহন করে থাকে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত 'সর্ব্বদদ্রু হুতাশন' শিরোনামের বিজ্ঞাপন চিত্র নং ১ এ একটি শামুকের চিত্র, 'হরিণ মার্কা চালী রস' শিরোনামের ১.১ নং চিত্রে হরিণ, 'বিএন দত্তের অমৃতবিন্দ সালসা' শিরোনামের ১.৮ নং চিত্রে সিংহ, 'ডি উইটের কিডনী ও ব্লাডার পিলস্' শিরোনামের ১.২২ নং চিত্রে বাঘ, ' মানবের স্বাস্থ্য ও শক্তির একমাত্র উপাদান অমৃতবল্লী কষায়' শিরোনামের ১.২৬ নং চিত্রে একটি অজগর সাপ, 'পালিয়ে বাঁচা দায়-পঞ্চতিক্ত কষায় ম্যালেরিয়া দূর করে' শিরোনামের ১.৩৪ নং চিত্রে একটি বড় আকৃতির মশা, Golf Ras' শিরোনামের ইংরেজি বিজ্ঞাপনের ৪.৩২ নং চিত্রে ছাগল বা ভেড়া জাতীয় পশু প্রভৃতি পশু বা প্রাণীর ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পশু বা প্রাণীর চিত্র সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলো এই জনপদের এক একটি ইতিহাস হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। বর্তমানে ঢাকার উত্তর দিকে হরিণ, বাঘ কিংবা বড় অজগর সাপের দেখা পাওয়া দুষ্কর কিংবা অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় হলেও ঐতিহাসিক ভাবে জানা যায় ঢাকার উত্তরাংশের জঙ্গলে এসমস্ত প্রাণীর অবাধ চলাফেরা ছিল। এভাবে শুধু মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত পেশ করা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে নানা ধরণে পশু-প্রাণী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর সূত্রধরে।

সর্বোপরি বলা যায়, সংবাদ-সাময়িকপত্র এবং ইতিহাস দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংবাদ-সাময়িপত্র ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা সমাজের বিভিন্ন ঘটনার লিখিত বিবরণ সরবরাহ করে। অন্যদিকে ইতিহাসের ঘটনাগুলো সংবাদপত্র তৈরির মূল উপাদান সরবরাহ করে। সাধারণত সংবাদ-সাময়িকপত্র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা সমাজের ঘটনাবলী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকে নথিভুক্ত করে। এভাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলো ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাক্ষ্যবহন কওে যা ঐতিহাসিকদের গবেষণা ও বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে জাতীয় ইতিহাস নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সংবাদ-সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রাথমিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। কেননা,

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ধরে রাখে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচিত্র। আর সাময়িকপত্র ধারণ করে তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও চিন্তাচেতনার প্রবাহ। একইভাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞাপন বিশেষ করে বিজ্ঞাপন চিত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোন অংশে কম নয়। ঊনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক। বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর ধরণ ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঔষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো তৎকালীন ঢাকার স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করে, রূপচর্চা ও প্রসাধনী সামগ্রী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, আধুনিক মেশিনারিজ বা যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো উনিশ শতকের ঢাকায় ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিকাশধারার পরিচয় বহন করে এবং গ্রন্থ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো ঢাকাসহ এতদ্বাঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর চরিত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, প্রসাধনী, পশুপাখি ও বিভিন্ন প্রাণী, কীটপতঙ্গ, নারীদের অলংকার সামগ্রী, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও যেমন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন, লোহার কড়াই, ল্যাণ্ঠান, চামড়ার জুতা, ছাতা, সাইকেল, সংগীতের যন্ত্রপাতি যেমন- গ্রামোফোন, নিকোলফোন, হারমোনিয়াম, বিলাতি মাটি, পঞ্জিকা প্রভৃতি তৎকালীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একেকটি মূল্যবান উপাদান। এই উপাদানের সাথে জড়িয়ে রয়েছে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও সংগ্রামের ইতিহাস, রয়েছে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং রয়েছে ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন ধারা প্রতিফলন। খেলাধুলা বিষয়ক বিজ্ঞাপন চিত্রসহ বিশেষ কিছু চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এদেশীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিশেষ করে পোশাক পরিচ্ছদে (যেমন- শাড়ির পরিবর্তে নারীদের পশ্চিমা পোশাক, ধুতি জাতীয় পোশাকের পরিবর্তে পুরুষের কোর্ট, টাই, প্যান্ট, খড়মের বদলে জুতা), খেলাধুলায় (যেমন- এদেশীয় হাডুডু খেলার পরিবর্তে টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট) ভিনদেশী প্রভাব সুস্পষ্ট হচ্ছে বা হবে। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে ঊনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলের সংবাদ সাময়িকপত্রগুলো তৎকালীন সময়ের প্রাথমিক উৎস বা প্রামান্য দলিল হলেও অবহেলার কারণে সাময়িকপত্রগুলোর বেশির ভাগই আজ লয়প্রাপ্ত হয়েছে। হাতে গোনা কিছু সংবাদ বা সাময়িকপত্রসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অবহেলা ও জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এগুলোকে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সময়ের দাবি। পরিশেষে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক আমলের ঢাকার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা জানার জন্যসাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দাবিদার। এই গবেষণা কর্মটি এরকম বিজ্ঞাপন চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ভবিষ্যতে গবেষকদের নানা চিন্তা ও চাহিদার খোড়াক যোগাবে এখানেই অভিসন্দর্ভটির মূল তাৎপর্য নিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক উৎসসমূহ

(ক) প্রাথমিক উৎস

(১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ চৈত্র ১২৬৯ বঙ্গাব্দ / ৯ এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ

(২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ চৈত্র ১২৬৯ বঙ্গাব্দ / ৯ এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ

(৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ চৈত্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

(৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ মার্চ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ

(৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ বৈশাখ ১৩১২/ ২৩ এপ্রিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

(৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

(৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(৮) *ঢাকাপ্রকাশ* ৯ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দ

(৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

(১০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৯ আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১১) *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ মাঘ ১৩০২ বঙ্গাব্দ

(১২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

(১৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৯৩ সালের ক্রোড়পত্র।

(১৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ অগ্রহায়ন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

(১৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮ ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(১৮) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৬ অগ্রহায়ন ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(১৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(২০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ অগ্রহায়ন ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

(২১) *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(২২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ আষাঢ় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(২৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ শ্রাবণ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(২৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(২৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা আশ্বিন ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(২৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৬ বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

(২৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

(২৮) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(২৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৬ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৩০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

(৩১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(৩২) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

(৩৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

(৩৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

(৩৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা আগস্ট, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

(৩৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ই আগস্ট ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

(৩৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ জুলাই, ১১ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

(৩৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ এপ্রিল ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

(৩৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

(৪০) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

(৪১) *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা আষাঢ়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ

(৪২) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

(৪৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮শে চৈত্র ১৩৪৩;১১ এপ্রিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

(৪৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ঠা আশ্বিন ১৩৪৮;২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ

(৪৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ই আষাঢ়, ১৩৪৯সন; ২১জুন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

(৪৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জুন ও ৯ আগষ্ট ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

(৪৭) *The Bengal Times*, 9 June 1883

(৪৮) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৪৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৫০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(৫১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৯ ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

(৫২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৭ চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(৫৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৪ঠ বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(৫৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৪ঠ বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(৫৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ অগ্রহায়ন, ১২৭৬; ২৮ নভেম্বর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(৫৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ শ্রাবণ, ১২৯৩; ১ আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ

(৫৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

(৫৮) *The Bengal Times,* 4 April 1900

(৫৯) *The Bengal Times,* 4 June 1904

(৬০) *The Bengal Times,* 3 December 1904

(৬১) *The Bengal Times,* 12 December 1904

(৬২) *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ জুলাই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

(৬৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৬৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৮ চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

(৬৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৬ বৈশাখ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

(৬৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৮ ভাদ্র ১৩২০ বঙ্গাব্দ

(৬৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(৬৮) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(৬৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৮ ভাদ্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

(৭০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১২ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৭১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৭২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৩ বৈশাখ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

(৭৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ চৈত্র ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

(৭৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ আশ্বিন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

(৭৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ চৈত্র ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(৭৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৫ চৈত্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৭৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩ বৈশাখ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

(৭৮) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৭৯) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৫ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৮০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৮১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(৮২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৮৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৩ চৈত্র ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

(৮৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১ অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(৮৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৩ ডিসেম্বর ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

(৮৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(৮৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ২রা এপ্রিল ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

(৮৮) *The Bengal Times*, 17 February 1900

(৮৯) *The Bengal Times*, 27 July 1904

(৯০) *The Bengal Times*, 3 February 1900

(৯১) *The Bengal Times*, 20 January 1900

(৯২) *The Bengal Times*, 12 October 1904

(৯৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রি.

(৯৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রি.

(৯৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ন ১২৯২ বঙ্গাব্দ

(৯৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৯ পৌষ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ

(৯৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১১ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(৯৮) *The Bengal Times*, 17 March 1900

(৯৯) *The Bengal Times*, 31 March 1900

(১০০) *The Bengal Times*, 27 July 1900

(১০১) *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ নভেম্বর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(১০২) *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

(১০৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ এপ্রিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

(১০৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ আগস্ট ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ

(১০৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ

(১০৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ

(১০৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ

(১০৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ কার্ত্তিক, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ; ১৪ নভেম্বর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(১০৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ শ্রাবণ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ; ১১ আগস্ট ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ

(১১০) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মাঘ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ; ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ

(১১১) *ঢাকা প্রকাশ* ২৮ কার্ত্তিক, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ; ১২ নভেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(১১২) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ

(১১৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ চৈত্র, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ; ৬ এপ্রিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ

(১১৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা ডিসেম্বর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

(১১৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০জুন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ

(১১৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ আগস্ট, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

(১১৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১১৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১১৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ চৈত্র ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২০) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জৈষ্ঠ্য ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২১) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২২) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব্দ

(১২৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(১২৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ অগ্রহায়ন ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

(১২৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১২৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৩০) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৩১) *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৩২) *ঢাকা প্রকাশ*, ১ মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(১৩৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(১৩৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(১৩৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

(১৩৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ মাঘ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(১৩৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ১এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ

(১৩৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ অগ্রহায়ন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

(১৩৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ শ্রাবণ, ১২৭০ বঙ্গাব্দ; ২৩ জুলাই ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(১৪০) *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ আষাঢ়, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ; ২৩ জুন, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ

(১৪১) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ কার্ত্তিক, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ; ১৪ নভেম্বর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(১৪২) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ পৌষ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ; ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৩) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ সন; ৯ আগস্ট ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৪) *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৫) *ঢাকা প্রকাশ*, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৮, ৭ এপ্রিল,৭ জুলাই, ১১ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৬) *ঢাকা প্রকাশ*, ২ মে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৭) *ঢাকা প্রকাশ*, ২ মে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

(১৪৮) *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ এপ্রিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ / ১২ বৈশাখ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ

(১৪৯) *ঢাকা প্রকাশ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ / ১৬ আশ্বিন, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

(১৫০) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(১৫১) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৬ অগ্রহায়ন ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(১৫২) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৫ বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৫৩) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ জৈষ্ঠ্য ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৫৪) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১২ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

(১৫৫) *ঢাকাপ্রকাশ*, ২১ ফাল্গুন ১৩১১ বঙ্গাব্দ

(১৫৬) *ঢাকাপ্রকাশ*, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ

(১৫৭) *ঢাকাপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মাধ্যমিক উৎস

(১) আবদুল করিম, *ঢাকা গ্রন্থমালা: ঢাকাই মসলিন* (ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০)

(২) আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮)

(৩) এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ঢাকা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৮)

(৪) এম এ হান্নান ফিরোজ সম্পাদিত, *ঢাকার ৪০০ বছর* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ও দৈনিক বাংলাদেশ সময়, ২০০৯)

(৫) কামাল আহমদ, *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২)

(৬) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *জেমস টেলর: কোম্পানী আমলে ঢাকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮)
(মূল: James Taylor, *A Sketch of Topography and Statistics of Dhaka)*

(৭) যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বইপত্র প্রকাশনা, ২০০৭), ৩০৭।

(৮) Abdul Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992)

(৯) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০০৭)

(১০) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা, ২০১৪)

(১১) কাজল ঘোষ, *নানা রঙের ঢাকা* (ঢাকা: নালন্দা প্রকাশন, ২০০৯)

(১২) মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

(১৩) মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)

(১৪) মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ৯ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০)

(১৫) নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫)

(১৬) যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* (কলিকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ২০০০)

(১৭) নাজির হোসেন, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: খ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫)

(১৮) জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬)

(১৯) Percy Brown, *The Heritage of India: Indian Painting* (New Delhi, Association Press, 1918)

(২০) সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ১৩ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১)

(২১) মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা [১৮৪৮-১৯০০]* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪)

(২২) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ১৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১)

(২৩) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১)

Dhaka University Institutional Repository

(২৪) যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: বইপত্র, ২০০৭)

(২৫) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার প্রথম* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশ, ২০১৭)

(২৬) মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর* (ঢাকা, ১৯৮৫)

(২৭) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বইয়ের খোঁজে* (ঢাকা, ২০০৫)

(২৮) মুনসী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা* (ঢাকা, ১৯৮০)

(২৯) রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা ১৬১০-১৯১০* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২)

(৩০) মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী অনূদিত, *মোগল রাজধানী ঢাকা* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ২০১৪)

(৩১) নির্মল গুপ্ত, *ঢাকার কথা* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, ১৯৬০)

(৩২) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস* (কলকাতা, ১৯১০)

(৩৩) মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, *উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০)

(৩৪) কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ* (ঢাকা,১৯১০)

(৩৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতি দীপে* (কলকাতা, ১৯৭৮)

(৩৬) শরীফ উদ্দিন আহমদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স, ২০১০)

(৩৭) শরীফ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ঢাকা কোষ* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২)